ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন
মঙ্গলবাড়ির বাদাল স্তম্ভলিপি
পাথরঘাটা জনপদ
বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত অনালোচিত পোড়ামাটির ফলক
নবাবি বাংলার প্রাসাদ রাজনীতিতে নারী
ছয় দফা প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানীর দৃষ্টিভঙ্গি
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও মুজিবনগর সরকার
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী
বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট
শামসুর রাহমানের কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদ
চট্টগ্রামে আঞ্চলিক সাংবাদিকতা বিকাশের ধারা

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার

সহযোগী সম্পাদক
মোহাম্মদ নাজিমুল হক

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল (বাংলা), সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০১৭

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ ২০১৭

প্রকাশক
মোঃ জিয়াউল আলম
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

মূল্য: ২০০.০০ টাকা

Journal of the Institute of Bangladesh Studies (Bangla), volume 24 (1423 bs). Edited by Swarochish Sarker, Director of the Institute of Bangladesh Studies. Published by Md. Ziaul Alam, Secretary of the Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, Bangladesh. Published in November 2017. Price: Tk 200, US $ 10

ISSN 1561-798-X

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নালের সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার
অধ্যাপক ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক
মোহাম্মদ নাজিমুল হক
অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য
তারিক সাইফুল ইসলাম
অধ্যাপক (অবঃ), অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ মাহবুবর রহমান
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ শহীদুল্লাহ্
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সুলতানা মোসতাফা খানম
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. জয়নূল আবেদীন
অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জাকির হোসেন
অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম মোস্তফা কামাল
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ কামরুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা ইনস্টিটিউট দায়ী নয়

যোগাযোগের ঠিকানা
সম্পাদক, আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ ৬২০৫

ফোন: ০৭২১-৭৫০৯৮৫
ফ্যাক্স: ০৭২১-৭১১১৮৫
ই-মেইল: jibs@ru.ac.bd

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ ছাপা হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, আইন, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত, সংস্কৃতি, এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে;
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে;
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে;
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমি প্রমিত বানান অনুযায়ী, তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না;
- শিকাগো শৈলী অনুযায়ী প্রবন্ধের তথ্যনির্দেশ পাদটীকায় প্রদান করতে হবে; এবং
- প্রবন্ধের পরিসর ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদকের ঠিকানায় প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি এবং jibs@ru.ac.bd ই-মেইলে একটি সফ্‌ট কপি জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে 'বিজয়' সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে" এবং ইংরেজি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে Times New Roman। প্রবন্ধের আখ্যাপত্রে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা (মোবাইল নম্বরসহ) থাকতে হবে।

সূচিপত্র

হারুন-অর-রশিদ ৭
বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন: সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

মোঃ রেজাউল করিম ২১
মঙ্গলবাড়ির বাদাল স্তম্ভলিপি

মো. জাহাঙ্গীর আলম ৩৫
পাথরঘাটা জনপদ: ইতিহাস ও পুরাকীর্তি

মোছা. আশীয়ারা খাতুন ৪৭
বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত অনালোচিত পোড়ামাটির ফলক

নাখলু জাতুল আকমাম ৬৩
নবাবি বাংলার প্রাসাদ রাজনীতিতে নারী

সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী ৮১
ছয় দফা প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানীর দৃষ্টিভঙ্গি

মো. হাসিবুল আলম প্রধান ৯৩
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও মুজিবনগর সরকার: আইনগত পর্যালোচনা

দিব্যদ্যুতি সরকার ১০৭
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী: ভারতীয় প্রতিক্রিয়া

মোঃ বনি আদম ১২৩
বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট: শৈল্পিক ও ইতিহাসভিত্তিক মূল্যায়ন

শুকদেব চন্দ্র মজুমদার ১৩৫
শামসুর রাহমানের কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদ

শাহাব উদ্দিন ১৫৫
চট্টগ্রামে আঞ্চলিক সাংবাদিকতা বিকাশের ধারা

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন: সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

হারুন-অর-রশিদ*

Abstract: Based on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's two recently published books and other research works, the paper attempts to present the political ideas and thoughts of Bangabandhu, the Father of the Nation, in context of his time showing their relevance to the present. Identifying eleven such redeeming features it holds that he was the true representative of syncretistic character and tradition of the Bengali society and the 1972 Constitution is the testimony of what he stood for in his life.

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, বাঙালির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। তাঁর জীবনকাল ছিল মাত্র ৫৫ বছরের। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত দেশি-বিদেশি শত্রুর ষড়যন্ত্রে ধানমন্ডির বাসভবনে পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্যসহ অত্যন্ত নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন বাঙালির মহান নেতা ও জাতির পিতা। তাঁর স্বল্পকালীন জীবন ছিল খুবই ঘটনা বহুল। স্নায়ু যুদ্ধকালীন বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তাঁরই নেতৃত্বে আমরা লাভ করি আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র। তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশ থেকে এভাবে স্বাধীনতা অর্জন ছিল নজির সৃষ্টিকারী ঘটনা। স্বভাবতই বাংলাদেশ বিপ্লব ১৯৭১ সারা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল। বাংলাদেশ বিপ্লবের সফল নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ব ইতিহাসে আপন স্থান করে নেন। তিনি ছিলেন পূর্ণ রাজনৈতিক সত্তার অধিকারী এক বিরল বহুমাত্রিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিতে ক্ষমতা লাভ, সরকার গঠন ইত্যাদি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলেও বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে তা ছিল ভিন্ন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাষ্ট্রনায়কোচিত ও একইসঙ্গে হৃদয়বান রাজনীতিক। তাঁর সকল চিন্তা-চেতনায় জুড়ে ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতার স্বপ্ন। আর এর জন্য আবশ্যক ছিল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন। তবে বাঙালির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ভাবনা সীমাবদ্ধ ছিল না। তা ছিল আরো

---

* উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। প্রবন্ধটি ২৩শে আগস্ট ২০১৭ তারিখ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বক্তৃতা অনুষ্ঠানে পঠিত।

গভীর, বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী। কী ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ভাবনা বা দর্শন? বঙ্গবন্ধুর সমকালীন সময় ও আজকের বাস্তবতায় তাঁর রাজনৈতিক দর্শন বা শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাই-বা কতটা? ইত্যাদি বিষয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনালেখ্য বিশেষ করে সম্প্রতিকালে তাঁর প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ইউপিএল, ২০১২) ও *কারাগারের রোজনামচা* (বাংলা একাডেমি, ২০১৭) এবং অন্যান্য গবেষণাকর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে প্রবন্ধটি রচিত।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও এর প্রাসঙ্গিকতা

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও এর প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করতে গেলে যেসব দিক ফুটে ওঠে, তা একে একে উপস্থাপন করা হলো।

এক. বাঙালি সত্তা

চিন্তা-চেতনায়, চলনে-বলনে, আচার-আচরণে, রুচিতে, ভাবনায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, খাদ্যাভ্যাসে, ইতিহাস-ঐতিহ্য মনস্কতায় – সব কিছুতেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন খাঁটি বাঙালি। বাংলার সবুজ গ্রাম, উর্বর মাটি, সোনালি ফসলে ভরা মাঠ, পল্লীগীতি, বাঙালি খাবার, বাংলা ভাষা সবই ছিল তাঁর হৃদয়ের গহিনে।[১] কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে থাকাকালীন গ্রাম সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'অনেকক্ষণ শুয়ে ছোটবেলার কত কাহিনীই না মনে পড়ল। কারণ আমি তো গ্রামের ছেলে। গ্রামকে আমি ভালবাসি' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৫৩)। নিজের পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে তিনি লেখেন, 'আমিতো লুঙ্গিই পরি' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৬৩)। বাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য তাঁকে এতোই মুগ্ধ করে যে, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রথম ভ্রমণকালে (১৯৪৯) সিন্ধুর 'মরুভূমির এই পাষাণ বালু' তাঁর পছন্দ না হওয়ার কথা অকপটে তিনি বলেছেন (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২১৪)। প্রথম চীন সফরকালে (১৯৫২) আমরা তাঁকে লেকে নৌকা বাইতে দেখি আর বলতে শুনি, 'আমি নৌকা বাইতে জানি, পানির দেশের মানুষ। আমি লেকে নৌকা বাইতে শুরু করলাম' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৩৩)। আবার ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলায় ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের নির্জন কক্ষে বন্দী থাকাকালীন মাসের পর মাস মাছ-ভাত খেতে না পারা এবং পাঞ্জাবি মেসের রুটি ও মাংস খেতে খেতে তাঁর অতিষ্ঠ হয়ে ওঠার কথাও আমরা তাঁর লেখায় পাই (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৫৮, ২৬৪, ২৬৬)।[২] একই সময়ে

---

[১] বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অনুরাগ ছিল চিরন্তন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের হায়দারাবাদ থেকে প্রাইভেট গাড়িতে করাচি আসার পথে একই গাড়িতে থাকা কয়েক পাকিস্তানিকে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২১৭)। অপরদিকে ১৯৫২ সালে চীনের শান্তি সম্মেলনে তিনি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেন। তাঁর কথায়, '... কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না? ... পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য ... আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২২৮)।

[২] একবার হুলিয়া নিয়ে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের লাহোরে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেখানে একমাসের মতো ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে পাঞ্জাবের খাবার খেতে খেতে তিনি অতিষ্ট হয়ে ওঠেন। 'ঢাকায় পৌঁছার সাথে সাথেই তারা তোমাকে গ্রেপ্তার করবে' – সোহরাওয়ার্দীর এরূপ কথার উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

'পাঁচ মাসের মধ্যে বাংলায় কথা বলতে', বাংলায় লেখা বই পড়তে বা রেডিওতে বাংলা গান শুনতে না পারার মনঃবেদনার কথাও তিনি তাঁর *কারাগারের রোজনামচা*'য় লিখেছেন (পৃ. ২৬৭)। উল্লেখ্য ১৯৬৬ সালে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় নুরু নামে সুকণ্ঠী এক কয়েদির গান শুনে বঙ্গবন্ধু তাকে বলেছিলেন, 'গান গাও নুরু, বাংলার মাটির সাথে যার সম্বন্ধ আছে সেই গান গাও' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৩০)।[৩] আগরতলা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ১৯৬৮ সালের মধ্য জানুয়ারিতে যখন পাকিস্তানি সেনা প্রহরায় বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসা হয়, তিনি তখনকার তাঁর মনের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে এভাবে লেখেন, "মনে মনে বাংলার মাটিকে সালাম দিয়ে বললাম, তোমাকে আমি ভালবাসি। মৃত্যুর পরে তোমার মাটিতে যেন আমার একটু স্থান হয়, মা" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৫৬)। বাঙালি সত্তাই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সত্তার ভিত্তিভূমি। তাই পাকিস্তানে বন্দী থাকা অবস্থায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা'। পাকিস্তানি শাসন পর্বে বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন-সংগ্রামের মূল ভিত্তি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তিনি ছিলেন ভাষা-আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দী (১১ই মার্চ ১৯৪৮)। ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে তিনি বন্দী অবস্থায় দীর্ঘ এগার দিন অনশন পালন করেছিলেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল নীতি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু একাধিকবার উল্লেখ করেন, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব নষ্ট হবে।'[৪]

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়া ও এরশাদের সেনা শাসন (১৯৭৫-১৯৯০) এবং পরবর্তীতে বিএনপি (১৯৯০-১৯৯৬) ও বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে (২০০১-২০০৬) মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাঙালি সত্তা ভিত্তিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র কীভাবে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'-এর মোড়কে পাকিস্তানের উগ্র সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় এক ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে, তা বেদনার সাথে জাতি প্রত্যক্ষ করে। বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর কন্যা শেখ

'যা হবার পূর্ব বাংলায় হোক, পূর্ব বাংলার জেলে ভাত পাওয়া যাবে, পঞ্জাবের রুটি খেলে আমি বাঁচতে পারব না। রুটি আর মাংস খেতে খেতে আমার আর সহ্য হচ্ছে না (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৪২)।

[৩] একবার বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকসংগীত শিল্পী আব্বাসউদ্দিনসহ নৌকায় করে বঙ্গবন্ধু ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আশুগঞ্জ আসছিলেন। পথে আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শুনে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, পরবর্তীতে এ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু লেখেন, 'নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১১১)। ১৯৭২ সালে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালবাসি। আমি বাংলার আকাশকে ভালবাসি। আমি বাংলার বাতাসকে ভালবাসি। আমি বাংলার নদ-নদীকে ভালবাসি', মিজানুর রহমান মিজান, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ* (ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮), পৃ. ৬১।

[৪] ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই ঢাকার সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, *বাঙালির কণ্ঠ*, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ৩২৮। ১৯৭৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁর ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি যদি ভুলে যাই আমি বাঙালি, সেদিন আমি শেষ হয়ে যাবো', মিজানুর রহমান মিজান, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, পৃ. ১৪০।

হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের সুযোগ পেলে বাঙালি জাতিসত্তার ধারায় বাংলাদেশের পুনঃপ্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা নতুন করে শুরু হয়, যা এখনও চলছে।

দুই. অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ

জীবনের প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর চেতনা ও বিশ্বাসে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। গোপালগঞ্জের শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'আমার কাছে তখন হিন্দু-মুসলমান বলতে কোনো জিনিস ছিল না' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১১)। প্রধানত অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ও নেতৃত্বের কারণে বঙ্গবন্ধু তখন থেকেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) এবং নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর (১৮৯৭-১৯৪৫) ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নেওয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশবিরোধী ত্যাগী ও কারানির্যাতন ভোগকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রসঙ্গ টেনে লেখেন,

> এই সকল নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ত্যাগী পুরুষরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের ওপর যে অত্যাচার ও জুলুম হিন্দু জমিদার ও বেনিয়ারা করেছিল, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, তাহলে তিক্ততা এত বাড়ত না' (*অসমাপ্ত আত্মজীবন*, পৃ. ২৩-২৪)।

১৯৫০ সালের শেষ দিকে ফরিদপুর কারাগারে গোপালগঞ্জের সহবন্দী সমাজকর্মী ও মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী চন্দ্র ঘোষের বঙ্গবন্ধুর প্রতি 'মানুষকে মানুষ হিসেবে' দেখার উপদেশের প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধুর তাৎক্ষণিক বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৯১)।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন হাজার বছর ধরে বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে গড়ে ওঠা সমন্বয়, সমতা ও সম্প্রীতি তথা অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শের সার্থক প্রতিনিধি। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার সময়েও তাঁর বেলায় এর ব্যত্যয় ঘটেনি। তাই ১৯৪৬ সালে কলকাতার ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে তাঁকে দেখা যায় জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ধর্ম নির্বিশেষে দাঙ্গা আক্রান্ত মানুষের জীবন রক্ষার্থে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে যেতে।[৫] ভারত বিভক্তির পর অনেকের মতো সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে ফিরে না এসে তিনি সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কিছুকালের জন্য হলেও মহাত্মা গান্ধীর শান্তি মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ (১৯৪৯) ও ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ (১৯৪৮) প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যমান বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এ দুই সংগঠনের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দ যুক্ত রাখা হলেও চেতনাগতভাবে এ সংগঠনদ্বয় ছিল অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শে বিশ্বাসী। প্রথম সুযোগেই বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে প্রথমে ছাত্রলীগ (১৯৫৩) ও এর কিছু পর (১৯৫৫) আওয়ামী লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে সংগঠনের দ্বার আনুষ্ঠানিকভাবে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।[৬] পাকিস্তান রাষ্ট্রে অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ ধারণ করেই বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করেছেন, বাঙালি জাতিসত্তার উত্থান ঘটিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পর তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীন রাষ্ট্রের

---

[৫] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৬৪-৬৮; হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পুনর্পাঠ* (ঢাকা: ইউপিএল, ২০১৩), পৃ. ২৫।

[৬] হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭), পৃ. ৩৮।

সংবিধান প্রণীত হলে তাতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়। ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দল বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮)। সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট বক্তব্য, 'রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে, যারা সাম্প্রদায়িক তারা হীন, নীচ তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালবাসে, সে কোনদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না।'[৭] সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন,

> যারা এই বাঙলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায় তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যেও। আওয়ামী লীগের কর্মীরা, তোমরা কোনদিন সাম্প্রদায়িকতাকে পছন্দ করো নাই। তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছো। তোমাদের জীবন থাকতে যেন বাঙলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে না পারে।[৮]

সাম্প্রদায়িকতা সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, শান্তি বিঘ্নিত করে, জাতিসত্তার ভিত্তিকে বিনষ্ট করে। সাম্প্রদায়িকতা দেশ জাতি মানুষ, দেশের অগ্রগতি-উন্নয়ন, সভ্যতা ও বিশ্বমানবতার শত্রু। আজও বাংলাদেশ সহ বিশ্ব জুড়ে এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু বহু পূর্বেই এটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি আজও জাতির প্রেরণার উৎস।

তিন. গণতন্ত্রে আস্থা

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বঙ্গবন্ধুর ছিল অগাধ বিশ্বাস। পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসন আমলে তিনি জনগণের সর্বজনীন ভোটাধিকার, নির্বাচন ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করেছেন। 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে প্রবর্তিত আইয়ুবের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রিত অভিনব ব্যবস্থাধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও তাঁর দল আওয়ামী লীগ ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এল এফ ও (Legal Framework Order)-এর আওতায় চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিজের হাতে রেখে দেওয়া এবং সে কারণে, কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের (যেমন ন্যাপ-ভাসানী) নির্বাচন বর্জন সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নেয় এবং বিজয় অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রী ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালি জাতির এক সন্ধিক্ষণে রেসকোর্স ময়দানের উত্তাল জনসমুদ্রে ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছিল, 'যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।'। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা-উত্তর নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য প্রণীত সংবিধানে 'গণতন্ত্র'-কে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর পূর্বে পাকিস্তানের বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের একদিন পরই (১২ই জানুয়ারি ১৯৭২) তিনি রাষ্ট্রপতির পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার মাত্র

---

[৭] মিজানুর রহমান মিজান, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, পৃ. ১৪০।

[৮] তদেব, পৃ. ১৪১। ১৯৭২ সালের ৭ই জুন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন, "এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আল-বদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না", তদেব, ৭০-৭১।

১৫ মাসের মধ্যে তিনি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে (৭ই মার্চ ১৯৭৩) সরকার পরিচালনায় নতুন করে জনগণের ম্যান্ডেট গ্রহণ করেন। তিনি বাক- ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে স্বাধীনতা-উত্তর বিরোধীদের চরম হিংসাত্মক ভাষায় তাঁর ব্যক্তিগত ও সরকারের সমালোচনা, এমনকি তাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ সময় সহ্য করেছেন।

চার. নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস

গণতন্ত্রই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির পথ। গোপন বা ষড়যন্ত্রের রাজনীতির কোনোদিন তিনি আশ্রয় নেননি। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৯৫)। *কারাগারের রোজনামচা*-য় তিনি এ সম্বন্ধে বলেন, 'আমি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। যদি ঐ পথে কাজ করতে না পারি ছেড়ে দিব রাজনীতি' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৮২)। পুনরায় বলেন, 'মতের বা পথের মিল না হতে পারে, তার জন্য ষড়যন্ত্র করে বিরুদ্ধ দলের বা মতের লোককে হত্যা করতে হবে এ বড় ভয়াবহ রাস্তা' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৫৯)। একই গ্রন্থের অন্যত্র লিখেছেন, '... বেআইনি কাজ আমি করি না' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১২৬)। ১৯৬৮ সালের মধ্য জানুয়ারি বন্দী অবস্থায় বঙ্গবন্ধুকে আইয়ুব সরকার আগরতলা (ষড়যন্ত্র?) মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের লক্ষ্যে তাঁকে ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের গোপন স্থানে নিয়ে বন্দী করে রাখে। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে তাঁর মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে লেখেন,

> ভাবতে লাগলাম রাজনীতি এত জঘন্য হতে পারে! ক্ষমতার জন্য মানুষ যে কোনো কাজ করতে পারে। ... আমি তো ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি নাই। জীবনভর প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি করেছি। ... গোপন কিছুই করি না বা জানি না। ... জেলে যেতে হবে জেনেও ছয় দফা জনগণের কাছে পেশ করেছিলাম। ... অত্যাচার চরম হবে, তবুও গোপন করি নাই। আজ দুঃখের সাথে ভাবছি আমাকে গোপন ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করতে শাসকদের একটু বাধলো না! এরা তো আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ভাল করে জানে (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৫৮)।

পাঁচ. সংবিধানমনস্কতা

সংবিধান ও সাংবিধানিক শাসনের প্রতি বঙ্গবন্ধু ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। পাকিস্তানি শাসন আমলের সমগ্র সময় জুড়েই তিনি এ জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দশ মাসের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে আমরা পাই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ৭২-এর সংবিধান। সংগঠনের গঠনতন্ত্রের প্রতিও বঙ্গবন্ধু ছিলেন অঙ্গিকারবদ্ধ। যেকারণে ১৯৫৬-৫৭ সালে নয় মাস মন্ত্রিত্বের পর দলের গঠনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্বে থেকে গিয়েছিলেন।[৯] পুনরায় একই কারণে ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে কাউন্সিলরদের উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি দলের সভাপতির পদ অলংকৃত না করে বরং সহকর্মী এ এইচ এম কামারুজ্জামান-কে ঐ পদে অধিষ্ঠিত করেন। বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেছিলেন কার্যনির্বাহী কমিটির এক নম্বর সদস্য পদ। বঙ্গবন্ধু নিজেই কাউন্সিলরদের সম্মুখে নতুন কর্মকর্তাদের নাম পেশ করেন। এখানে

---

[৯] হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, পৃ. ৫৮-৫৯।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য বা সরকারের উচ্চ কোনো পদে আসীন কারো একই সঙ্গে দলের কর্মকর্তা পদে অধিষ্ঠিত থাকার ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ ছিল।[১০] বঙ্গবন্ধু এর প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থেকে সভাপতির পদ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন যে, 'তিনি গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে দলে একটি গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে করেন।'[১১]

ছয়. নীতি-আদর্শ ও ত্যাগের রাজনীতি

রাজনীতিতে নীতি ও আদর্শকে বঙ্গবন্ধু সর্বোচ্চে স্থান দিতেন। *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে তিনি লেখেন, '... রাজনীতি করতে হলে নীতি থাকতে হয়। সত্য কথা বলার সাহস থাকতে হয়। বুকে আর মুখে আলাদা না হওয়াই উচিত' (পৃ. ৫৮)। তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য নিছক ক্ষমতায় যাওয়া ছিল না, পাকিস্তানি পর্বে তা ছিল বাঙালির অধিকার আদায় বা জাতীয় মুক্তি অর্জন। যে কারণে ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।' নীতি-আদর্শহীন দলের সঙ্গে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনেরও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন।[১২] ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের তিক্ত অভিজ্ঞতা সামনে রেখে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু লেখেন,

> অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনোদিন একসাথে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতে নাই। তাতে দেশসেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয় (পৃ. ২৭৩)।

অপর দিকে রাজনীতিকে বঙ্গবন্ধু দেখেছেন ত্যাগের মহান আদর্শ হিসেবে, ভোগের বিষয় হিসেবে নয়। সে ত্যাগ দেশ-জাতি ও জনগণের সার্বিক মুক্তি বা কল্যাণের জন্য। *কারাগারের রোজনামচা*-য় তিনি লিখেছেন, 'জীবনে আমার অনেক দুঃখ আছে সে আমি জানি, সেজন্য নিজেকে আমি প্রস্তুত করে নিয়েছি' (পৃ. ১৭৩)। পুনরায় লেখেন,

> ... এত অত্যাচার নীরবে সহ্য করব কি করে? ... বয়স হয়েছে, শরীর তো খারাপই হতে থাকবে ... মনকে সান্ত্বনা দেই এই কথা ভেবে, আর কতদিনই বা বাঁচব? চলুক না। এই দেশের মানুষের জন্য কিছু যদি নাও করতে পারি, ত্যাগ যে করতে পারলাম এটাই তো শান্তি (পৃ. ১৮৪)।

গ্রন্থের অন্য এক জায়গায় লিখেছেন, 'ত্যাগের মাধ্যমেই আদর্শের জয় হয়' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৬৮)। ত্যাগের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে বলেন,

> যেকোন মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। যারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় তারা জীবনে কোন ভাল কাজ করতে পারে নাই – এ বিশ্বাস আমার ছিল (পৃ. ১২৮)।

---

[১০] দ্রষ্টব্য, শেখ মুজিবুর রহমান, *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলি* (ঢাকা: পাইওনিয়ার প্রেস); অপিচ, হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, পৃ. ৪৫।

[১১] *ইত্তেফাক*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৮; অপিচ, হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, পৃ. ১৭৩।

[১২] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪৮।

একই গ্রন্থে লিখেছেন, 'দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে এবং সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে' (পৃ. ১৬৪)। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একদল ঘাতক-খুনি চক্রের হাতে পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্য সহ অত্যন্ত নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে জীবন দিয়ে বঙ্গবন্ধু এদেশ ও দেশের মানুষের জন্য সেই 'চরম ত্যাগ' করে গেলেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আজ নীতি ও ত্যাগের আদর্শের বড়ই সংকট। 'কী দিলাম তা নয়', 'কী পেলাম' সেটিই অনেকের কাছে মুখ্য বিবেচ্য। বঙ্গবন্ধুর কথিত অনুসারীদের অনেকেও এ থেকে মুক্ত নয়। রাজনীতি মানে যে ত্যাগ ও দেশ-জাতি-জনগণের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করা – জাতির জনকের এ জীবন-আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ আজ আমাদের জন্য বড়ই প্রয়োজন।

সাত. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্তি অর্থে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, পশ্চিমের অবাধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নয়। ১৯৫২ সালে চীন সফর সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে লেখেন,

> আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি (পৃ. ২৩৪)।

একই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি লেখেন, 'আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক নেতা ও কর্মী আছে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে; এবং তারা জানে সমাজতন্ত্রের পথই একমাত্র জনগণের মুক্তির পথ' (পৃ. ২৫৮)।[১৩] তিনি আরো লেখেন, 'যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা কোনোদিন কোনো রকমের সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের কাছে মুসলমান, হিন্দু, বাঙালি, অবাঙালি সকলেই সমান' (পৃ. ২৫৮)।

স্মর্তব্য ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠার পরপর আওয়ামী লীগ যে খসড়া ম্যানিফেস্টো গ্রহণ করে, তাতে মূল শিল্প যেমন – ব্যাংক, বীমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনি, পাট, চা ইত্যাদি জাতীয়করণ, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং কৃষকের মধ্যে ভূমি বণ্টন এসব অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৪] বঙ্গবন্ধু পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি থাকাকালীন ১৯৬৪ সালের কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি ছিল এরূপ: 'একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন করতে সক্ষম বলে ধীরে-ধীরে তা প্রবর্তন'।[১৫] ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পর ৭২-এর সংবিধানে সমাজতন্ত্র-কে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প জাতীয়করণের নীতি গৃহীত হয়।[১৬]

---

[১৩] তদেব, পৃ. ২৫৮।

[১৪] দ্রষ্টব্য, হারুন-অর-রশিদ, *পুনর্পাঠ*, পৃ. ১৪৫-১৪৭।

[১৫] হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, পৃ. ৮২; অপিচ, বঙ্গবন্ধুর নীতি নির্ধারণী ভাষণ, 'শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য', তদেব, পৃ. ৯৮। বঙ্গবন্ধুর পূর্ণাঙ্গ ভাষণ দ্রষ্টব্য, হারুন-অর-রশিদ, *৬ দফা'র ৫০ বছর*, পৃ. ১১৫-১১৭।

[১৬] হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

আট. 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূলে ছিল দুটি বিষয়, (এক) বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা, যা দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম শেষে ১৯৭১ সালে তাঁর নেতৃত্বে নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়; (দুই) শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার ক্ষুধা-দারিদ্র-অশিক্ষা পীড়িত, সমাজে চির অবহেলিত, অধস্তন, নির্যাতিত-নিপীড়িত, যুগের পর যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত, গরিব-দুঃখী গণমানুষের মুখে সুখের হাসি ফোটানো। বঙ্গবন্ধুর অন্তরে এ প্রত্যয় ছিল সার্বক্ষণিক। সেই ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে তিনি 'শোষণমুক্ত সমাজ' প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন।[১৭] ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে দলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর নীতি-নির্ধারণী ভাষণে তিনি এ বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন, 'শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য।'[১৮] স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত দলের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে তাতে 'শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম'-কে আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৯]

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু পাশ্চাত্যের উদার সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারায় বাংলাদেশকে পরিচালনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাম নামধারী চীনপন্থি চরম উগ্র কিছু গোপন সংগঠন সরকারের বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করে রাজনৈতিক হত্যা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোসহ সারাদেশে এক নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আসে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ১০ মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক ও তখনকার নেতৃত্বের একটি অংশ কর্তৃক 'শ্রেণি-সংগ্রাম', 'সামাজিক বিপ্লব' ইত্যাদি রোমাঞ্চকর স্লোগান আর 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নামে গঠিত নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ-এর পক্ষ থেকে। এদের সঙ্গে যুক্ত হয় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বিপ্লব ১৯৭১ থেকে তিন বছরের সামান্য পর ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নতুন এক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন, যাকে তিনি 'This is our second revolution' বা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন। দেশে সংসদীয় পদ্ধতির স্থলে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নতুন ব্যবস্থায় বঙ্গবন্ধু হলেন রাষ্ট্রপতি। ৬ই জুন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল, সরকারি-বেসরকারি প্রশাসনের সদস্য, সামরিক ও অন্যান্য বাহিনীর কর্মকর্তা নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে একটি জাতীয় দল গঠন করা হয়। ২১শে জুন সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে পূর্বের ১৯টি জেলার স্থলে ৬১টি জেলা সৃষ্টি করা হয়। ১৬ই জুলাই বঙ্গবন্ধু ৬১টি জেলার প্রতিটির জন্য একজন করে গভর্নর নিয়োগ দান করেন।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির পেছনে দেশের উদ্ভূত সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন আশু লক্ষ্য ছিল বটে, তবে তা কিছুতেই একমাত্র বা প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল না। এমনকি নিজ হাতে অগাধ ক্ষমতা লাভও কোনো অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে তাঁর দল আওয়ামী লীগ ৩০০টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের ৭৩.১৭ শতাংশ পেয়ে

---

[১৭] তদেব, পৃ. ১২৬।
[১৮] তদেব, পৃ. ৯৮।
[১৯] তদেব, পৃ. ১৫১।

সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনায় তিনি বিপুল গণম্যান্ডেট লাভ করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন জাতির পিতা। তাঁর প্রতি জনগণের সমর্থন, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। তাই নতুন করে তাঁর হাতে আরো ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার কোনো আবশ্যকতা ছিল না।

বস্তুত দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ছিল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্থাৎ গণমানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক মুক্তি অর্জনের সোপান স্বরূপ। গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়ন, গ্রামে মাল্টিপারপাস বা বহুমুখী কো-অপারেটিভস, পল্লী অঞ্চলে 'হেল্‌থ কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠা, সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, খাল খনন করে কৃষিকার্যে পানি ও সেচের ব্যবস্থা, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ, জনগণের জন্য সঠিক তথ্য সরবরাহ, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, দুর্নীতি দমনে কঠোর অবস্থান, পরিকল্পিত পরিবার, নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি ছিল তাঁর নতুন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল 'বাংলার দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন', সকল নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা, 'বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত', বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল আদর্শ (core values) জাতীয় চার নীতি – জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা – যে কোনো মূল্যে সমুন্নত রাখা, সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাংলার মাটিতে আর কোনো দিন যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেটি নিশ্চিত করা, হত্যা-খুন, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করে জনজীবনে নিরাপত্তা বিধান, চোরাকারবার-মজুদদারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা, জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থসেবা পৌঁছানো, আমলাতান্ত্রিকতার পরিবর্তে স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও গতিশীল জনবান্ধব প্রশাসন, উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা, সমাজের জ্ঞানী-গুণীজনদের 'পুল' গঠন করে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধু একে 'সিস্টেম চেইঞ্জ' বলে আখ্যাত করেন। তাঁর কথায়, 'উই হ্যাভ টু মেইক এ কমপ্লিট চেইঞ্জ', কেননা 'কলোনিয়াল পাওয়ার এবং রুল নিয়ে দেশ চলতে পারে না। নতুন স্বাধীন দেশ স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হবে।'[২০]

দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর কর্মসূচি ঘোষিত হলেও এর পেছনে তাঁর অনেক দিনের চিন্তা-ভাবনা কাজ করেছিল।[২১] নতুন ব্যবস্থায় একটি মাত্র জাতীয় দল প্রবর্তিত হয় বটে, তবে এর মধ্যেও নির্বাচনে একাধিক প্রার্থীর বিধানসহ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু একে আখ্যাত করেছিলেন 'শোষিতের গণতন্ত্র' হিসেবে। তবে বঙ্গবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবকে একটি পরীক্ষা হিসেবে দেখেন। তাঁর ভাষায়, "এটা একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট। এখন দেখা দরকার, এর ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশের জনগণের কতটা মঙ্গল করতে পারব। এবং যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেছি, এর মাধ্যমে তার বাস্তবায়নে কতটা কৃতকার্য হবো।" বঙ্গবন্ধু দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, "এই সিস্টেম ইনট্রোডিউস করে যদি দেখা যায় যে, খারাপ হচ্ছে,

---

[২০] বিস্তারিত, ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, মিজানুর রহমান মিজান, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, পৃ. ১৭২-১৮৪।

[২১] তদেব, পৃ. ১৭৭।

অলরাইট, রেকটিফাই ইট। কেননা, আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে।"[২২]

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে আইসিটি তথ্যকেন্দ্র, কৃষিতে ভর্তুকি, স্কুলগামী শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিত, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ন প্রকল্প, দুঃস্থ-বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও বয়স্কদের জন্য ভাতা প্রচলন ইত্যাদি পদক্ষেপ ও কর্মসূচি কার্যত বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকেই পাওয়া আর লক্ষ্য একটিই – গ্রামীণ জীবনের উন্নয়ন ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধুর চির স্বপ্ন 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'।

নয়. নারীর মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন

বঙ্গবন্ধু নারীর মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায়নের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি যখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সে সময়ে কাউন্সিলে দলের গঠনতন্ত্র পরিমার্জন করে পুরুষের পাশাপাশি প্রত্যেক নারীও যাতে সমমর্যাদায় পার্টির সদস্য হতে পারেন, সে লক্ষ্যে 'স্ত্রী-পুরুষ' নির্বিশেষে ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব প্রত্যেক নাগরিক এরূপ বলা হয়, যা পূর্বে এভাবে ছিল না। ঐ কাউন্সিলে মিসেস সেলিনা বানু এমএলএ আওয়ামী লীগের প্রথম মহিলা সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে দলের ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচিতে 'মহিলাদের পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার প্রদান' এ কথা পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে তাঁরই সভাপতিত্বে ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে দলের বিভিন্ন ইউনিট থেকে ভবিষ্যতে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রেখে গঠনতন্ত্রে সংশোধনী আনা হয়,[২৩] যা ছিল বঙ্গবন্ধুর অগ্রবর্তী চিন্তার ফসল। এছাড়া বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে নারীদের জন্য জাতীয় সংসদে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়, যা বর্তমানে ৫০ আসনে উন্নীত।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে সর্বক্ষেত্রে নারীর যে ক্ষমতায়ন ঘটেছে, এর প্রেরণামূলে রয়েছে জাতির পিতার নীতি ও আদর্শ।

দশ. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা

বঙ্গবন্ধুর পুরো জীবনকালটি ছিল বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের পক্ষে এবং পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি: 'বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত – শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' তিনি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ-বৈষম্যবাদের বিরোধী ও বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষে ছিলেন, যা ৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়

---

[২২] বিস্তারিত, বঙ্গবভনে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, মিজানুর রহমান মিজান, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, পৃ. ১৯৫-২২২।

[২৩] হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, পৃ. ১৬৬।

(অনুচ্ছেদ ২৫, ধারা গ)। একই কারণে প্যালেস্টাইনের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তাঁর সরকারের ছিল জোরালো সমর্থন।

বঙ্গবন্ধু আত্মমর্যাদা ও দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে পাশ্চাত্যের ধনী রাষ্ট্রসমূহের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে নীতিগতভাবে বিরোধী ছিলেন। যদিও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন, এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন ও ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করে মানুষকে বাঁচাতে তাঁকে ঐ অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসার চেষ্টা করতে দেখা যায়।[২৪] আমেরিকার বৈদেশিক সাহায্য সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল, 'আমেরিকা যেখানে সাহায্য দিতে চায় সেখানে অধীনস্থ না করে অর্থ সাহায্য দেয় না' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১০৭)। পাকিস্তানের শর্তযুক্ত মার্কিন সাহায্য গ্রহণের সমালোচনা করে তিনি তাঁর *কারাগারের রোজনামচায়* লেখেন, 'নিজের দেশকে এত হেয় করে কোনো স্বাধীন দেশের সরকার এরূপভাবে সাহায্য গ্রহণ করতে পারে না। ... ভিক্ষুকের কোনো সম্মান নাই' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১০৩)। তিনি ভিয়েতনামে মার্কিনি বোমা হামলায় নির্বিচার গণহত্যার তীব্র সমালোচনা করে মনে মনে ভিয়েতনামের জনগণের পক্ষে রাশিয়া ও চীনের হস্তক্ষেপ কামনা করতেন (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৫৪)। আমেরিকার দ্বিমুখী নীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আমেরিকানরা নিজের দেশে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, আর অন্যের দেশে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গণতন্ত্রকে হত্যা করে ডিক্টেটর বসাইয়া দেয়' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৩৫)। ৫০ ও ৬০-এর দশকে (এমনকি পরবর্তীতেও) বিশ্বের বহু দেশে এমনটি ঘটে, যার প্রতি বঙ্গবন্ধু ইঙ্গিত করেন। তিনি এও লেখেন, 'দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখনই অত্যাচার করে, আওয়ামী লীগ তার প্রতিবাদ করে' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৫৪)।

এগারো. বিশ্বশান্তি

বঙ্গবন্ধু বিশ্বশান্তি ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের নীতিতে গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা থেকেই একই নীতি অনুসরণ করে আসে।[২৫] বঙ্গবন্ধু প্যালেস্টাইন প্রশ্নে আরব-ইসরাইল সংঘর্ষ, কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানের অনুরূপ দ্বন্দ্ব-সংকট নিরসনে

---

[২৪] ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখা দেয়। স্বাধীনতার পরপর অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে অনেকের ভবিষ্যৎ-বাণী ছিল। যাহোক ১৯৭৪ সালে দেশে দীর্ঘস্থায়ী প্রলয়ংকরী বন্যা দেখা দেয়। মাঠের ফসল ও মানুষের অন্যান্য সম্পদ মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হয়। হেলিকপ্টার ও নৌকা ছাড়া দেশের বহু স্থানে যোগাযোগের আর কোনো উপায় ছিল না। বাংলাদেশসহ বিশ্ব জুড়ে চলছিল ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি। বঙ্গবন্ধু সরকার অনেক চেষ্টায় বিশ্ববাজার থেকে খাদ্যসামগ্রী ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানি এবং সারাদেশে ৫৭০০ লঙ্গরখানা খুলে প্রতিদিন ৪৪ লক্ষাধিক লোককে খাবার সরবরাহ করছিল। একই সময়ে চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্যবোঝাই জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি এসে এরপর ফিরে যায়। অজুহাত ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোর শত্রু সমাজতান্ত্রিক কিউবার নিকট বাংলাদেশের চটের ব্যাগ রপ্তানি। সরকারের নানা প্রচেষ্টায় পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঠেকানো সম্ভব হলেও দুর্ভিক্ষে সরকারি হিসেব মতে ২৭৫০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, পৃ. ১৭৫।

[২৫] দ্রষ্টব্য, 'পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টো', আবুল কাশেম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ- ঐতিহাসিক দলিল* (ঢাকা, ২০০১), পৃ. ১৫-৩০; অপিচ, হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, পৃ. ২৪; শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৫২।

একই অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভকালে ঐ সংস্থায় তাঁর ভাষণেও বঙ্গবন্ধু বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বিশ্বশান্তির প্রশ্নে তাঁর অবস্থান ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৩ সালে বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' উপাধিতে ভূষিত করে। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল বিষয় ছিল 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়', জোটনিরপেক্ষ নীতি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ পরিহার, নিরস্ত্রীকরণ, প্রত্যেক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ইত্যাদি, যা বাংলাদেশের ৭২-সালের সংবিধানে গুরুত্ব সহকারে সন্নিবেশিত হয়। বঙ্গবন্ধু যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশসমূহের পক্ষে নিজেদের স্বার্থেই বিশ্বশান্তির নীতি অনুসরণ করে চলা আবশ্যক (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৩৪)।

বঙ্গবন্ধুর বিশ্বশান্তি ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা-সমাধানের নীতি ও আদর্শ অনুসরণে বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে দ্বিপক্ষীয় সমস্যার (যেমন সমুদ্রসীমা, স্থল সীমা, সিটমহল, গঙ্গার পানি চুক্তি) সমাধানে সক্ষম হয়। এমনকি অভ্যন্তরীণভাবে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই দশক ধরে চলমান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে সমর্থ হয়। কয়েক বছর পূর্বে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে তা প্রশমনে ঐ দুই দেশে ছুটে যেতে দেখা যায়। বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে সর্ববৃহৎ শান্তি সেনা যোগানদানকারী দেশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর প্রায় দশ সহস্র সদস্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি মিশনে নিয়োজিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলছে, যা বিশ্বমহলে বহুল প্রশংসিত।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের মূলে ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা ও গণমানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, তাঁর কথায়, 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'।

১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ছিল না। ঐ অদ্ভুত ও অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজেকে পাকিস্তান আন্দোলনে নিয়োজিত করেননি। বস্তুত ১৯৪০ সালে বহু রাষ্ট্র ধারণা নিয়ে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর মতো আরো অনেকে বাংলাভিত্তিক আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার কৃষক-প্রজা তথা সর্বসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন।[২৬] পাকিস্তানি বিজাতীয়

---

[২৬] বিস্তারিত, Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics* (Dhaka: UPL, 2012), pp. 165-180, 232-234, 261-266; হারুন-অর-রশিদ, *পুনর্পাঠ*, পৃ. ৩৫-৩৮। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে (পৃ. ২২) ১৯৪০-এর দশকে পাকিস্তান আন্দোলনকে ঘিরে তাঁর ও তাঁর মতো অন্যদের রাষ্ট্রধারণা সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট বলেন,

> পাকিস্তান দুইটা হবে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। একটা বাংলা ও আসাম নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র; আর একটা 'পশ্চিম পাকিস্তান' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে – পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে। অন্যটা [তৃতীয়টি] হবে হিন্দুস্থান।

উল্লেখ্য দেশ বিভাগের প্রাক্কালে লাহোর প্রস্তাবের বহুমাত্রিক রাষ্ট্রধারণার আলোকে যুক্ত বাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি আবুল হাশিম, কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু, বঙ্গীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা কিরণ শংকর রায় প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে ভারত ও (পশ্চিম) পাকিস্তানের বাইরে তৃতীয় 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু এর সমর্থনে এবং বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে কলকাতায় একাধিক সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। দ্রষ্টব্য, Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, p. 304; *মিল্লাত*, ৩০শে মে ১৯৪৭, পৃ. ৭।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রাম শেষে তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙালির জাতিসত্তা ভিত্তিক এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একই সঙ্গে ৪০-এর দশকের স্বপ্নও (স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অর্থে) পূর্ণতা পায়। বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ছিল শোষণ মুক্তিতে। তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে ক্ষুধা-, দারিদ্র্য-, নিরক্ষরতা- মুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভর ও মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা। তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর কর্মসূচি ছিল সে লক্ষ্যেই নির্দেশিত। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি সমাজের সমন্বয়, সমতা ও সম্প্রীতির শাশ্বত ঐতিহ্য ও ধারা, অন্য কথায়, সংশ্লেষণাত্মক সংস্কৃতি (Syncretistic Culture)-র সার্থক প্রতিনিধি। অন্যভাবে বললে, রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সহ ৭২-এর সংবিধানে আমরা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের সামগ্রিক পরিচয় পাই। এ সংবিধান হচ্ছে তাঁর শ্রেষ্ঠ ট্রিটিস।

অতএব, শুধু প্রাসঙ্গিকই নয়, বাঙালির স্বাধীন অস্তিত্ব, জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-অগ্রতির ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুর দর্শন বা শিক্ষা অনন্তকাল ধরে জাতির জন্য আবশ্যকীয় হয়ে থাকবে।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

মঙ্গলবাড়ির বাদাল স্তম্ভলিপি

মোঃ রেজাউল করিম*

Abstract: Badal pillar inscription, commonly known as the *Bhimer Panti*, is one of the most important sources of Bengal history. It helps to reconstruct the history of ancient Bangladesh, especially the dynastic history of the Palas. Charles Wilkins, the superintendant of Badal factory discovered it in 1780. Scholars in colonial period had initiated their effort to unfold the information it contained. This paper tries to interprete the subject minutely by getting information from the original sources and by making proper inspection of the inscription.

১. ভূমিকা

মঙ্গলবাড়ির ভীমের পান্টির ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নাম বাদাল স্তম্ভলিপি।[১] আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই লিপির পাঠোদ্ধারের মধ্য দিয়ে ভারতে লিপিবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়।[২] প্রাচীন বাংলা তথা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনে বাদাল স্তম্ভলিপির অবদান অসামান্য। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান তথা প্রাচ্য চর্চারও অন্যতম বিষয় ছিল এই লিপি। ব্রিটিশ শাসনামলেই পণ্ডিতগণ লিপিটি নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁদের গবেষণা প্রাচীন বাংলার ইতিহাস বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইতোমধ্যে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (লিপি, ইমারত, মূর্তি প্রভৃতি) আবিষ্কৃত হয়েছে। এরপরও বাদাল স্তম্ভলিপির গুরুত্ব তেমন কমেনি। কারণ প্রাচীন বাংলা, বিশেষ করে পাল শাসনামল সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় এই লিপি থেকে। তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কালে লিপিটি নিয়ে তেমন কোনো অধ্যয়ন লক্ষ করা যায় না। কিন্তু প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনার অপরিহার্য উৎস হওয়ায় লিপিটি বহুল উদ্ধৃত হচ্ছে। অনেক গবেষক লিপিটির ভুল অবস্থান নির্দেশ করছেন। এমনকি

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

[১] Charles Wilkins, "Inscription on a pillar near Buddal translated from the Sanscrit," *Asiatic Researches or, Transactions of the Society, Instituted in Bengal, for Inquiring into the History and Antiquities, the Arts, Sciences, and Literature, of Asia*, vol. I (reprint; Varanasi: Bharat-Bharati Oriental Publishers and Book Sellers, 1972), p. 119; M. Martin, *Eastern India,* Vol. III (Delhi: Cosmo Publications, 1976), p. 672; অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়লেখমালা* (রাজশাহী: বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৯১২), পৃ. ৭০।

[২] আবু ইমাম, "বরেন্দ্র ভূমির প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস," মুহঃ মমতাজুর রহমান (সম্পা.), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ১৯৯৮), পৃ. ৫০৮।

অনেকে লিপিটির নাম পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলছেন।[৩] লিপিটি নিয়ে নিবিড় অধ্যয়নের অভাব সম্ভবত এমন অবস্থার জন্য দায়ী। একটি সাধারণ অধ্যয়নের মাধ্যমে লিপিটির প্রতি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইতিহাসে এই লিপির গুরুত্ব পর্যালোচনা (interpret) করাও এর লক্ষ্য। তবে, মূল আলোচনায় যাবার আগে বাদাল স্তম্ভলিপি, এর অবস্থান, আবিষ্কার, নামকরণ, পাঠোদ্ধার প্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে বলে নেয়া দরকার।

২. ভীমের পান্টি এবং এর অবস্থান

ভীমের পান্টি (বাদাল স্তম্ভলিপি) রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলাধীন ধামইরহাট উপজেলার অন্তর্গত মুকুন্দপুর মৌজায় অবস্থিত। ইউনিয়নের নাম জাহানপুর। এই স্থানটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের নিকটবর্তী। এর আনুমানিক ৩ কিলোমিটার উত্তরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর জগদীশপুর সীমান্ত ফাঁড়ি। সীমান্তের ওপারে ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। বালুরঘাট শহর (দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সদর) থেকে এর দূরত্ব (দক্ষিণ-পূর্বে) আনুমানিক ১৫ কিলোমিটার। অবশ্য ভারত থেকে এখানে (নিকটতম) হিলি স্থল বন্দর ঘুরে আসতে হয়। সে ক্ষেত্রে বালুরঘাট শহর থেকে এর দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ কিলোমিটার। পক্ষান্তরে স্থানটি বাংলাদেশের রাজশাহী শহর (রামপুর-বোয়ালিয়া) থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে। নওগাঁ শহর থেকে এর দূরত্ব ৬৩ কিলোমিটার।[৪] বগুড়া ও জয়পুরহাট শহর থেকে এর দূরত্ব যথাক্রমে ৬০ কিলোমিটার এবং ১০ কিলোমিটার (পশ্চিমে)। উপরের যে কোনো শহর থেকে পাকা রাস্তাযোগে সহজেই বাদাল স্তম্ভলিপিতে (মুকুন্দপুরে) আসা যায়।

ভীমের পান্টি কৃষ্ণাভ ধূসর প্রস্তরে (black basalt) নির্মিত একটি গরুড় স্তম্ভ।[৫] এটি দেখতে অর্ধভগ্ন নারকেল গাছের কাণ্ডের মতো। বর্তমানে এর উচ্চতা প্রায় ৩.৬ মিটার। এর নীচের দিকের পরিধি প্রায় ১.৭৬ মিটার। স্তম্ভটি আদিতে আরো উঁচু ছিলো এবং এর মাথায় একটি গরুড় মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিলো। পরবর্তী কালে বজ্রপাতে মূর্তিসহ স্তম্ভটির উপরের অংশ ভেঙে গেছে এবং স্তম্ভটি কিছুটা হেলেও পড়েছে। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্তম্ভটির পাদদেশ ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। বাঁধানো

---

[৩] এ প্রসঙ্গে আবু ইমাম, আব্দুল মমিন চৌধুরী, মোখলেছুর রহমান প্রমুখ গবেষকদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা সবাই লিপিটির নাম বিকৃত করেন। আবু ইমাম একে 'বাদল স্তম্ভলিপি' বলে উল্লেখ করেন। মমিন চৌধুরী একে 'ষাদলা লিপি' বলেন। আবার আবু ইমাম ও মোখলেছুর রহমান উভয়েই এই লিপির ভ্রান্ত অবস্থান নির্দেশ করেন। দেখুন, আবু ইমাম, পৃ. ৫০৮; মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৮), ৭ম সং, পৃ. ৫২; Mukhlesur Rahman, "The Archaeological Heritage of Rajshahi (Pre-Muslim Period)," S.A. Akanda (ed.), *The District of Rajshahi: Its Past and Present* (Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, 1983), p. 7.

[৪] পূর্বের রাজশাহী জেলার মহকুমা এবং বর্তমানে জেলা শহর।

[৫] গরুড় একটি পৌরাণিক পাখি। এটি বিষ্ণুর বাহন। গরুড় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে *পৌরাণিক অভিধানে* লিখা হয়েছে যে, 'ইনি (গরুড়) অর্ধপক্ষী ও অর্ধমানব। শ্বেতবর্ণ মুখ, রক্ষবর্ণ পক্ষ ও স্বর্ণাভ দেহ। পক্ষীর ন্যায় চক্ষু ও নখর।' বস্তুত, গরুড় পাখিকে প্রাচীন হেলেনীয় সভ্যতার দেবতা জিউসের বাহন গ্যানিমেডের (ঈগলের) সাথে তুলনা করা যেতে পারে। Henrich Zimmer, *Myths and Symbols in Indian Art and Civilization* (ed. Joseph Campbell) (Princeton: Princeton University Press, 1972), p.76, 76 fn; সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান*, ৩য় সং (কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৩), পৃ. ১৪৮, ৫৯৫।

অংশের পরিধি ৫.৭ মিটার। বাঁধানো বেদি থেকে ০.৫ মিটার উপরে সংস্কৃত ভাষায় ২৮ পঙ্‌ক্তির একটি লিপি আছে। স্তম্ভের গায়ে বজ্রলেপ ছিলো। স্থানে স্থানে তা উঠে গেলেও স্তম্ভটির গাত্র মসৃণ।

মুকুন্দপুরে হরগৌরী মন্দিরের সন্নিকটে একটি নিচু স্থানে স্তম্ভটি স্থাপন করা হয়েছে।[৬] অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মনে করেন যে, স্তম্ভটি প্রথমে উঁচু স্থানে স্থাপিত হয়েছিলো। প্রাকৃতিক কোনো কারণে হয়তো স্থানটি দেবে গিয়ে নিম্ন-ভূমিতে পরিণত হয়েছে। স্তম্ভটির সন্নিকটে প্রাচীন হরগৌরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। স্থানটি বেশ উঁচু। প্রাকৃতিক কারণে এলাকা নিম্নভূমিতে পরিণত হলে মন্দিরের ধ্বংস্তূপ উঁচু থাকবে কি করে, সেটি একটা প্রশ্ন।

বিশিষ্ট প্রত্নগবেষক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের মত মেনে নিয়েও কিছুটা ভিন্ন মতের অবতারণা করেন। তাঁর মতে, স্তম্ভটি হরগৌরী মন্দিরের পাশে একটি প্রাকৃতিক বিলের একাংশে স্থাপন করা হয়েছিলো।[৭] সরেজমিনে স্তম্ভটি পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, মন্দির ভিন্ন এর চারপাশের প্রায় সব অঞ্চল নিম্নভূমি। সম্ভবত নিম্নভূমির মধ্যেই অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে মন্দিরটি স্থাপন করা হয়। এমন হতে পারে, নিম্নভূমির মধ্যে এই স্থানটি কৃত্রিমভাবে উঁচু করে সেখানে মন্দির নির্মাণ করা হয়। আর স্তম্ভটি স্থাপন করা হয় নিম্ন জলাভূমিতে। এতদঞ্চলে জলাভূমিতে স্তম্ভ স্থাপনের নজির বিরল নয়। নওগাঁ জেলার অনেক প্রাচীন জলাশয়ে স্তম্ভ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দিবর দীঘি (পত্নীতলা), মহিপালের দীঘি (মাহি সন্তোষের মিঠাপুকুর, ধামইরহাট), কুসুম্বা দীঘি (কুসুম্বা মসজিদ সংলগ্ন দীঘি, মান্দা), ছয়ঘাটি দীঘি (চেরাগপুর, নিয়ামতপুর) প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৮] এসব জলাশয়ের মাঝখানে স্তম্ভ রয়েছে। দিবর দীঘির স্তম্ভটি বৃহদাকার এবং পানি থেকে অনেকটা উপরে। অন্যান্য জলাশয়ের স্তম্ভগুলো পানির নীচে। জলাশয় খনন কালে কেনো স্তম্ভ স্থাপন করা হতো, তা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে, এ থেকে এতদঞ্চলে জলাশয়ে স্তম্ভ স্থাপনের প্রমাণ মিলে। এমন হতে পারে যে, বাদাল স্তম্ভটিও এমনই একটি জলাশয়ে স্থাপিত হয়েছিলো।

নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশ্র এ স্তম্ভ মঙ্গলবাড়িতে (মুকুন্দপুরে) স্থাপন করেন। সে কারণে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মনে করেন যে, মঙ্গলবাড়িতে বা এর পাশেই নারায়ণ পাল ও তাঁর বংশের মন্ত্রীদের আবাসস্থল ছিলো। এছাড়া পালদের রাজধানীও ছিলো এর নিকটেই কোথাও। মন্ত্রীদের আবাসস্থলের পাশে রাজধানী হবে সেটাই স্বাভবিক। কিন্তু, মঙ্গলবাড়ি বা এর পাশের কোনো স্থানে অদ্যাবধি কোনো প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়নি। এমনকি হরগৌরী মন্দির ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো প্রাচীন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষও এখানে দেখা যায় না। প্রাকৃতিক বা অন্য কোনো কারণে এখানকার প্রাচীন স্থপনাসমূহ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে, এমন মনে করার কোনো যৌক্তিক

---

[৬] হর বলতে শিবকে এবং গৌরী বলতে তার স্ত্রী পার্বতীকে বুঝানো হয়। শিব ও পার্বতীর যুগলবন্দী মূর্তি অর্চনা করা হতো বলে মন্দিরটির নাম হরগৌরী মন্দির। এখানে শিব-পার্বতীর যুগল মূর্তি সংস্থাপিত ছিলো। নবনির্মিত মন্দিরে প্রায় ১.২১ মিটার উচ্চ অর্ধভগ্ন যুগল মূতিটি স্থাপন করা হয়। দেখুন, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ২৪৬।

[৭] *তদেব*, পৃ. ২৪৭।

[৮] সরেজমিনে দেখা গেছে এতদঞ্চলের অনেক দীঘি-পুকুরেই এমন স্তম্ভ রয়েছে। স্থানীয়রা এসব স্তম্ভকে জাট বলে অভিহিত করে। এ প্রসঙ্গে ধামইরহাট উপজেলার বড় শিমলা (ধামইরহাট ইউনিয়নের জগৎনগর), বড় পুকুরিয়া (উল্লিখিত ইউনিয়নের শিবরামপুর), কামার পুকুর (উমার ইউনিয়নের চক শরীফ), সুতার পুকুরিয়া (ধামইরহাট পৌরসভার মালাহার) প্রভৃতি পুকুরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব পুকুরের মাঝখানে জাট রয়েছে।

কারণ নেই। এ অঞ্চলে পাহাড়পুর, জগদ্দল প্রভৃতি স্থানে পাল আমলের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাকৃতিক কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে এসব নিদর্শন টিকে থাকার কথা নয়। তাই মঙ্গলবাড়িতে বা এর সন্নিকটে কোথাও পালদের রাজধানী ছিলো, এমন মনে করা যৌক্তিক হবে না।

রামপাল কৈবর্তদের নিকট থেকে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করার পর রামাবতীতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি নতুন রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে জগদ্দল বিহার নির্মাণ করেন। মঙ্গলবাড়ি থেকে আনুমানিক ৭ কিলোমিটার দূরে জগদ্দল বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।[৯] সেদিক থেকে বিবেচনা করলে এতদঞ্চলে কোথাও রাজধানী ছিলো একথা জোর দিয়েই বলা যায়। পত্নীতলা উপজেলার আমাইড়কে অনেকে রামাবতীর সাথে অভিন্ন বলে মনে করেন। আবার অনেকের মতে, আমাইড় ছিলো নারায়ণ পাল ও তার পূর্ব-পুরুষদের রাজধানী।[১০] স্থানটি মঙ্গলবাড়ি থেকে আনুমানিক ১৫ কিলোমিটার দূরে। রাজধানী থেকে এমন দূরত্বে মন্ত্রীদের আবাস স্থল হবে কি করে? রামপালের যুদ্ধ মন্ত্রী (মহাসান্ধিবিগ্রহিক) প্রজাপতি নন্দীর আবাস ভূমি ছিলো পুণ্ড্রবর্ধনপুরের সন্নিকটবর্তী বৃহৎবটু।[১১] বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়কে পুণ্ড্রবর্ধনপুরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। এটি মঙ্গলবাড়ি থেকে পূর্ব দিকে ৫০-৫৫ কিলোমিটার দূরে। এখন প্রশ্ন হলো মন্ত্রীরা এতো দূর থেকে কিভাবে রাজাকে সাহায্য করতেন? সম্ভত, মন্ত্রীরা রাজধানীতেই অবস্থান করতেন। তাদের পরিবার থাকতো এসব স্থানে। আবার এমন হতে পারে যে, এসব স্থান ছিলো মন্ত্রীদের স্থায়ী নিবাস, যেখানে বংশানুক্রমিকভাবে তাদের বসবাস ছিলো। দায়িত্ব নেবার পর মন্ত্রীরা পরিবারসহ থাকতো রাজধানীতে। তাদের বংশের অন্যরা, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অন্য সবাই স্থায়ী নিবাসে থেকে যেতো। হতে পারে, গুরব মিশ্রের বংশের এরকম স্থায়ী নিবাস ছিলো মঙ্গলবাড়ি, যেখানে তিনি গরুড় স্তম্ভটি স্থাপন করেছিলেন।

৩. আবিষ্কার ও নামকরণ

ধামইরহাট থানার ঈশবপুর ইউনিয়নের বাদাল নামক স্থানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি বাণিজ্য কুঠি ছিলো।[১২] এই কুঠির অধ্যক্ষ স্যার উইলকিন্স ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাদাল থেকে তিন মাইল দূরে বনভূমির মধ্যে একটি কালো পাথরের লিপিযুক্ত স্তম্ভ 'আবিষ্কার' করেন।[১৩] এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উইলকিন্স লেখেন,

---

[৯] সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ধামইরহাট উপজেলাধীন (নওগাঁ) ধামইরহাট ইউনিয়নের জগদ্দল নামক গ্রামে উৎখননের মাধ্যমে জগদ্দল বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছে।

[১০] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পৃ. ২৮৬।

[১১] R.C. Majumdar, *et al.* (ed.), *The Ramacaritam of Sandhyakaranandin* (Rajshahi: The Varendra Research Meuseum, 1939), p. VII.

[১২] বাদাল একটি শহরের নাম। এর অবস্থান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রফেসর কিলহর্ন লিখেন, "Badal kachari is in the south of the Dinajpur district, 3 miles south-west from the village of Mangalbari, which is on the boarder of the Saguna pargana of the Bogura (Bogra) district and 7 miles south-west from Domdoma station of the Northern Bengal State Railway. Badal is in Long. 88° 58′ E., Lat. 25° 5′ N., and the pillar is about a mile north from it," F. Kielhorn, "Badal Pillar Inscription of the time of Narayanpala," *Epigraphia Indica*, Vol. II (Kolkata: Office of the Superintendent of Government Printing, 1893), p. 160.

[১৩] চার্লস উইলকিন্স ভারতে আগমনকারী অন্যতম প্রথিতযশা ইংরেজ। তিনি ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির চাকরি নিয়ে বাংলায় আসেন। সংস্কৃত ভাষা আয়ত্তকারী প্রথম দুজন ইউরোপীয় নাগরিকের মধ্যে তিনি অন্যতম। অপরজন হলেন কোলব্রুক। এমনকি বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম

> Some time in the month of November, in the year 1780, I discovered, in the vicinity of the town of Buddal, near which the Company have a factory, and which at that time was under my charge, a decapitated monumental column, which at a little distance has very much the appearance of the trunk of a coco-nut tree broken off in the middle. It stands in a swamp overgrown with weeds, near a small temple dedicated to Haragouree, whose image it contains. Upon my getting close enough to the monument to examine it, I took its dimensions, and made a drawing of it; and soon after a plate was engraved, from which the accompanying is an impression.[১৪]

অবশ্য, স্থানীয় লোকজন লিপিযুক্ত এই স্তম্ভটি সম্পর্কে জানতো। উইলকিন্স নিজেই উল্লেখ করেছেন, স্থানীয় লোকরা তাকে জানিয়েছিলো যে, পূর্বে স্তম্ভটি অনেক বেশি লম্বা ছিলো। ধীরে ধীরে এটি মাটির নীচে দেবে গেছে। উইলকিন্স স্তম্ভটি খুড়ে এ দাবির সত্যতা পাননি।[১৫] এ বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, উইলকিন্স স্তম্ভটি নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করেন। আবার স্থানীয় মানুষরা স্তম্ভটি সম্পর্কে যে জানতো সে কথাও এথেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্ভবত, স্থানীয় মানুষের নিকট থেকে খোঁজ পেয়ে উইলকিন্স স্তম্ভটি পরিদর্শনে আসেন এবং এটি তার নিজের আবিষ্কার বলে দাবি করেন। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, উইলকিন্সের আগে কোনো ইউরোপীয় স্তম্ভটি পরিদর্শন করেননি। ভারতে অবস্থানরত কোম্পানির কর্মচারীগণ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা স্তম্ভটি সম্পর্কে অবহিত হয় সম্ভবত উইলকিন্সের মাধ্যমে। এছাড়া উইলকিন্সই প্রথমে এ লিপির পাঠোদ্ধার করেন এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

উইলকিন্সের পর কোম্পানির কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারী স্তম্ভটি পরিদর্শন করেন। এদের মধ্যে মালদহ কুঠির অধ্যক্ষ জর্জ উড্‌নি এবং গুয়ামালতি (মালদহের) কুঠির অধ্যক্ষ ক্রেটনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জর্জ উড্‌নি এবং ক্রেটন যথাক্রমে ১৭৮৩ ও ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্তম্ভটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে এরা স্তম্ভগাত্রে নিজেদের নাম উৎকীর্ণ করেন।[১৬] ফলে মূল লিপির পাশাপাশি স্তম্ভটিতে এ দুজনের নাম খোদিত আছে। অবশ্য বাদাল সোনার ১৭৮০ কথাটিও স্তম্ভটির গায়ে লেখা রয়েছে। কে এই বাদাল সোনার? কেনোই বা তার নাম এই স্তম্ভে খোদিত হয়েছিলো, সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৭৮০ কথাটি উৎকীর্ণ হওয়ায় একথা অনুমান করা যেতে পারে যে, উইলকিন্সের পরিদর্শনকালে স্তম্ভে উক্ত কথাটি খোদিত হয়েছিলো। উইলকিন্স এ সম্পর্কে কোনো

জোন্সও উইলকিন্সের নিকট তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে উইলকিন্স বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। তিনি নিজের হাতে এসব ভাষার অক্ষরগুলো কেটেছিলেন। এছাড়া তিনি ভগবদ্‌গীতা অনুবাদ করেন। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে উইলকিন্স দেশে ফিরে যান এবং সেখানে কোম্পানির গ্রন্থগারিক নিযুক্ত হন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির হেলিবেরি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর পরীক্ষক ও পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাদাল কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। দেখুন, আবু ইমাম, পৃ. ৫০৮, পাদটীকা।

[১৪] Charles Wilkins, p. 119.

[১৫] উইলকিন্স লিখেন, "... and it has lost by accident a considerable part of its original height. I was told upon the spot that it had, in the course of time, sunk considerably in the ground; but upon my digging about the foundation I found this was not the case." Charles Wilkins, p. 119.

[১৬] অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, পৃ. ৭০।

মন্তব্য করেননি। সমসাময়িক কালের অন্য কোনো উৎসেও এসম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর।

উইকিন্স কর্তৃক 'আবিষ্কৃত' লিপিটির নামকরণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। সাধারণ মানুষ একে ভীমের পান্টি বলে মনে করে। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী বিশ্বকর্মা ভীম সারারাত পৃথিবী চাষ শেষে প্রত্যুষে স্বর্গে উঠে যান। স্বর্গে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বলদ ও লাঙল-জোয়াল নিয়ে ফিরে গেলেও তাঁর বিশালাকার পান্টিটি (ছড়িটি) হরগৌরী মন্দিরের পাশে প্রোথিত করে যান। সনাতন ধর্মের অনুসারীগণ স্তম্ভটিকে পূজা দেন সম্ভবত এ বিশ্বাস থেকে। যাহোক, কিংবদন্তী অনুসারে ভীমের রেখে যাওয়া ছড়ি বলেই এর নাম 'ভীমের পান্টি'। স্তম্ভটিকে নিয়ে এমন কল্পিত কাহিনী কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তা বলা মুশকিল। এমন হতে পারে যে, মানুষ অসাধারণ এই স্তম্ভটিকে একটি অতি-পার্থিব জিনিস মনে করে এবং ক্রমান্বয়ে একে কিংবদন্তীতে পরিণত করে। সম্ভবত প্রাচীন হরগৌরী মন্দিরের অস্তিত্ব এদের এমন চিন্তায় সহায়ক ভূমিকা রাখে। ভীম পৃথিবীতে পান্টি রেখে গেলে তা হরগৌরী মন্দিরের পাশে রেখে যাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষের উপরে একটি নতুন হরগৌরী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানকার পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণগণেরও এমন তত্ত্ব প্রচার করা অস্বাভাবিক নয়। ফলে স্তম্ভটি সাধারণ মানুষের নিকট ভীমের পান্টি নামে পরিচিতি পেয়েছে। অবশ্য স্তম্ভটির ভীমের পান্টি নামকরণ অনেক পুরাতন। দিনাজপুর জেলা কালেক্টর ই.ভি. ওয়েস্টম্যাকটের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, উনিশ শতকেও স্থানীয়রা এই স্তম্ভকে ভীমের পান্টি বলে জানতো।[১৭]

মঙ্গলবাড়ি হাটের সন্নিকটে স্তম্ভটি অবস্থিত। এ কারণে অনেকে একে 'মঙ্গলবাড়ি স্তম্ভলিপি' নামে অভিহিত করেন। মূলত হরগৌরী মন্দির ও এর পাশের স্তম্ভটিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবাড়ি হাটের নামকরণ হয়। হরগৌরী মন্দিরের ঠাকুরেরা শুভজল বা মঙ্গলবারি বিতরণ করতো। এখানে দূরদূরান্ত থেকে অনেক মানুষ এই জল নিতে আসতো। মুকুন্দপুর মৌজায় অবস্থিত এখানকার হাটটি ক্রমান্বয়ে মঙ্গলবাড়ি হাট (মঙ্গল বারির হাট>মঙ্গলবারি হাট>মঙ্গলবাড়ি হাট) নামে পরিচিতি পায়। বস্তুত, হরগৌরী মন্দির এবং স্তম্ভটির কারণে হাটটির এমন নামকরণ হয়। পরিচিত হাট মঙ্গলবাড়ির নামে স্তম্ভটিকে অভিহিত করা হলে হয়তো এর অবস্থান বুঝতে কিছুটা সুবিধা হবে। অনেক লিপির নামকরণ লিপির প্রাপ্তি স্থানের নামে করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দামোদরপুর তাম্রশাসন, বৈগ্রাম তাম্রশাসন, বেলওয়া তাম্রশাসন, দেওপাড়া প্রশস্তি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু বাদাল স্তম্ভলিপির ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। স্তম্ভটির অবস্থান মুকুন্দপুর নামক স্থানে। মঙ্গলবাড়ি হাট মুকুন্দপুর মৌজায় হলেও স্তম্ভটি হাট থেকে খানিকটা দূরে। আবার হাটটির নামকরণ হয়েছে হরগৌরী মন্দির ও স্তম্ভটির কারণে। যার কারণে মঙ্গলবাড়ি হাটের নামকরণ, তার নামকরণ আবার ঐ হাটের নামেই করা যৌক্তিক হবে কি-না প্রশ্নসাপেক্ষ। অবস্থান ছাড়া আর কোনো বিষয়ে লিপিটির সাথে মঙ্গলবাড়ি হাটের তেমন সংশ্লিষ্টতা নেই।

---

[১৭] ওয়েস্টম্যাকট্ লিখেন, "...Buddal was a factory in the Company's commercial days; it is on the *Kulkuli-khari*, about ten miles E. N. E. from Patnitala police station. The pillar is less than amile N. E. of it (Badal), near Mangalbari, and goes by the name of 'Bhim's ox goad' (*Bhimer Panti*)," "Transcript of the Pala Inscription of the Buddal Pillar, Dinajpur, by Pandit Harachandra Chakravati, Communicated by E. V. Westmacott, C. S. – With an Annotated Translation by Pratapchandra Ghosha, B. A., Assistant Secretary, Asiatic Society, Bengal," *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XLIII, Pt. I (Kolkata: Baptist Mission Press, 1874), p. 356.

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় স্তম্ভলিপিটি 'গরুড় স্তম্ভলিপি' হিসেবে আখ্যায়িত হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তিনি লিখেন, "প্রকৃত প্রস্তাবে, এই প্রশস্তি একটি গরুড়-স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছে বলিয়া, ইহা 'গরুড় স্তম্ভ-লিপি' নামেই কথিত হইবার যোগ্য।"[১৮] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়াসহ সমসাময়িক কালের অনেক পণ্ডিত একে গরুড় স্তম্ভলিপি হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৯] তবে, গরুড় স্তম্ভে উৎকীর্ণ বলে একে গরুড় স্তম্ভলিপি বলা খুব একটা যুক্তিযুক্ত হবে না। গরুড় স্তম্ভে উৎকীর্ণ অন্য কোনো লিপিও আবিষ্কৃত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এর নামকরণ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে।

বাদাল কুঠির অধ্যক্ষ চার্লস্ উইলকিন্স প্রথম একে 'Inscription on a pillar near Buddal' বলে উল্লেখ করেন। তিনি লিপিটির প্রথম পাঠোদ্ধার করেছিলেন। পরবর্তীকালে ই.ভি ওয়েস্টম্যাক্ট এ লিপির পাঠোদ্ধারের প্রয়াস পান। এরপর প্রফেসর কিলহর্ন লিপিটির পাঠ সংস্করণ করে তা প্রকাশ করেন। ওয়েস্টম্যাকট্ ও কিলহর্ন উভয়েই একে বাদাল স্তম্ভলিপি (Badal Pillar Inscription) নামে অভিহিত করেন।[২০] বলা বাহুল্য, এরা উইলকিন্সের সম্মানে বাদাল কুঠির নামের সঙ্গে জড়িয়ে লিপিটির এমন নামকরণ করেন। পণ্ডিতগণ তাঁদের লেখনিতে ওয়েস্টম্যাকট্ ও কিলহর্নের দেওয়া 'বাদাল স্তম্ভলিপি' নামটি ব্যবহার করতে থাকেন। কালক্রমে এটি লিপিটির বহুল প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত নামে পরিণত হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক পণ্ডিত লিপিটির নাম বিকৃত করে ফেলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা একে বাদল, বাদলা বা ষাদলা স্তম্ভলিপি বলে উল্লেখ করেন। সম্ভবত, ইংরেজি Badal শব্দটির বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে তারা এমনতর বিভ্রাট তৈরি করেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক আবু ইমাম, আব্দুল মমিন চৌধুরী, মোখলেছুর রহমান প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা সবাই লিপিটির ভ্রান্ত নাম উল্লেখ করেন।[২১]

৪. লিপির পাঠোদ্ধার

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে স্তম্ভলিপিটি 'আবিষ্কার' করার পর উইলকিন্স এর পাঠোদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। তিনি কিভাবে এর পাঠোদ্ধার করেন সে সম্পর্কে জানার কোনো উপায় নেই। তিনি ইংরেজি ভাষায় এর মর্মানুবাদ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর এই পাঠ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল *Asiatic Researches*-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[২২] ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে লিপিটির ইংরেজি মর্মানুবাদ পাঠিয়েছিলেন। একথা সহজেই বলা যায় যে, তিনি লিপিটির পাঠোদ্ধার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন এর আগেই। উইলকিন্সের এই প্রচেষ্টা মহৎ ছিলো, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি লিপিটির মূল সংস্কৃত পাঠ সংকলন করেননি। এছাড়া তাঁর পাঠ সর্বাংশে নির্ভুল ছিলো, এমন নয়। লিপিটির কোনো কোনো শ্লোকের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতগণ উইলকিন্সের পাঠের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। ফলে লিপিটির পাঠোদ্ধার তথা পাঠ সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

---

[১৮] অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, পৃ. ৭০।

[১৯] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পৃ. ২৪৭।

[২০] F. Kielhorn, p. 160.

[২১] এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

[২২] Charles Wilkins, p. 119-125.

দিনাজপুর জেলা কালেক্টর ই.ভি. ওয়েস্টম্যাক্ট পণ্ডিত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত লিপিটির একটি পাঠ এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সেক্রেটারি প্রতাপচন্দ্র ঘোষ এর ইংরেজি অনুবাদ করে তা সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন।[২৩] এ পাঠে সংস্কৃত মূল পাঠসহ এর ইংরেজি অনুবাদ সংযোজিত হয়। বাদাল স্তম্ভলিপির নতুন পাঠ প্রকাশ সম্পর্কে জার্নালটিতে লেখা হয়,

> In the 1st volume of the 'Asiatic Researches,' a translation is given of this inscription by Wilkins, but without the text. A short time ago, Mr. E.V. Westmacott, C. S. obtained a transcript from Pandit Harachandra Chakravarti which is given bellow with a fresh translation.[২৪]

কিন্তু এই পাঠ একেবারেই মান সম্মত হয়নি। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এ সম্পর্কে লিখেছেন, "[১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে] দিনাজপুরের কালেক্টর ওয়েষ্টমেকট্ পণ্ডিতবর হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত একটি পাঠ প্রেরণ করায়, [শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষজকৃত ইংরাজী অনুবাদসহ] তাহা সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া, নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইতেছিল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সপ্তম এবং ত্রয়োদশ শ্লোক ভিন্ন আর একটি শ্লোকও যথাযথভাবে উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই; বরং অধিকাংশ স্থলেই, স্বকপোল-কল্পিত পাঠ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।" বলা বাহুল্য, পণ্ডিতগণ এমনতর পাঠের সঙ্গে একেবারেই একমত পোষণ করতে পারেননি।

বিশিষ্ট পণ্ডিত প্রফেসর কিলহর্ন লিপিটির পাঠ সংস্করণে এগিয়ে আসেন। সম্ভবত এজন্য তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়েছিলো। লিপিটির পাঠ সংস্করণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লেখেন,

> I now edit the inscription, of which a complete and trustworthy text has not yet been published, from impression, which at Dr. Burgess' request the government of India has had prepared by Mr. H.B.W. Garrick.[২৫]

কিলহর্ন উইলকিন্স ও পণ্ডিত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পাঠ সংস্করণ (edit) করে লিপিটির একটি পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি পাঠ তৈরি করেন। এটি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে *Epigraphia India* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সামান্য কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও অধিকাংশ পণ্ডিত কিলহর্নের এই পাঠ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

অবশ্য কিলহর্নের পাঠ প্রকাশিত হবার পরও লিপিটির কয়েক স্থলে পাঠের সংশয় থেকে যায়। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মন্তব্য করেন, "যাহারা এই প্রস্তর-লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তহারা সকলেই ইহার ব্যাখ্যা কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ হইয়া, অনেকেই প্রকৃত ব্যাখ্যার সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক কিলহর্নের উদ্ধৃত পাঠেও দুই এক স্থলে সংশয়ের অভাব ছিল না।"[২৬] এমনতর অবস্থায় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি উপর্যুপরি লিপিটির পাঠ সংকলনের চেষ্টা করে। সমিতি প্রচলিত পাঠসমূহ সংগ্রহপূর্বক স্তম্ভ গাত্রের লিপির সাথে তা মিলিয়ে দেখে একটি 'বিশুদ্ধ' পাঠ মুদ্রণের ব্যবস্থা করে। সমিতি লিপিটির এই 'বিশুদ্ধ' পাঠ বিনা মূল্যে বিতরণ করে।[২৭] সমিতির বিতরণকৃত ঐ পাঠের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। সম্ভবত, ঐ পাঠ বাংলা ভাষায় করা হয়নি। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মন্তব্য করেছেন, "এই লিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ

---

[২৩] E.V. Westmacott, pp. 356-363.

[২৪] Ibid., p. 356.

[২৫] F. Kielhorn, p. 160.

[২৬] অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, পৃ. ৭১।

[২৭] *তদেব*।

সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকিলেও, এ পর্য্যন্ত ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই।"[২৮] যাহোক, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম প্রাণপুরুষ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বাংলা ভাষায় লিপিটির পাঠ সংকলন করেন। সম্ভবত সমিতির পাঠের উপরে ভিত্তি করেই এই পাঠ সংকলন করা হয়েছিল। বর্তমান সময় পর্যন্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের পাঠকে গ্রহণযোগ্য পাঠ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৫. বাদাল স্তম্ভলিপির পাঠ

বাদাল স্তম্ভলিপির বৈশিষ্ট্য আধুনিক লিপি থেকে খুবই স্বতন্ত্র। এই লিপিটিতে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ২৯টি পঙ্‌ক্তি (লাইন) সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে ১ থেকে ২৮ নং পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত ২৮টি পূর্ণ পঙ্‌ক্তি রয়েছে। সেই সাথে ২৯ নং সারিতে একটি সংক্ষিপ্ত পঙ্‌ক্তি আছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ ইঞ্চির মতো। এছাড়া বাকি পঙ্‌ক্তিগুলো এক ফুট সোয়া চার ইঞ্চি থেকে এক ফুট দশ ইঞ্চি পর্যন্ত দীর্ঘ। লিপিটির উচ্চতা এক ফুট পৌনে আট ইঞ্চি। ১ এবং ২ নং পঙ্‌ক্তির দুইটি অক্ষর এবং ২৫-২৬ নং পঙ্‌ক্তির ১৬ নং অক্ষরের পাথর উঠে যাওয়ায় (peeling off) তা পাঠযোগ্য নয়। এছাড়া লিপিটির কয়েকটি অক্ষর কিছুটা বিকৃত হয়ে গেছে। এটুকু সমস্যা বাদ দিলে লিপিটি সুলিখিত এবং এটি আগাগোড়া সঠিকভাবে পাঠ করা যায়।[২৯] নীচে লিপিটির বঙ্গানুবাদ প্রদান করা হলো:

১। "শাণ্ডিল্য বংশে [বিষ্ণু?] তদীয় অন্বয়ে বীরদেব, তদ্‌গোত্রে পাঞ্চাল এবং পাঞ্চাল হইতে [তৎপুত্র] গর্গ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। "সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে,– [শক্র] ইন্দ্রদেব কেবল পূর্বদিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না; [কিন্তু বৃহস্পতির মতো মন্ত্রী থাকিতেও] তিনি সেই একটি মাত্র দিকেও [সদ্যঃ] দৈত্যপতিগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন; [আর] আমি সেই পূর্ব দিকের অধিপতি ধর্ম [নামক] নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।

৩। "নিসর্গ-নির্মল-স্নিগ্ধা চন্দ্রপত্নী কান্তিদেবীর ন্যায়, অন্তর্বিবর্তিনী ইচ্ছার অনুরূপা, তাঁহার ইচ্ছা নাম্নী পত্নী ছিলেন।

৪। "বেদচতুষ্টয়রূপ-মুখপদ্ম-লক্ষণাক্রান্ত, স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট পদগৌরবে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, কমলযোনি ব্রহ্মার ন্যায়, তাঁহাদের দ্বিজোত্তম পুত্র নিজের 'শ্রীদর্ভপাণি' এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। "সেই দর্ভপাণির নীতি কৌশলে শ্রীদেবপাল [নামক] নৃপতি মতঙ্গজ-মদাভিষিক্ত-শিলাসংহতিপূর্ণ রেবা [নর্মদা] নদীর জনক [উৎপত্তি স্থান বিন্ধ্য পর্বত] হইতে [আরম্ভ করিয়া] মহেশ-ললাট-শোভী-ইন্দু-কিরণ-শ্বেতায়মান গৌরীজনক [হিমালয়] পর্বত পর্যন্ত, সূর্যোদয়াস্ত কালে অরুণ রাগ-রঞ্জিত [উভয়] জলরাশির আধার পূর্ব-সমুদ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র [মধ্যবর্তী] সমগ্র ভূভাগ কর-প্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৬। "নান-মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণিতল-বিসর্পি ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া দিকচক্রাগত-ভূপাল বৃন্দের চিরসঞ্চারমান সেনাসমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল [নামক] নরপাল [উপদেশ গ্রহণের জন্য] দর্ভপাণির অপেক্ষায়, তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

---

[২৮] তদেব।

[২৯] F. Kielhorn, p. 160.

৭। "সুররাজ কল্প [দেব পাল] নরপতি [সেই মন্ত্রিবরকে] অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী [মহার্হ] আসন প্রদান করিয়া, নানা নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদ-পাংসু হইয়াও স্বয়ং সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।

৮। "অত্রি হইতে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার এবং শর্করাদেবীর পরমেশ্বর বল্লভ শ্রীমান সোমেশ্বর [নামক] পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

৯। "তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত [উচ্চ] স্থানে আরোহণ করিয়াও, [বিক্রম প্রকাশের পাত্রপাত্র-বিচার-সময়ে ধনঞ্জয়ের ন্যায়] ভ্রান্ত বা নির্দয় হইতেন না; তিনি অর্থিগণকে বিত্ত বর্ষণ করিবার সময়ে, [তাহাদের মুখের] স্তুতি-গীতি শ্রবণের জন্য উদগর্ব হইতেন না, তিনি ঐশ্বর্যের দ্বারা বহু বন্ধুজনকে [সংবলিগত] নৃত্যশীল করিতেন; [বৃথা] মধুর বচন প্রয়োগেই তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেন না। [সুতরাং] এই সকল জগতবিসদৃশ-স্বগুণ গৌরবে তিনি সাধুজনের বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়াছিলেন।

১০। "শিব যেমন শিবার, [এবং] হরি যেমন লক্ষ্মীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ গৃহাশ্রম-প্রবেশ-কামনায় আত্মানুরূপা রল্লাদেবীকে যথাশাস্ত্র [পত্নীরূপে] গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। "তাঁহাদিগের কেদার মিশ্র নামে তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভ কার্তিকেয়-তুল্য [এক] পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার [হোমকুণ্ডোত্থিত] অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নি-শিখাকে চুম্বন করিয়া, দিক্‌চক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা [যোগ্য পাত্র পাইয়া] তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। তিনি স্ব-কর্মগুণে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন।

১২। "তিনি বাল্যকালে একবার মাত্র দর্শন করিয়াই, চতুর্বিদ্যা পয়োনিধি পান করিয়া, তাহা আবার উদগীর্ণ করিতে পারিতেন বলিয়া, অগস্ত্যপ্রভাবকে উপহাস করিতে পারিয়াছিলেন।

১৩। "[এই মন্ত্রিবরের] বুদ্ধি-বলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর [দেবপাল দেব] উৎকল-কূল উৎকলিত করিয়া, হূণ-গর্ব খর্বীকৃত করিয়া এবং দ্রবিড়-গুর্জর-নাথ-দর্প-চূর্ণকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমুদ্র-মেখলা-ভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৪। "তিনি যাচকগণকে যাচক মনে করিতেন না;– মনে করিতেন, তাঁহার দ্বারা অপহৃত-বিত্ত হইয়াই, তাহারা যাচক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আত্মা শত্রু-মিত্রে নির্বিবেক ছিল। [কেবল] ভব-জলদি-জলে পতিত হইবার ভয় এবং লজ্জা [ভিন্ন] অন্য উদ্বেগ ছিল না। তিনি [সংযমাদি অভ্যাস করিয়া] বিষয় বাসনা ক্ষালিত করিয়া, পরম-ধাম-চিন্তায় আনন্দ লাভ করিতেন।

১৫। "সেই বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি [কেদার মিশ্রের] যজ্ঞস্থলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র তুল্য শত্রু-সংহারকারী নানা-সাগর-মেখলা-ভরণা বসুন্ধরার চির-কল্যাণকামী শ্রী শূরপাল [নামক] নরপাল, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র [শান্তি] বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৬। "তাঁহার দেবগ্রাম জাতা বব্বা [দেবী] নাম্নী পত্নী ছিলেন। লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া, এবং [দক্ষ-দুহিতা] সতী অনপত্যা [অপুত্রবর্তী] বলিয়া, তাঁহাদের সহিত [বব্বা দেবীর] তুলনা হইতে পারে না।

১৭। "দেবকী গোপাল-প্রিয়কার পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশোদা সেই লক্ষ্মীপতিকে [আপন পুত্ররূপে] স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বব্বা দেবীও, সেইরূপ, গো-পাল-প্রিয়কারক পুরুষোত্তম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন; যশো-দাতারা তাঁহাকে লক্ষ্মীর পতি বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮। "তিনি জমদগ্নিকুলোৎপন্ন সম্পন্ন-ক্ষত্র-চিন্তক [অপর] দ্বিতীয় রামের [পরশুরামের] ন্যায়, রাম [অভিরাম] গুরবমিশ্র এই আখ্যায় [পরিচিত ছিলেন]।

১৯। "[পাত্রাপাত্র-বিচার] কুশলগুণবান্ বিজিগীষু শ্রীনারায়ণ পাল [নরপতি] যখন তাঁহাকে মাননীয় মনে করিতেন, তখন আর তাঁহার অন্য [প্রশস্তি] প্রশংসা-বাক্য কি [হইতে পারে?]।

২০। "তাঁহার বাগবৈভবের কথা, আগমে ব্যুৎপত্তির কথা, নীতিতে পরম নিষ্ঠার কথা, মহতের গুণ-কীর্তনে আসক্তির কথা, জ্যোতিষে অধিকারের কথা, এবং বেদার্থ-চিন্তা-পরায়ণ অসীম-তেজঃসম্পন্ন তদীয় বংশের কথা, ধর্মাবতার ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

২১। "সেই শ্রীভৃৎ [ধনাঢ্য] এবং বাগধীশ [সুপণ্ডিত] ব্যক্তিতে একত্র মিলিত হইয়া, পরস্পরের সখ্য-লাভের জন্যই, স্বাভাবিক শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মী এবং স্বরস্বতী উভয়েই যেন [একত্র] অবস্থিতি করিতেছেন।

২২। "শাস্ত্রানুশীলন-লব্ধ-গভীর-গুণ-সংযুক্ত বাক্যে [তর্কে] তিনি বিদ্বৎ সভায় প্রতিপক্ষের মদগর্ব চূর্ণ করিয়া দিতেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও অসীম-বিক্রম-প্রকাশে, অল্পক্ষণের মধ্যেই, শত্রুবর্গের 'ভটাভিমান' যোদ্ধা বলিয়া অভিমান] বিনষ্ট করিয়া দিতেন।

২৩। "যে বাক্যের ফল তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হইতনা, তিনি সেরূপ [বৃথা] কর্ণ-সুখকর বাক্যের অবতারণা করিতেন না। যেরূপ দান পাইয়া [অভীষ্ট পূর্ণ হইল না বলিয়া] যাচককে অন্য ধনীর নিকট গমন করিতে হয়, তিনি কখনও সেরূপ [কেলি-দানের] দান-ক্রীড়ার অভিনয় করিতেন না।

২৪। "কলিযুগ-বাল্মীকির জন্ম-সূচক, অতি রোমাঞ্চোৎপাদক, ধর্মেতিহাস-গ্রন্থ-সমূহে, সেই পূণ্যাত্মা শ্রুতির বিবৃতি [ব্যাখ্যা] করিয়াছিলেন।

২৫। "তাঁহার সুর-তরঙ্গিনীর ন্যায় অ-সিন্ধু-গামিনী প্রসন্ন-গম্ভীরা বাণী [জগৎকে] যেমন তৃপ্তিদান করিত, সেইরূপ পবিত্র করিত।

২৬। "তাঁহার বংশে ব্রহ্মা স্বয়ং পিতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, আবার স্বয়ং পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; [ইতি] এইরূপ মনে করিয়া, [লোকে] তাঁহার পূর্বপুরুষগণের এবং তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত।

২৭। "তাঁহার [সুকুমার] শরীর-শোভার ন্যায় লোক-লোচনের আনন্দদায়ক, তাঁহার উচ্চান্তঃকরণের অতুলনীয় উচ্চতার ন্যায় উচ্চতা-যুক্ত, তাঁহার সুদৃঢ় প্রেম-বন্ধনের ন্যায় দৃঢ়সংবদ্ধ, কলি-হৃদয়-প্রোথিত-শল্যবৎ সুস্পষ্ট [প্রতিভাত] এই স্তম্ভে, তাঁহার দ্বারা হরির প্রিয়সখা ফণিগণের [শত্রু] এই গরুড়মূর্তি তার্ক্ষ্য] আরোপিত হইয়াছে।

২৮। "তাঁহার যশ অখিল দিগন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, এই পৃথিবী হইতে পাতাল-মূল পর্যন্ত গমন করিয়া, [আবার] এখানে হৃতাহি-গরুড়চ্ছলে উত্থিত হইয়াছে।"[৩০]

৬. ঐতিহাসিক গুরুত্ব

আঠারো শতকের আশির দশকে বাদাল স্তম্ভলিপির পাঠ উদ্ধারের মাধ্যমে ভারতীয় লিপি বিজ্ঞানের যাত্রা আরম্ভ হয়।[৩১] অবশ্য একই বছর (১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে) মুঙ্গেরে একটি তাম্রশাসন আবিষ্কার হয়। বাদাল স্তম্ভলিপির কিছু আগে উইলকিন্স ভূমি দান বিষয়ক এই লিপিটির পাঠোদ্ধার করেন। সম্ভবত, এটি ছিলো ভারতে ইংরেজগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রথম লিপি। কিন্তু উইলকিন্সের এই পাঠ (মুঙ্গের তাম্রশাসনের)

---

[৩০] অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। আরো দেখুন, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৮-২৫১।

[৩১] আবু ইমাম, পৃ. ৫০৮।

কোথাও মুদ্রিত হয়নি।[৩২] বস্তুত, ১৭৮৮ খিস্টাব্দে বাদাল লিপির পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে ভারতে লিপি বিজ্ঞানের (Epigraphy) যাত্রা শুরু। প্রফেসর আবু ইমাম লিখেন, "এটি আমাদের কিছু কম শ্লাঘার বিষয় নয় যে, ভারতীয় লিপি বিজ্ঞানের শুরু আমাদের এই বরেন্দ্র ভূমিতে এবং এরই একটি লিপি (বাদল [sic.] স্তম্ভলিপি) দিয়ে।"[৩৩]

পাল সাম্রাজ্য পূর্বে বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে শুরু করে পশ্চিমে অন্তত মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। সঙ্গত কারণে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, পালদের আদি নিবাস কোথায় ছিলো? কোথা থেকেই বা তাদের উত্থানের সূচনা হয়? সন্ধাকর নন্দী বরেন্দ্র ভূমিকে পাল নৃপতিদের 'জনকভূ' বা পিতৃভূমি বলে অভিহিত করেছেন।[৩৪] বরেন্দ্র যে পালদের আদি নিবাস তার পরোক্ষ প্রমাণ বাদাল লিপিতে রয়েছে। বাদাল স্তম্ভলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, পালরা প্রথমে শুধুমাত্র পূর্ব দিকের (সম্ভবত বরেন্দ্রের) অধিপতি ছিলেন।[৩৫] পরে তাদের সাম্রাজ্য অন্যান্য দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং মগধ তাদের রাজ্যভুক্ত হয়।

বাদাল স্তম্ভলিপিতে ধর্মপালকে 'উত্তরাঞ্চলের অভিভাবক' (the regent of the east) বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৩৬] তিনি মন্ত্রী গর্গের পরামর্শ বলে এমন কৃতিত্ব অর্জন করেন। গুজরাটি কবি সোড্ঢলও তাঁর *উদয় সুন্দরী কথা* চম্পুকাব্যে ধর্মপালকে উত্তরপথস্বামী বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৭] অবশ্য, ধর্মপাল সমগ্র আর্যাবর্তের অধিপতি ছিলেন কি-না, সে সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। মনে করা যায় যে, ধর্মপাল অন্তত উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। সম্ভবত তাঁর সময়েই বরেন্দ্র ভূমির পাল রাজ্য মগধ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বাদাল লিপি একথারই আভাস দেয়। দেবপালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি সম্ভব হয়। তিনি উৎকল, হুণ, দ্রাবিড়, গুর্জর ও নাথদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেন বলে লিপিতে দাবি করা হয়েছে।[৩৮] লিপি মতে, এমন কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছিলো মন্ত্রী দর্ভপাণির নীতির কারণে। এছাড়া দর্ভপাণির (এবং তাঁর স্ত্রী শর্করাদেবীর) পুত্র সোমেশ্বরের (কেদারমিশ্র) পরামর্শ গুণে গৌড়েশ্বর (সম্ভবত দেবপাল) উৎকল, হুণ, দ্রাবিড় ও গুর্জরদের পরাস্ত করতে বা বাধা দিতে সমর্থ হন। তিনি গুরপালেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁকেও সুপরামর্শ প্রদান করেন।[৩৯] সর্বশেষে কেদার মিশ্রের (ও বব্বা দেবীর) পুত্র রাম গুরব মিশ্র নারায়ণ পাল কর্তৃক উচ্চ আসনে সমাসীন হন।[৪০] কিলহর্ন মন করেন যে, ভাগলপুর লিপিতে নারায়ণ পালের 'দূতক'

---

[৩২] ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে উইলকিন্স মুঙ্গের লিপির পাঠোদ্ধার করেন। কিন্তু মুদ্রিত না হওয়ায় তিনি কেমন পাঠোদ্ধার করেন, তা জানার উপায় নেই। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে *Asiatic Researches* পত্রিকা ১ম সংখ্যায় এলিপির একটি ফটোলিথোগ্রাফ ছাপানো হয় (পৃ. ১২৩-১৩০ এবং ১৪২)। বস্তুত, পাঠোদ্ধারকৃত ও মুদ্রিত প্রথম লিপি ছিলো বাদাল স্তম্ভলিপি। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, পৃ. ৩৩।

[৩৩] আবু ইমাম, পৃ. ৫০৮।

[৩৪] "His (Rāmpāla's) beautiful father-land (Varendrī), decorated with houses as well as lines of furrows, was occupied by his enemy named Divya (Divokka), an (officer) sharing royal fortune, who rose to a high position, (but) who took to fraudulant practice as a vow," R.C. Majumdar *et al.* (tr. & ed.), v. 38 B, p. 30.

[৩৫] শ্লোক ২।

[৩৬] শ্লোক ১ ও ২।

[৩৭] মুহম্মদ আব্দুর রহিম প্রমুখ, পৃ. ৪৬।

[৩৮] শ্লোক ৫ ও ১৪।

[৩৯] শ্লোক ১৫।

[৪০] শ্লোক ১৮ ও ১৯।

হিসেবে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ভট্ট গুরব আর বাদাল লিপির গুরব মিশ্র অভিন্ন ব্যক্তি।[৪১] যাহোক, এ লিপি থেকে নারায়ণ পাল নামক একজন পাল নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার মন্ত্রী বা দূতক ছিলেন গুরব মিশ্র।

বাদাল স্তম্ভলিপিতে দাবি করা হয়েছে যে, পরাক্রান্ত রাজা দেবপাল মন্ত্রী দর্ভপাণির উপদেশ গ্রহণের জন্য তার দ্বারে দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তিনি আগে মন্ত্রীকে আসন দান করে নিজে পরে বসতেন।[৪২] লিপিকারের এমন অতিরঞ্জিত বক্তব্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু আছে বলা দুষ্কর। তবে, এথেকে পাল সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের বিশেষ প্রতিপত্তির আভাস পাওয়া যায়। পালদের মন্ত্রীরা শুধুমাত্র পরামর্শ দিয়েই রাজার উপকারে আসতেন না, বরং তারা যুদ্ধেও যোগ দিতেন।[৪৩] তাদের এমন প্রতিপত্তি সম্ভবত সে কারণেই। এছাড়া বাদাল লিপি থেকে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের উচ্চ নীতিজ্ঞান ও উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পাল মন্ত্রী কেদার মিশ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজের অর্জিত সম্পদকে নিঃস্ব মানুষের সম্পদ বলে জ্ঞান করতেন।[৪৪]

বাদাল স্তম্ভলিপি পাল যুগে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়বাদিতার পরিচয় বহন করে। লিপিটিতে উল্লিখিত চার জন নৃপতির সবাই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের মন্ত্রীরা সবাই ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু, ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য। উচ্চ মার্গের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা লালন না করলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল নৃপতিগণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন কেন? শুরপাল স্বয়ং উপস্থিত হয়ে পণ্ডিতদের নিকট থেকে মঙ্গলবারি গ্রহণ করেন বলে বাদাল লিপিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।[৪৫] এ সময়ে সাংস্কৃতিক সমন্বয় এতোটা সম্পন্ন হয়েছিলো যে, মঙ্গলবারি বিতরণের মতো হিন্দুদের একটি যজ্ঞানুষ্ঠান আন্তঃধর্মীয় পার্বণে পরিণত হয়। বৌদ্ধদের বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি শাখা ও গোত্রের উদ্ভব এবং এদের সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি সম্ভবত এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

বাদাল স্তম্ভলিপি পাল সাম্রাজ্যের মন্ত্রীদের যোগ্যতার পরিচয় বাহক। এতে গুরব মিশ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয় –

অতিলোমহর্ষণেষু কলিযুগ-বাল্মীকি-জন্মাপিষুনেষূ।
ধর্ম্মেতিহাস-পর্ব্বসু পুণ্যাত্মা যঃ শ্রুতীর্ব্ব্যবৃনোৎ ॥
অ-সিন্ধু-প্রসৃত যস্য স্বর্ধুনী [ব সহস্রধা]।
বাণী প্রসন্ন-গম্ভীরা ধিনোতি চ পুণাতি চ ॥[৪৬]

সাহিত্যিক ক্ষেত্রে গুরব মিশ্রের প্রতিভার প্রশংসা এতে রয়েছে।[৪৭] পাল যুগে মন্ত্রী-অমাত্যদের একটি প্রশংসনীয় গুণ ছিলো সাহিত্য চর্চা। পাল নৃপতিগণও সম্ভবত সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দিতেন। অন্তত মন্ত্রী-অমাত্য ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ এক্ষেত্রে পাল রাজাদের নিকট থেকে অনুপ্রেরণা পেতেন। ভারতের প্রথম ইতিহাস-সাহিত্য রচনাকারী সন্ধাকর নন্দীর পিতা প্রজাপতি নন্দী রাম পালের

---

[৪১] F. Kielhorn, p. 161.
[৪২] শ্লোক ৬ ও ৭।
[৪৩] শ্লোক ২২।
[৪৪] শ্লোক ১৪।
[৪৫] শ্লোক ১৫।
[৪৬] শ্লোক ২৪ ও ২৫; বঙ্গানুবাদের জন্য উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিদ্বয় দেখুন।
[৪৭] দীনেশ চন্দ্র সরকার, *শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ* (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮২), পৃ. ১৯৪-১৯৫।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক (যুদ্ধ মন্ত্রী) ছিলেন।[৪৮] সন্ধাকর নন্দীর রচনার অনুপ্রেরণা পাল নৃপতিদের নিকট থে
আসা অসম্ভব নয়।

এছাড়া বাদাল স্তম্ভলিপির সাহিত্যিক মূল্য নেহাত কম নয়। পদ্যাকারে বিরচিত এই লি
অসামান্য সুন্দর রচনা শৈলীর নিদর্শন। লিপিকার বিষ্ণুভদ্রের কাব্য প্রতিভার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

৭. উপসংহার

পাল সাম্রাজ্যের মন্ত্রী গুরবমিশ্র তাঁর স্থায়ী নিবাস মুকুন্দপুরে (মঙ্গলবাড়ি) লিপিযুক্ত গরুড় স্তম্ভটি স্থাপ
করেন। মুকুন্দপুরের হরগৌরী মন্দির ছিলো তার পুর্ব-পুরুষের (কেদার মিশ্রের) যজ্ঞস্থল। সম্ভবত
কারণে তিনি এখানে স্তম্ভ স্থাপনে অনুপ্রাণিত হন। স্তম্ভটিতে গুরবমিশ্র ও তাঁর পরিবারের একটি প্রশ
সংযোজিত হয়। কাব্যাকারে রচিত এই প্রশস্তিতে পাল নৃপতিগণের (অন্তত চার জনের) নাম এ
সমকালীন রাজনৈতিক প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। এছাড়া বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক না
বিষয়ের পরোক্ষ ইঙ্গিতও এতে রয়েছে। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হবার পরও এ লিপি
এখনো প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হবার কারণ সম্ভবত এটিই

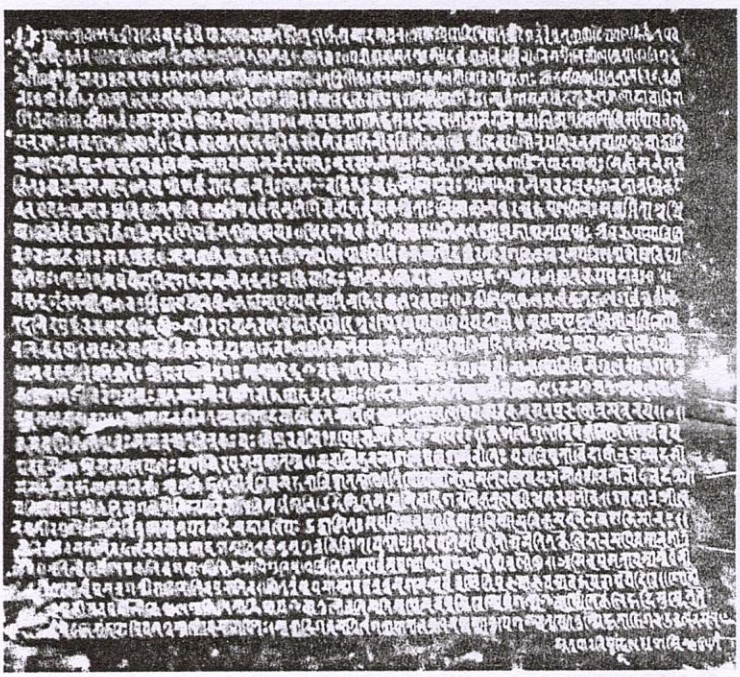

চিত্রঃ বাদাল স্তম্ভলিপি

[৪৮] R.C. Majumdar, *et al.* (ed.), p. VII.

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

পাথরঘাটা জনপদ : ইতিহাস ও পুরাকীর্তি

মো. জাহাঙ্গীর আলম*

Abstract: Patharghata, located at Joypurhat district of Varendra region, the North-West part of Bangladesh, is a compound archeological site that contains decorated bricks, black and grey granite stones, fragments of huge columns, pillars, brackets, stone-sculptures, terracotta, etc. This historical site with its long historical background and the present numerous archeological relics deserves proper preservation and documentation for authentic and comprehensive local history.

কা

রঘাটা' নামক ঐতিহাসিক স্থানটি জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলা সদর হতে প্রায় ৫ ামিটার পূর্বদিকে অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল তথা বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের না রংপুর বিভাগসহ) মধ্য-পশ্চিমাংশে এর অবস্থান। সাবেক বগুড়া জেলার একমাত্র মহকুমা ছিল ুরহাট। প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এর অবস্থান। এখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক, নতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এতদঞ্চলের অন্যান্য জেলার মতোই প্রাচীন এবং গৌরবময় স্থাপত্যে ত। কিন্তু নানাবিধ কারণে এ এলাকার স্থানিক গবেষণা অবহেলিত রয়ে গেছে। ১৯৮৪ সালের সনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বৃহত্তর বগুড়া জেলা – বগুড়া ও জয়পুরহাট নামে পৃথক দুটি জেলায় ন্তরিত হয়।[১] জয়পুরহাটের উত্তরে দিনাজপুর জেলা, পশ্চিমে নওগাঁ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ম দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণে বগুড়া ও নওগাঁ জেলা এবং পূর্বে গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলা অবস্থিত। গ্রৈকভাবে বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির সাথে প্রাচীনকাল থেকে ক্তি থাকলেও বিগত সময়ে মূল বা প্রধান শাসনকেন্দ্র হতে দূরবর্তী অবস্থানের কারণে সর্বভারতীয় ণ্ডলে এর স্বকীয় পরিচিতি তেমন ঘটেনি। তবে স্থানীয় (জেলাস্থ) এবং নিকটবর্তী ঐতিহ্য ও কৃতিক কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে পাথরঘাটার স্থানিক যোজনা অনুসন্ধান করলে এতদঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ত্ব ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করা অসম্ভব মনে হয় না। বস্তুত, পাথরঘাটা এমনই এক ত্বপূর্ণ সামরিক, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র – যেখানে ইতিহাস ও পুরাকীর্তির

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার*, বৃহত্তর ঢাকা (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯৩), পৃ. ৫৭; *াদেশ জেলা গেজেটীয়ার*, *বগুড়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৮৯), পৃ. ১। ১৯৮৪ সালে ার কর্তৃক মহকুমাগুলোকে পৃথক জেলায় এবং সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

আকরে (authentic) তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শনার (indication) প্রমাণ মেলে। এ পর্যায়ে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেটি সঠিকভাবে উদ্ধার করা এবং গবেষকগণের পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এক্ষেত্রে সে সম্ভবনার ক্ষেত্রটিও বর্তমানে প্রস্তুত রয়েছে বলে মনে হয়। কার্যত, এমন লক্ষ্য থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে বাংলার অতীত ইতিহাসের অনালোকিত অনুষঙ্গ এবং এই জনপদের নিরবচ্ছিন্ন জন-সম্পৃক্তির পূর্ণ-পুরাবৃত্ত। এ বিষয়টিই বক্ষ্যমান গবেষণার মুখ্য প্রতিপাদ্য। প্রসঙ্গত, প্রাচীন পাথরঘাটার ঐতিহাসিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব ও অনুসন্ধানের অভিমুখ প্রসঙ্গে এ পর্যায়ে সন্ধিৎসু নতুন বার্তাও মিলতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে এতদঞ্চলের প্রত্ন-বীক্ষণ ও প্রামাণিক তথ্য-উপাত্তের ধারাটি নির্ণয় করে – স্থানিক নৃ-ইতিহাস-প্রত্ন দর্শনের কার্যকর ভিত্তির যৌক্তিক ইঙ্গিত ও প্রামাণিক সূত্র তৈরি করেছে – যা শুধু পাথরঘাটা নয় প্রাচীন বাংলার প্রত্ন-সীমারও একটি পরিলেখ নির্মাণ করেতে সক্ষম, অনুমান করি।

ইতিহাস ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

ভারতবর্ষ বা প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে জয়পুরহাট নামের কোনো স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থান না থাকায় প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট।[২] যদিও এর সীমানার ভিতরে পুরানাপৈল, জয়পুর, নেঙ্গাপীর, মঙ্গলবাড়ী, পাথরঘাটা, লকমা, বৈগ্রাম, কিচক, গোপীনাথপুর, নান্দাইল দিঘি, আছরাঙ্গার বিল প্রভৃতি প্রাচীন স্থান এবং সংলগ্ন এলাকায় ভীমের পান্টি, সীতাকোট বিহারসহ চরকাই-বিরামপুর-ফুলবাড়ীর পুরাকীর্তি, রাজা বিরাট, পুণ্ড্রনগর, দ্বীপগঞ্জ বিহার, পাহাড়পুর বিহার ইত্যাদি বিদ্যমান। তবে তুর্কি বিজয়পূর্ব প্রায় দেড় হাজার বছরের অধিক সময় পর্যন্ত পুণ্ড্রনগর সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল এবং অধিকাংশ সময় তা সমগ্র এলাকা অথবা সন্নিহিত এলাকার শাসনকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো।[৩] সঙ্গত কারণে, খুব স্বাভাবিকভাবেই এতদঞ্চলে গড়ে ওঠে নানা ধরনের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক শহর-উপশহর। ধারণা করা হয় যে তেমনই এক প্রশাসনিক অঞ্চলের নাম পঞ্চনগরী। পাথরঘাটা সংলগ্ন তুলসীগঙ্গা নদীর অববাহিকায় সন্নিহিত গ্রামগুলো যথা – মহিপুর, কসবা, উঁচাই, নওপুকুরিয়া ইত্যাদি নাম থেকেও অঞ্চলটির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।[৪]

---

[২] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া*, পৃ. ১০১।

[৩] A.K.M. Yaqub Ali, *Aspect of Society and Culture of the Varendra* (Rajshahi: M. Sajjadur Rahim, 1998), p. 30; মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, *পাকিস্তান: দেশ ও কৃষ্টি*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: ঈস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্স্টবুক বোর্ড, ১৯৬৯), পৃ. ৯; খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা ও প্রত্নকীর্তি* (ঢাকা: সময় প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ৬২।

[৪] জ্ঞাত তথ্যানুসারে এখানেই ছিল পাথর দ্বারা নির্মিত বাংলার সর্বপ্রথম সড়ক সেতু। অতি প্রাচীনকাল হতেই নদীতে বাঁধ দিয়ে জনপদ, নগর-বন্দরকে রক্ষা করা হতো। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে করতোয়া নদীতে এবং পাঁচবিবির পাথরঘাটায় তুলসীগঙ্গা নদীতে দেওয়া বাঁধ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদিও আজ সেখানে কোন নগর-বন্দরের অস্তিত্ব নেই; রয়েছে কেবল জনশ্রুতি আর ধ্বংসস্তূপ। করতোয়া এবং তুলসীগঙ্গা আজ ক্ষীণকায়া-মৃতপ্রায়। মহীপুর নাম এবং এখানে প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শনগুলোর আলোকে স্থানটিকে পাল নৃপতি ১ম মহীপালের (৯৮৮–১০৩৮ সাল) সাথে যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষনীয়। কসবা ফার্সি শব্দ এর অর্থ শহর। কসবা গ্রামের পশ্চিমে মহীপুর গ্রামে রাজা মহীপালে স্মৃতিধন্য একটি বিরাট দীঘি এবং ইট-পাথরে পূর্ণ কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় ছোট ছোট প্রাচীন ঢিবির অস্তিত্ব আছে। নওপুকুরিয়াতে বৃহদাকৃতির নয়টি ঘাট বাঁধানো জলাশয় ছিল। বর্তমানে সবগুলোর অস্তিত্ব না থাকলেও চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয় না। জলাশয়গুলোর অবস্থান এবং আকৃতি-প্রকৃতি আবাসিক এলাকা বা প্রশাসনিক কেন্দ্রের সাক্ষ্য বহন করে। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের*

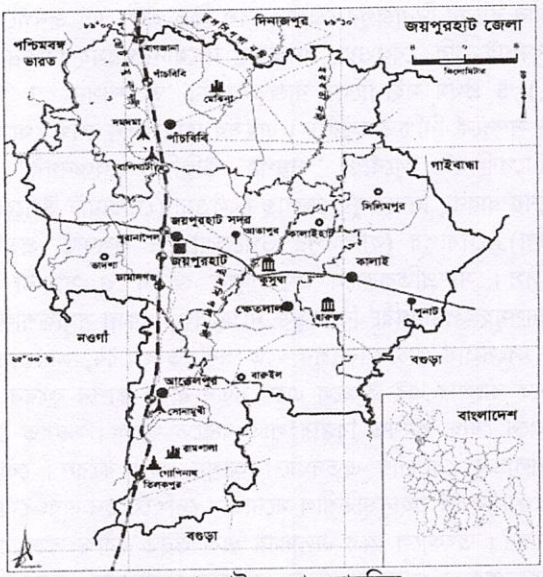

জয়পুরহাট জেলার মানচিত্র

মহাস্থানগড় তথা পুণ্ড্রনগর থেকে প্রাপ্ত একটি ব্রাহ্মী লিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে সমগ্র উত্তর বাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল।[৫] পরবর্তীকালে তা ক্রমান্বয়ে গুপ্ত, পাল ও সেন রাজবংশের কর্তৃত্বাধীন হয়।[৬] তবে অধিকাংশ সময় এই অঞ্চল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের অধীনে শাসিত হয় এবং কখনো কখনো বরিন্দ বা বরেন্দ্রী রাজ্যের অধীনেও শাসিত হয় বলে অনেকের ধারণা।[৭] জয়পুরহাট ও তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলের ভূমিরূপ এবং মানব-বসতি স্থাপন হতে ধারণা করা যায় যে, উপমহাদেশের অন্যান্য প্রাচীন জনবসতির মতো এখানেও খ্রিস্ট-জন্মের বহু পূর্বেই উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল। প্রাচীন 'Egyptian-Greek' গ্রন্থ (আনু. ৪০ খ্রি. রচিত) 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি' এবং টলেমি প্রণীত (২য় খ্রি.) ভূগোল গ্রন্থে ভারতের পূর্বপ্রান্তিক দেশ হিসেবে 'কিরাদিয়া'র নাম উল্লেখ আছে। তাদের মতে এদেশে 'পেন্টাপোলিস' অর্থাৎ পাঁচটি নগরী ছিল। আধুনিক অনেক পণ্ডিতের মতে টলেমী কথিত এই কিরাদিয়া প্রকৃতপক্ষে 'কিরাত জাতির দেশ'। বর্তমানকালের গবেষকগণের ধারণামতে মহাভারত কথিত 'কিরাতদেশ' এবং 'কিরাদিয়া' এক ও

প্রত্নসম্পদ (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২২৪-২২৫; কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (বগুড়া: কাজী প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃ. ১৫।

[৫] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালির ইতিহাস: আদিপর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আশ্বিন ১৪০২), পৃ. ৩১৮; অজয় রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬; *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া*, পৃ. ২৯; সুকুমার বিশ্বাস, পৃ. ৮; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৮১), পৃ. ২৭।

[৬] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭০।

[৭] মুসলিম বিবরণাদিতে বরিন্দ নাম ব্যবহৃত হলেও বরেন্দ্র নামেই তা সমধিক পরিচিত ও জনপ্রিয়। মূলত করতোয়া-পদ্মা-মহানন্দা বিধৌত অঞ্চলই বরেন্দ্রভূমি নামে সমধিক পরিচিত। A.K.M. Yakub Ali, *Ibid*, preface; আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *"বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহীর ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি,"* বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস (রাজশাহী: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ১৯৯৮), পৃ. ১৪-১৫।

অভিন্ন।[৮] পণ্ডিতগণের অনুমান বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার বেশ কিছু অংশ এই জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলোচ্য জেলার বৈগ্রাম, কালাই-কুরি, বেলওয়া, ধনাইদহ, দামোদরপুরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্ত আমলের (৪৪৮-৪৫০ খ্রি.) ও প্রথম মহীপালের রাজত্বকালের 'তাম্রশাসন' বা 'তাম্রপট্ট' পঞ্চনগর নামক বিষয় ও শাসনকেন্দ্র সম্পর্কে নিশ্চিত করেছে। এইসব তাম্রশাসন লেখ থেকে ধারণা করা হয় যে, টলেমি কথিত 'পেন্টাপোলিস'ও পূর্বোক্ত 'তাম্রপট্ট' উল্লিখিত 'পঞ্চনগরী' এক ও অভিন্ন। মতদ্বৈততা সত্ত্বেও পণ্ডিতগণের ধারণা, দিনাজপুর জেলাস্থ বেলওয়া (ঘোরাঘাট উপজেলা), হরিনাথপুর, চরকাই (নবাবগঞ্জ উপজেলা), দেবীপুর (হাকিমপুর উপজেলা) ও ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থানই প্রাচীন 'পঞ্চনগরী' বা পেন্টাপোলিস। সাম্প্রতিককালে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও সামান্য উৎখননে একথা অনস্বীকার্য যে, উল্লিখিত স্থানসমূহ 'পঞ্চনগরী' বিষয়ভুক্ত না হলেও, একদা সমৃদ্ধিশালী এবং সাংস্কৃতিক কর্মকেন্দ্র ছিল।[৯] এখানকার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শন হতে অনুমিত হয় যে, আর্যদের আক্রমণের মুখে সিন্ধু জনপদের অনেক শাসক বাংলার এই অঞ্চলে এসে নতুন রাজ্য স্থাপন করেন। অতঃপর বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এখানে বৌদ্ধ ধর্মমত বিস্তার লাভ করতে থাকে। সম্ভবত বৈদিক রাজশক্তির আক্রোশে স্থানত্যাগী বা পলাতক বৌদ্ধগণ এতদঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মানুসারী ও ভিক্ষুদের প্রতি এই অঞ্চলের শাসকবর্গ সহানুভূতিশীল মনোভাব দেখিয়েছেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তা প্রচারের ব্যবস্থাও করেছেন। তৎকালে অত্র এলাকায় এক উন্নত বৌদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। জয়পুরহাটের সন্নিকটস্থ পাহাড়পুর বা সোমপুর বিহার, জগদ্দল মহাবিহার, হলুদ বিহার বা দ্বীপগঞ্জ বিহার, সীতাকোট বিহার – এদেশে বৌদ্ধ সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার সাক্ষ্য বহন করে।[১০] পাশাপাশি সন্নিহিত অঞ্চলের সমকালীন ভূ-রাজনৈতিক ও অপরাপর গুরুত্বকে নিশ্চিতভাবে তুলে ধরে।

বরেন্দ্রভূমির প্রায় মধ্যস্থলে এবং প্রাচীন বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুক্তি তথা প্রদেশ – পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী বর্তমান মহাস্থানগড়ের অনতিদূরে অবস্থান হওয়াতে জয়পুরহাট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তি, বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পাল শাসনের ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি স্থানটিতে বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাচীনত্বকে প্রকাশ করে।[১১] একই সাথে এখানকার রাজনৈতিক সংগঠন ও কাঠামোর গোড়াপত্তনে বৌদ্ধ রাজাগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সাক্ষ্য মেলে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত আব্বাসীয় খলিফা

---

[৮] প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে কিরাত নামক একটি অনার্য জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুনীতিভূষণ কানুনগো, *বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ)* (চট্টগ্রাম: দীপঙ্কর কানুনগো, ১৯৯৪), পৃ. ৭।

[৯] অজয় রায়, *বাঙালির আত্মপরিচয়, একটি পুরাবৃত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা* (রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১), পৃ. ৩৯।

[১০] বিহার হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিহার বলতে একটিমাত্র ইমারতকে বুঝানো হতো না। বরং বহু ধরনের অনেকগুলো স্থাপত্যকর্মের সমন্বয়কে বুঝানো হতো। অর্থাৎ বিহার বলতে এক সমন্বিত আবাসিক ব্যবস্থাপনার চিত্রই ফুটে ওঠে; এসব বৌদ্ধবিহার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র সাধারণত সহজগম্য ও লোকালয়প্রধান এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হতো। সোমপুর বা পাহাড়পুর বিহার বর্তমানে নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এবং জয়পুরহাট সদর থানার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত, বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত স্থাপত্য নিদর্শনটি বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার অন্তর্গত। বিখ্যাত জগদ্দল মহাবিহার জেলা সদর থেকে পশ্চিমে প্রায় ১৮ কি.মি. দূরে এবং সীতাকোট বিহারের অবস্থান জেলার উত্তর সীমান্ত থেকে অনতিদূরে। নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ১০১; খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পৃ. ৩৭, ৩৯; বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ, পৃ. ১০৫–১০৮ ও ২৫৩–২৫৭; সুকুমার বিশ্বাস, পৃ. ১০।

[১১] নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৩৯১।

হারুনুর রশীদের সময়ের স্বর্ণমুদ্রার সাক্ষ্যে খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীতে আরব বণিকদের সাথে এতদঞ্চলের ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বর্তমান জয়পুরহাটসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলে তুর্কিদের মাধ্যমে মুসলিম শক্তির উত্থান ঘটে এবং ইংরেজ আধিপত্যের পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।[১২] তবে সুলতানি আমলের মধ্যভাগে উপমহাদেশের পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চলে অনেক স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে কিছু সময়ের জন্য রাজা গণেশ উত্তরাঞ্চল তথা উত্তরবঙ্গের বেশকিছু অঞ্চলের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। অবশ্য এই সময় জয়পুরহাট অঞ্চলের উপর তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়। বর্তমান সদর উপজেলার পুরানাপৈল-এ জয়পুরহাট এবং পাঁচবিবি উপজেলা নিয়ে এক সময় লালবাজার নামক থানা স্থাপিত হয়েছিল।[১৩] এই লালবাজার ও ক্ষেতলাল থানা তখন দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৪] আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমবর্ধিত চাহিদা এবং ইউরোপীয় নীলকর ও রেশম বণিকদের স্বার্থে এলাকা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে বগুড়া জেলা গঠনের সময় (১৮২১ সাল) লালবাজার ও ক্ষেতলাল থানা দুটি নবগঠিত বগুড়া জেলার সাথে সম্পৃক্ত হয়। কালক্রমে লালবাজার অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ায় ১৮৬৮ সালে ১৬ই মার্চ লালবাজার থানার বিলুপ্তি ঘটিয়ে এই অঞ্চল পাঁচবিবি থানার অধীনস্থ করা হয়।[১৫] ১৮৮৪ সালে কলিকাতা-জলপাইগুড়ি রেলপথের স্টেশনগুলোর মধ্যে জয়পুরহাট অন্যতম। তখন স্টেশন এলাকাটির স্থানীয় নাম ছিল বাঘাবাড়ী হাট। সরকারি কাগজপত্রে এলাকাটি গোপেন্দ্রগঞ্জ নামে উল্লিখিত হলেও রেলস্টেশন এবং পোস্ট অফিসের নাম জয়পুরহাট হওয়ায় ধীরে ধীরে উক্ত নামেই পরিচিত হতে থাকে।[১৬] ক্রমেই যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সুবিধার্থে স্টেশন এলাকা অর্থাৎ বাঘাবাড়ীহাট প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং গোপেন্দ্রগঞ্জ হাট নামেই লেখা হতে থাকে। ১৯০৭ সালে জয়পুরহাট একটি স্বতন্ত্র থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯২০ সালের ভূমি জরিপ তথ্যে নিবন্ধিত হয়।[১৭] ১৯৭১ সালে জয়পুরহাট মহকুমা শহরে উন্নীত হয় এবং ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জেলায় রূপান্তরিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বগুড়ার মহকুমা ছিল। এই সময় পুরাতন বগুড়া জেলার একমাত্র মহকুমার পাঁচবিবি, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট, আক্কেলপুর এবং কালাই থানা নিয়ে জয়পুরহাট জেলা গঠিত হয়।[১৮] প্রশাসনিক জেলা হিসেবে নবীন হলেও ঐতিহাসিকভাবে সুপ্রাচীন এই জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ। বর্তমানে এখানকার মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলি সংরক্ষণের অভাবে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ জাতীয় ইতিহাস পুনর্গঠন ও সমৃদ্ধ করতে এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনের প্রতি যত্নশীল হওয়া দরকার।

---

[১২] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া*, পৃ. ২৭০; এস. এম. আনসার আলী, *বাড়ীর কাছে আরশী নগর* (জয়পুরহাট: সাহিত্য সাধনা কুটির, পুরানাপৈল, ১৯৯৯), পৃ. ৯।

[১৩] পুরানাপৈল প্রাচীন নদীবন্দর ও বাজার ছিল, বর্তমানে একটি মসজিদ ও মাযারের সম্মুখে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন স্থাপনায় ব্যবহৃত পাথরের পিলার ও খণ্ডিত পাথর। এখানেই স্থাপিত হয়েছিল দিনাজপুরের লালবাজার থানা। *ঐ*, পৃ. ১০।

[১৪] বর্তমানে জয়পুরহাটের একটি উপজেলা। এখানে অনেক প্রত্নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে; *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া*, পৃ. ২৭২।

[১৫] তদেব, পৃ. ২৭১-৭২।

[১৬] জয়পুরহাটের স্থানীয় নাম ছিল বাঘাবাড়ী হাট। এস. এম. আনসার আলী, পৃ. ১১।

[১৭] তদেব, পৃ. ১২।

[১৮] *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া*, পৃ. ২৭৪।

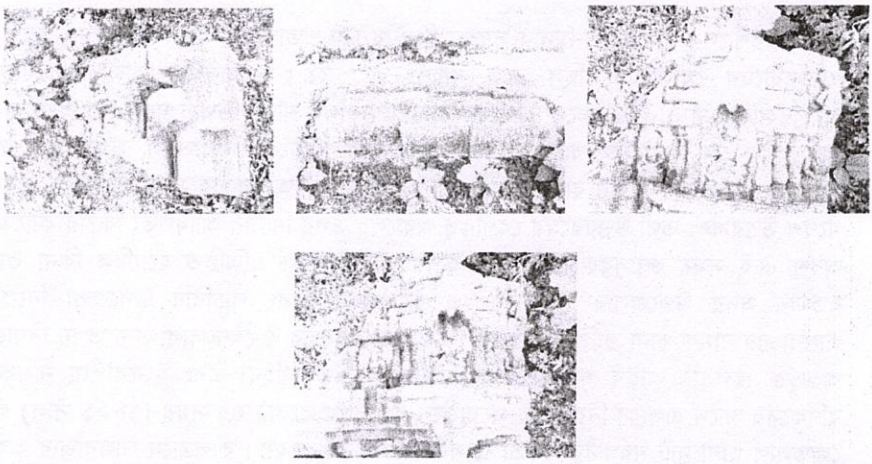

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্নসামগ্রী

জয়পুরহাটের সীমান্তবর্তী এলাকাসহ প্রায় সমগ্র জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন সময়কালের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রত্নসম্পদ। তন্মধ্যে সবচাইতে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত পাথরঘাটা এলাকাটি।[১৯] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাঁচবিবি উপজেলা সদর হতে প্রায় ৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে আটাপুর ইউনিয়নে পাথরঘাটার অবস্থান। এখানকার তুলসীগঙ্গা নদীগর্ভে এবং তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য ছোট-বড় পাথর ছড়িয়ে থাকায় সম্ভবত আধুনিককালে স্থানীয়ভাবে এর নামকরণ হয়েছে পাথরঘাটা। তুলসীগঙ্গা নদীটি এখনো ছোট যমুনা, আত্রাই এবং করতোয়া নদীর সাথে সংযুক্ত। খুব সম্ভবত প্রচীনকালে পণ্য পরিবহনে নদীটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ মহাস্থানগড় থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং ঐতিহাসিক ঘোড়াঘাটের অনতিদূরে এই তীর্থস্থানে ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখার জন্য প্রতিদিন বহুসংখ্যক দর্শনার্থীর আগমন ঘটে।[২০] প্রায় ৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে পাথরঘাটা নামে যে প্রত্নস্থল, তা একক প্রত্নস্থল নয় বরং একাধিক প্রত্নঢিবি নিয়ে গঠিত একটি যৌগিক প্রত্নস্থল। অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ

---

[১৯] পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্যতম বিষয় ছিল পঞ্চনগরী। এই পঞ্চনগরীতেই বিষয়ের শাসনাধিকরণ অধিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চনগরীর অবস্থান এখনো নিশ্চিত নয়। তবে বৈগ্রাম ও বেলওয়া তাম্রলিপির আলোকে কলাবিশারদগণ ধারণা করেন যে, পশ্চিমে প্রাচীন যমুনা নদী এবং উত্তর ও পূর্বদিকে যথাক্রমে করতোয়ার একটি প্রবাহ ও করতোয়া নদী দ্বারা পঞ্চনগরীর সীমানা নির্ধারিত ছিল। সে অনুযায়ী জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল ও পাঁচবিবি উপজেলার সমগ্র অঞ্চল এবং জয়পুরহাট সদর উপজেলার কিছু অংশ পঞ্চনগরীর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পঞ্চনগরী নাম থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, পঞ্চ অর্থাৎ পাঁচটি জনপদ বা নগরীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল এই স্থান। সে ক্ষেত্রে পাথরঘাটাকে পঞ্চনগরী বলা সমীচীন হবে না। কারণ সুবৃহৎ হলেও পাথরঘাটা ছিল একক নগরী। তবে পাথরঘাটা সন্নিহিত অঞ্চলে বিধায় লোকমুখে পঞ্চবিবি এবং শেষ পর্যন্ত পাঁচবিবিতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে সুধীজনেরা মনে করেন। বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ, পৃ. ১০৩–১০৪ ও ২২২–২২৬; নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৩০১; মোস্তফা আলী, পুণ্ড্র (বগুড়াঃ ঋত্বিক, ২০০৯) পৃ. ৩৪৫; খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পৃ. ২৫।

[২০] ঘোড়াঘাট প্রাচীন শহর ও দুর্গনগরী, বিস্তারিত দেখুন, খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পৃ. ১০৮–১২।

দ্বারা পূর্ণ স্থানটি কালের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমে সর্পিল বাঁক নিয়ে তুলসীগঙ্গা নদী এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত (বর্তমানে প্রশস্ত নালাসদৃশ) আর একটি নদী সমগ্র এলাকাটিকে বেষ্টন করে নিমাই পীরের দরগার সামান্য দক্ষিণে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানটিই মহীপুর-কসবা-উঁচাই-পাথরঘাটা প্রভৃতি, বিশেষ করে পাথরঘাটা নামে সমধিক পরিচিত। ১৯৬২ সালে নিমাই পীরের দরগা থেকে প্রায় ৬০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান (ক্যাথলিক) মিশনারি ও একটি গির্জা নির্মিত হয়। মিশনের নামে প্রায় ১৭ একর জমি আছে। স্থানটিতে প্রাচীন ইট-পাথরে পরিপূর্ণ অনেক ঢিবি ছিল। মিশনের বুলডোজার দিয়ে সমুদয় স্থান সমতল করার পরও পার্শ্ববর্তী সমভূমি থেকে তা প্রায় ৩ মিটার উঁচু। বুলডোজার চালানোর সময় মাটির নীচে পাওয়া গেছে অসংখ্য প্রাচীন নকশাকৃত ইট, কালো ও ধূসর বর্ণের গ্রানাইট পাথরের বড়ো বড়ো খণ্ড, প্রকাণ্ড খিলান, স্তম্ভ, ব্রাকেট, প্রস্তর-মূর্তি ও মূর্তির ভগ্নাবশেষ, পোড়ামাটির চিত্রফলক, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ইত্যাদি। এগুলো একসময় মিশনবাড়ির ভিতর আঙ্গিনায় শোভা পেতো।

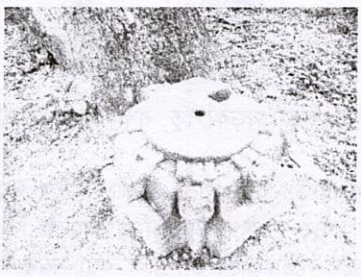

মাজার চত্বরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন ও মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলি

পাথরঘাটার প্রত্নপরিচিতি

বরেন্দ্রভূমিতে প্রাচীনকালে বহু নগরীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল যার সংখ্যা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে বেশিরভাগ প্রাচীন নগরীই বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা যাচ্ছে এবং সেখানে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বসতি, আবাদভূমি ইত্যাদি। তবে এখনও যেসব প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ কোনোরকমে টিকে আছে পাথরঘাটা তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তুলসীগঙ্গা নদীর দুপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাথরঘাটা নামে যে প্রত্নস্থল, তা একক কোন প্রত্নস্থল নয়, বরং একাধিক প্রত্নঢিবি নিয়ে গঠিত একটি যৌগিক প্রত্নস্থল, উল্লেখযোগ্য প্রত্নঢিবিগুলো হলো – মিশন ঢিবি,

উচাই ঢিবি, বহারামপুর ঢিবি, নিমাই শাহের মাজার, বদের ধাপ, সাঁওতাল পাড়া ঢিবি, কাশিয়াবাড়ি ঢিবি এবং কুসুম্বা, গঙ্গরিয়া ও বিণগ্রামের একাধিক ঢিবি। স্থানটি সরেজমিন পরিদর্শন করলে অতি সহজেই অনুমিত হয় যে, দূর-অতীতে এখানে একটি সমৃদ্ধ নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল অথবা বিশাল একটি জনপদ ছিল।[২১] প্রাচীনকালে অত্র এলাকায় যে একটি বিরাট জনপদ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমগ্র এলাকা জুড়ে বিদ্যমান ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন ইমারতাদির ইট, পাথর, দরজা জানালার অংশবিশেষ ও ব্যবহার্য মৃৎপাত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখে।[২২] বর্তমানে এখানে একটি মূর্তির খণ্ডাংশ ছাড়া (কয়েক বছর আগে পাওয়া, ফাদার অ্যান্থনীর সংগ্রহে রয়েছে) তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই। বেশীর ভাগই চুরি অথবা খোয়া গেছে এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। যেমন – বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (রাজশাহী), পাহাড়পুর জাদুঘর (নওগাঁ), মহাস্থানগড় জাদুঘর (বগুড়া), ভারতের কলকাতা ন্যাশনাল মিউজিয়াম ইত্যাদি। তবে এখনো এখানকার যে কোনো স্থানে সামান্য খনন করলেই পাওয়া যায় পুরাতন ইট, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ অথবা পাথর।

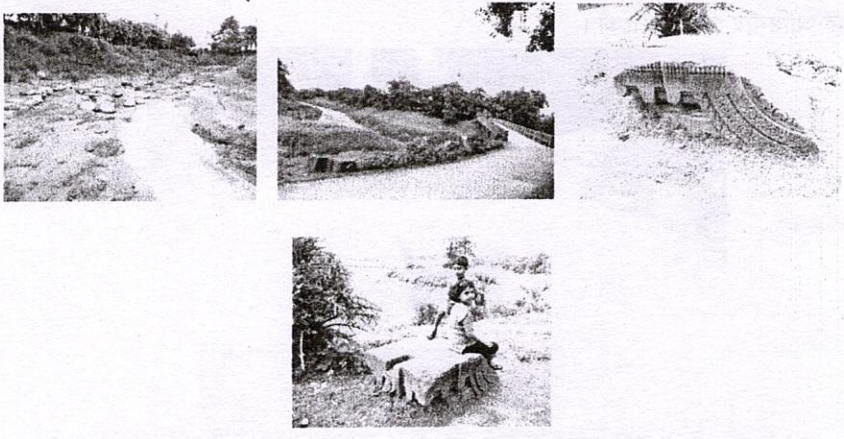

তুলসীগঙ্গা নদীগর্ভ, নতুন সড়কসেতু, নদী ও সেতুর দক্ষিণ পাড়ের প্রত্ন-নিদর্শন

গির্জার পূর্বে তুলসীগঙ্গা নদীর উঁচু পাড় থেকে প্রায় ৬ মিটার পর্যন্ত সুবিন্যস্ত ভাবে বাঁধা প্রশস্ত ইট-পাথরের ভিত্তি দেখা যায়, যা পাড় সংলগ্ন উঁচু ভূমির অনেক ভিতরে চলে গেছে বলে মনে হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ছাড়া এর স্বরূপ সঠিকভাবে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, তীরবর্তী কোনো দেবালয় বা প্রাসাদ থেকে নদীতে নামার জন্য সিঁড়ি হিসেবে তা ব্যবহৃত হতো। নদী পারাপারের জন্য আধুনিককালে নির্মিত ব্রিজটির পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটি মন্দির রয়েছে। মন্দিরটি খুব পুরাতন না হলেও এর ভিত সংলগ্ন চতুপার্শ্বস্থ অলংকৃত পাথরখণ্ডগুলো যে অতি প্রাচীন তা সহজেই বোঝা যায়। এগুলোর মধ্যে কোনোটিতে অলংকৃত কুলঙ্গী নকশার মধ্যে শিব মূর্তি, কৃষ্ণ মূর্তি ও ধ্যানরত মূর্তি বিদ্যমান। আবার কোনটিতে শুধুই খাঁজকাটা অথবা ফুল, লতা-পাতার অলংকরণ। মন্দিরের উত্তরে এবং ব্রিজের দক্ষিণে রাস্তার দুই পার্শ্বে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান পাথরগুলোতেও শোভা পাচ্ছে সুনিপুণ খোদাই অলংকরণ। বিভিন্ন আকৃতির এসব শিলাখণ্ড দেখে

---

[২১] *বাংলাপিডিয়া*, "পাথরঘাটা" ভুক্তি; এস. এম. আনসার আলী, পৃ. ৩৬, ১৬৬ ও ১০৪।

[২২] তদেব, পৃ.১৬৫।

অনায়াসেই বোঝা যায় যে, সেগুলো কোনো ইমারতে ব্যবহৃত ব্রাকেট, সর্দল, পিলারের অংশ ইত্যাদি। এছাড়াও মন্দিরের দক্ষিণে ইট, পাথর এবং মৃৎপাত্রে ভরা একটি উঁচু স্তূপও রয়েছে।

মন্দির, মন্দির সংলগ্ন প্রত্ন-নিদর্শন এবং মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ

খ্রিস্টান মিশন ও মন্দিরের দক্ষিণে তুলসীগঙ্গা নদীর তীরে রয়েছে এখানকার একমাত্র মুসলিম নিদর্শন নিমাই পীরের সমাধি বা দরগা। এর নির্মাণকাল সম্পর্কিত সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের এই ক্ষুদ্র সমাধি-সৌধটি অষ্টভুজাকৃতি নকশায় নির্মিত। এই ইমারত একটি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের উপর সংগৃহীত ইট-পাথর দ্বারা নির্মিত বলে সহজেই অনুমান করা যায়। দক্ষিণ দিকে একটিমাত্র প্রবেশপথ এবং অলংকরণবিহীন ক্ষুদ্র এ ইমারতটি পলেস্তরা আবৃত। নিমাই পীর সম্পর্কিত অনেক কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে।[২৩] অনেকে মনে করেন যে, এটি নাসির-উদ্-দীন পীরের দরগাহ্। হিন্দু-মুসলিম সবার নিকট মাজারটি সমভাবে পবিত্র। মাজার চত্বরে একটি পাথরদণ্ড প্রোথিত আছে যা 'পীরের লাঠি' বলে কথিত।[২৪] এর বাইরে সূক্ষ্ম ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যশিল্পের ক্ষয়প্রাপ্ত নিদর্শন সংবলিত গ্রানাইট পাথরের একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় এবং দরগাহ্র দেয়ালে সুলতান নাসির-উদ্-দীন-নস্রত শাহের আমলের (১৫১৯-৩১ সাল) একটি শিলালিপি ছিল বলে জানা যায়।[২৫] 'বগুড়ার ইতিকাহিনী'তে কাজী মোহাম্মদ মিছের কর্তৃক শিলালিপির পাঠ অনুসারে মাযারে শায়িত ব্যক্তির নাম নাসির-উদ্-দীন এবং তিনি সুলতান নসরত

---

[২৩] অনেকে বিশ্বাস করেন যে, মাহীসওয়ার বলখীর সুযোগ্য এই সাগরেদ প্রথমে নিমাই সন্ন্যাসীর ছদ্মনামে এসে এখানে আস্তানা গড়েন এবং গোপনে ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকেন। এরপর অনুকূল পরিবেশ পেয়ে সুযোগমতো স্বনামে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু পূর্ব নামের জের ধরে স্থানীয় লোকজন তাকে নিমাই পীর হিসেবেই সম্বোধন করতে থাকে।

[২৪] এস.এম. আনসার আলী, পৃ. ৩৫।

[২৫] *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ২২৩।

শাহের আমলে বা তাঁর পূর্ববর্তী সময়ে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন।[২৬] এখানকার উৎকীর্ণলিপি অপসারিত হয়েছে। বর্তমানে মাযারের প্রবেশ পথের ডান পার্শ্বে কারুকার্য খচিত ঈষৎ ধূসর বর্ণের যে প্রস্তরখণ্ডটি বিদ্যমান, তার উপর আগত ভক্তবৃন্দ শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ফুল, দুধ ও অন্যান্য সামগ্রী রাখেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এটি একটি শিবলিঙ্গের বেদি যার উপরিভাগ অনুপস্থিত। মাযারের দক্ষিণ-পূর্বে তুলসীগঙ্গা নদীর উপর গ্রানাইট পাথর নির্মিত প্রাচীন একটি সেতু ছিল বলে জানা যায়। নদীর পূর্ব তীরের ইট-পাথরের গাঁথুনি সেই সাক্ষ্য বহন করছে। সেতুটি প্রায় ৪৫-৬০ মিটার দীর্ঘ ছিল। বাংলাদেশে পুরোপুরি পাথরে নির্মিত আর কোন প্রাচীন সেতুর সন্ধান আজ পর্যন্ত মেলেনি। এক সময় নদীর দুই তীরেই ইট-পাথরের ভিত্তি ও খিলান দেখা যেতো।[২৭] স্থানটির উত্তর-দক্ষিণ বরাবর নদীগর্ভে দীর্ঘ এলাকা জুড়ে ছোট-বড় অসংখ্য পাথর পড়ে আছে। বহুদূর বিস্তৃত পাথরের ধ্বংসাবশেষের জন্য স্থানটির পাথরঘাটা নাম সার্থক হয়েছে। দরগার পশ্চিমে এবং মিশনের উত্তর ও পশ্চিমে একটি করে ক্ষুদ্র পুকুর রয়েছে যেগুলোর প্রাচীনত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। মিশনের উত্তর-পশ্চিমে কিছুদূর গেলে একই স্থানে ৯টি বিশাল জলাশয়ের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় বলে স্থানটি 'নওপুকুরিয়া' নামে পরিচিত। অত্যন্ত প্রাচীন এই জলাশয়গুলোতে ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাটের অস্তিত্ব বিদ্যমান।[২৮] তাছাড়া একটি সুবৃহৎ ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এবং বেশ কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। সার্বিক আলোচনায় অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, নওপুকুরিয়াতেই পাথরঘাটার প্রশাসনিক কেন্দ্র অথবা আবাসিক এলাকা ছিল।[২৯]

নদীগর্ভে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্নসম্পদের নিদর্শন

---

[২৬] কাজী মোহাম্মদ মিছের আলী, *বগুড়ার ইতিকাহিনী* (বগুড়াঃ কাজী প্রকাশনী, ১৯৫৭), পৃ. ১৬৭, ১৭৮-৯২।

[২৭] তদেব, পৃ. ১৬৭; *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ২২৪; এস. এম. আনসার আলী, পৃ. ৩৫; *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া*, পৃ. ৫৮-৫৯।

[২৮] দু-একটি ছাড়া বাকিগুলো বর্তমানে নিচু জমিতে পরিণত হয়েছে।

[২৯] *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ২২৫।

পাথরঘাটা ও সন্নিহিত এলাকায় এখনো বিলুপ্তপ্রায় দীঘি এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ঢিবির অস্তিত্ব ছাড়াও নিকটবর্তী কসবা, মহীপুর ইত্যাদি গ্রামে প্রাচীন জলাশয় ও ঢিবির অস্তিত্ব রয়েছে।[৩০] তুলসীগঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে প্রায় ২ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে অসংখ্য প্রাচীন ইমারত ছিল তার প্রমাণ মেলে বেশ কয়েকটি ঢিবি থেকে প্রাপ্ত ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের অস্তিত্ব থেকে। নদী তীরবর্তী ঢিবিগুলো এক সময় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বর্তমানে প্রায় সবগুলোর অস্তিত্বই বিলীন। এখানে প্রাপ্ত অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি ও মূর্তির ভগ্নাংশ যেমন – বিষ্ণু মূর্তি, শিবলিঙ্গ, গৌরীপট্ট ইত্যাদি স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধিবাসী ও আদিবাসী হিসেবে পরিচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মন্দিরে পূজিত হতো বলে জানা যায়।[৩১] বর্তমানে সেগুলো আর নেই। পাথরঘাটা এলাকা হতে উদ্ধারকৃত এবং পাহাড়পুর জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – প্রস্ফুটিত পদ্মের পোড়ামাটির চিত্রফলক, পোড়ামাটির চিত্রফলকে ফুলের পাঁপড়ির প্রতিকৃতি, পোড়ামাটির চিত্রফলকে ধাবমান হস্তি, ফুল ও পাতাযুক্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক, কাল পাথরে নির্মিত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান ও মাথার উপরে চক্রধারী নারী (দেবী) মূর্তি (এটি বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের যুগে প্রবর্তিত চক্রদেবীর মূর্তি হতে পারে), কাল পাথরে নির্মিত দীর্ঘ চক্ষু ও চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট একটি মূর্তির মুখমণ্ডল, কালো পাথরে নির্মিত মস্তকে রাজমুকুট পরিহিত একটি মূর্তির মস্তক।[৩২]

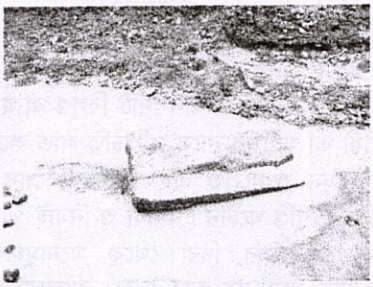

নদীগর্ভ এবং প্রস্তরনির্মিত প্রাচীন সেতুর পূর্বাংশের অস্তিত্ব

পাথরঘাটার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কিত কোনো প্রামাণিক দলিল বা সঠিক সময় নির্দেশক কোনো তথ্য অথবা শিলালিপি না থাকায় মহীপুর নাম এবং এখানে প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শনগুলোর আলোকে

---

[৩০] তদেব, পৃ. ২২৫।

[৩১] তদেব, পৃ. ২২৫–২২৬।

[৩২] পাহাড়পুরসহ দেশের বিভিন্ন জাদুঘরে পাথরঘাটা থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি প্রদর্শনীর জন্য শোভা পাচ্ছে।

স্থানটিকে পাল নৃপতি ১ম মহীপালের (৯৮৮-১০৩৮ সাল) সাথে যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে এখানে বিশাল অঞ্চল জুড়ে যে সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনো প্রভাবশালী রাজা বা রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ ধরনের জনপদ গড়ে ওঠা অসম্ভব। এখানে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্রের ধারণাও অমূলক নয়। যেহেতু গুপ্ত যুগে বাংলায় ইমারত নির্মাণে গ্রানাইট পাথরের ব্যবহার হতো সে কারণে এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর আলোকে, জনপদটি গুপ্ত যুগে গড়ে ওঠা এবং এটি বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল বলে ধারণা করা যায়।

উপসংহার

পাথরঘাটাকে অনেকেই প্রাচীন জনপদ 'পঞ্চনগরী' বা তৎসন্নিহিত এলাকা বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তবে পঞ্চনগরী না হলেও এখানে যে একটি সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন জনপদ ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য অলংকরণের প্রধান উপকরণ ছিল পোড়ামাটির ফলক ও প্রস্তর কারুকার্য। ইমারতের অভ্যন্তরভাগে তেমন কোনো অলংকরণ না থাকলেও বহির্ভাগের দেয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ বিভিন্ন দেব-দেবী ও পশু-পাখি সংবলিত পোড়ামাটির ফলক এবং প্রস্তরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য দ্বারা সজ্জিত হতো। খিলানের সম্মুখভাগের খাঁজ নকশাও বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যের এক বিশেষ অলংকরণ বৈশিষ্ট্য। আর এ সমস্ত নমুনা এখানে পাওয়া গেছে ব্যাপক হারে। হয়তো গুপ্ত যুগে বা তারও আগে এখানে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং গুপ্ত যুগেই তা সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হয়। পাল যুগে সম্ভবত মহীপালের সময় জনপদটি বিলুপ্ত না হয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পাল সম্রাট মহীপালের নামানুযায়ী তা মহীপুর নামে পরিচিতি লাভ করে। সেনযুগের তৈরি কালো পাথরের মূর্তি দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, সেন আমলেও এই স্থানের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। খুব সম্ভবত প্রারম্ভিক মুসলিম যুগেও জনপদটির বিলুপ্তি ঘটেনি। কসবা ও নিমাই পীরের দরগা সে সাক্ষ্যই বহন করে। বর্তমানকালে স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে মনোমুগ্ধকর হলেও এককালে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের সেই প্রত্নসম্পদের সমারোহ আর নেই। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় প্রশাসন এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নজরদারির অভাবে এক শ্রেণির অসাধু প্রত্ন-ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীর দৌরাত্ম্যে এসব অমূল্য সম্পদ দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগে এ স্থানটিতে খননকার্য পরিচালিত হলে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে এবং সেই সঙ্গে স্থানিক ইতিহাসের কলেবর ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত অনালোচিত পোড়ামাটির ফলক

মোছা. আশীয়ারা খাতুন*

Abstract: Varendra Research Museum is the oldest Museum in Bangladesh. Since its establishment in 1910, this museum has been pursuing the policy of collecting terracotta plaques till today. The main early motive of this museum was to collect the archeological relics, literature and historical object of the Varendra regions. The period following its establishment different sorts of terracotta, archaeological relics including sculptures, coins and insignificant artistic devise have been collected and preserved in the museum. Among the collected earthen archaeological relics in the museum more than thousand terracotta plaques have been collected from different sites of the Varendra regions. The present paper is a humble attempt to analyse the terracotta plaques preserved in the Varendra Research Museum from Zamindars houses and temples located in the different areas built in the 17th to 19th centuries in the Varendra regions those were not bring to light so far.

ভূমিকা

প্রত্নবিদদের ধারণা কাদামাটি দ্বারা নির্মিত শিল্পনিদর্শন নব্য প্রস্তর যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল।[১] প্রাথমিক পর্যায়ে মাটির তৈরি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত হতো। সভ্যতার ক্রম-অগ্রগতির সাথে সাথে মাটির তৈরি শিল্পনিদর্শনের প্রকরণ বাড়তে থাকে। গৃহস্থালি তৈজসপত্রের পাশাপাশি মাটির হাঁড়ি পাতিলে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্করণের কাজও শুরু হয়। ইমারত নির্মাণেও শুরু হয় পোড়ামাটির অলঙ্ককরণ কাজ। মহাস্থানগড় উৎখননে সর্ব নিম্নস্তরে অনাবৃত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মৃৎখণ্ড ও টেরাকোটা ফলক। এটাই বাংলাদেশের টেরাকোটা ফলকের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। সময়ের বিবর্তনে মৃত্তিকা নির্মিত শিল্পনিদর্শনেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। টেরাকোটা ফলকে বিভিন্ন প্রকার লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশার পাশাপাশি দেব-দেবতা, পশু-পাখি, গাছ-পালা ইত্যাদির চিত্র স্থান করে নিয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনীও টেরাকোটায় অঙ্কিত হয়েছে। সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে মন্দির ও জমিদারি প্রাসাদ স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল। এ সময়ের স্থাপত্যকলা অলঙ্করণে স্ট্যাকো অলঙ্করণের সাথে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] H. D. Sankalia, *Prehistory and Protohistory in India and Pakistan* (Mumbai: University of Bombay, 1962), p.xx.

সাথে টেরাকোটা ফলকের ব্যবহার নেহাত কম নয়। বর্তমান প্রবন্ধে রাজশাহী অঞ্চলের কতিপয় মন্দির ও জামিদারি প্রাসাদ স্থাপত্যে ব্যবহৃত টেরাকোটা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। টেরাকোটাগুলো বর্তমানে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

বরেন্দ্র জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রাজশাহী শহরের (পুঠিয়ার পাঁচ আনির বাড়ির বহিঃস্থ চত্বর) ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য কর্তৃক রচিত (স্থানীয় আঞ্চলিক মৌলিক তথ্য সংবলিত) একটি প্রবন্ধ রমাপ্রসাদ চন্দ পাঠ করেন। মৌলিক তথ্য সংবলিত এ প্রবন্ধটি উপস্থিত নবীন ও প্রবীণসাহিত্যিকদের মনে রেখাপাত করে। অতঃপর এ সম্মেলনের একটি প্রস্তাবক্রমে রমাপ্রসাদ চন্দকে এতদঞ্চলের (উত্তরবঙ্গের) প্রত্নসম্পদের ওপর আর একটি প্রবন্ধ রচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং তা আগামী অধিবেশনে পঠনীয়রূপে নির্ধারণ করা হয়। ১৯০৯ সালের শেষার্ধে অথবা ১৯১০ সালের প্রথম দিকে ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রমাপ্রসাদ চন্দ কর্তৃক প্রবন্ধটি পঠিত হলে উপস্থিত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কুমার শরৎ কুমার রায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এবং রমা প্রসাদ চন্দ সম্মেলন শেষে রাজশাহীর এ তিনজন প্রতিনিধি, ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাগলপুরের উকিল নরেশ চন্দ সমভিব্যবহারে ভাগলপুরের অন্তর্গত পুরাকীর্তিসমূহ দর্শন করেন এবং বহু প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। পরে এগুলো ভাগলপুরের তদানীন্তন জমিদারের অনুমতিক্রমে কলকাতা বঙ্গীয় পরিষদে দান করেন। এসব সংগৃহীত প্রত্নসম্পদের সমাবেশ দেখে প্রকৃতপক্ষে এখানেই বরেন্দ্র ভূমির প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ সমন্ধে রাজশাহী প্রতিনিধিত্রয় চিন্তা করতে থাকেন। অতঃপর এ দলের সবচেয়ে উৎসাহী কর্মী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, কুমার শরৎ কুমার রায়কে মালদহের গৌড় পরিদর্শনের জন্য ইঙ্গিত করেন। কিন্ত দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কোনো কারণবশত তাদের গৌড় পরিদর্শন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে ঐ বছরেই তাঁরা রাজশাহী জেলার দেওপাড়া, চব্বিশনগর, মাড়ইল, কুমারপুর, বিজয়নগর, পাহাড়পুর ও হলুদ বিহার ইত্যাদি স্থানে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করে একটি চন্দ্রমূর্তিসহ ৩২টি প্রত্ননিদর্শন সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে বগুড়া জেলার মহাস্থান, ক্ষেতলাল, মহীপুর, ছাতিগ্রাম, সাঁতইল; রংপুর জেলার বিরাট ও সাতগড় এবং দিনাজপুর, বাণগড়, মনোহলী, বাসর, তপনদীঘি, বালুরঘাট, মহী-সন্তোষ, আগরাদ্বিগুন, জগদ্দল, আমইর, ধুরইল, যোগীগোফা, হরগৌরী এবং ঘোড়াঘাট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শিত এলাকা থেকে তাঁরা প্রচুর পরিমাণে প্রত্নদ্রব্য সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত প্রত্নদ্রব্যের সাহায্যে তাঁরা একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯১০ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, শশধর রায় ও কুমার শরৎ রায় এ চারজন "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করেন। পরে এ সমিতিতে কলকাতা চিত্রশালার (Kolkata Museum) তদানীন্তন সুপারিনটেনডেন্ট রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামকমল সিংহ যোগদান করেন। অতঃপর তাঁরা উত্তরবঙ্গের (বরেন্দ্র ভূমির) অনুসন্ধান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মোটামুটিভাবে এটাই হলো "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" গোড়ার কথা।

ঐ বছরেই (১৯১০) তদানীন্তন এম.এল.সি. ও গুলাইয়ের জমিদার সরদার হাজি লাল মুহাম্মদের কাচারী বাড়িতে (গুলাইয়ে) বরেন্দ্র রিসার্স সোসাইটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে একটি অনুসন্ধানী দল গঠিত হয়। এ অনুসন্ধানীদল দেওপাড়া, পালপাড়া, মালঞ্চি, জগৎপুর, আতাহার, চব্বিশনগর, তালাই ও মাড়ওইন প্রভৃতি প্রাচীন পল্লী পরিদর্শন করেন। অতঃপর ভানপুরের জমিদার

চৌধুরী হরিমোহন মহাশয় এ অনুসন্ধানী দলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তারপর সাহা কালীচরণ তাদেরকে আহ্বান করলে তারা কুমারপুর, বিজয়নগর, খেতুর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। প্রাথমিকভাবে এ দল পাঁচদিনে একটি চন্দ্রিমূর্তিসহ বত্রিশ খণ্ড প্রত্নিদর্শন সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। এ সময়ে কলকাতা জাদুঘরের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখানকার সংগৃহীত কতকগুলো প্রত্নসম্পদ "কলকাতা জাদুঘরে" ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় দান করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এ প্রস্তাবে রমাপ্রসাদ চন্দ আপত্তি জানান। অতঃপর অনুসন্ধান সমিতির এ অভূতপূর্ব কাজে সন্তুষ্ট হয়ে রাজশাহীর তৎকালীন জননায়ক ভুবন মোহন মৈত্রেয় উক্ত সমিতিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনার্থে এক সভা আহ্বান করেন। তিনি এক অভিনন্দন পত্রে এতদঞ্চলের (উত্তরবঙ্গের) প্রত্নসম্পদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে প্রকান্তরে রাজশাহীতে একটি জাদুঘর স্থাপনের ইঙ্গিত দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রাজশাহী শাখার অবৈতনিক সেক্রেটারি শশধর রায় এটাকে পূর্ণ সমর্থন করেন। এ প্রস্তাবের পর হতে কুমার শরৎ কুমার রায়ের মনে উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে একটি গবেষণাগার স্থাপনের বিষয় দোলা দিতে থাকে। পরে বগুড়ার খঞ্জনপুর বৈঠকে ক্ষেতলাল, শিবগঞ্জ ও মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থান হতে প্রচুর পরিমাণে প্রত্নসম্পদ সংগৃহীত হলে সমিতির বিশিষ্ট কর্মী পেটগ্রাম নিবাসী শ্রীরাম মৈত্রেয় রাজশাহীতে একটি জাদুঘর স্থাপন করে এসব সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। অবশেষে কুমার বাহাদুর রাজশাহীতে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। তৎপর সমিতির বিশিষ্ট সদস্য রমাপ্রসাদ চন্দ সমিতির সেক্রেটারি হিসাবে তৎপরতার সাথে সংগ্রহ কাজ চালাতে থাকেন। বিভিন্ন জেলায় সংগ্রহ কাজ চলতে থাকে। প্রথমত সংগৃহীত সম্পদ সংরক্ষণের জন্য রাজা প্রমোদানাথ রায়ের বাড়ি, পরে চৌধুরী মহেন্দ্র কুমার সাহা ও কালী প্রসন্ন আচার্যের বাড়িতে রক্ষিত হতে থাকে। পরিশেষে রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরির একটি কামরায় এসব মূল্যবান প্রত্নসম্পদ স্থানান্তরিত হয়। ১৯১২ সালের জুন মাসে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর বাহাদুরকে রাজশাহীতে প্রস্তাবিত মিউজিয়াম ব্যাপারে অবহিত করার জন্য কুমার শরৎ কুমার রায় ও বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ বিভাগীয় কমিশনারের ব্যবস্থাক্রমে দার্জিলিং গমন করেন। তৎপর গভর্নর বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল আগস্ট মাসে রাজশাহীতে অনুসন্ধান সমিতির সংগৃহীত প্রত্নসম্পদগুলোর একটি প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হন। অতঃপর ১৯১৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি একটি চিঠিতে "রাজশাহী শহরে একটি বেসরকারী মিউজিয়াম" স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। তখন থেকেই শুরু হয় বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের পথ চলা এবং সংগৃহীত হতে থাকে বিভিন্ন টেরাকোটা, মূর্তি, শিলালিপিসহ বিভিন্ন প্রত্নিদর্শন। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত কয়েকটি পোড়ামাটির ফলকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো:

ফলক নম্বর ১ (VRM NO ৩৩৮৬, চিত্র নম্বর ১)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতেরো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বলিহার, রাজবাড়ি, নওগাঁ থেকে সংগৃহীত এবং ফলকটি বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ফলকটির দৈর্ঘ্য ২১ সে.মি., প্রস্থ ১২ সে.মি. এবং বেধ ৪·৫ সে.মি.। কোঠরগত কোনাকুনি ফলকের পরিমাপ ২৪ সে.মি ও ২০ সে.মি। কারুকার্য খচিত পোড়ামাটির ফলকটিতে চার মাথা বিশিষ্ট অনন্ত নাগের দুই ভাঁজের মধ্যে বিষ্ণু শয্যারত এবং পাশে

চিত্র নম্বর ১ (VRM No : 3386) : অনন্ত নাগের দুই ভাঁজের মধ্যে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী

লক্ষ্মী বসে আছে। কোঠরগত ফলকটিতে সর্পটি তার মুখ দিয়ে অলৌকিক ক্ষমতা বলে ফণা বের করে ছত্রী আকারে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে রক্ষা করার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। শিল্পী এখানে ফলকটিতে ধর্মীয় বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ফলক নম্বর ২ (VRM NO ৩৩৪৩, চিত্র নম্বর ২)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতেরো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বলিহার, রাজবাড়ি, নওগাঁ থেকে সংগৃহীত এবং ফলকটি বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ফলকটির কোনাকুনি পরিমাপ ২৯ সে.মি. ও ১৫·৫ সে.মি.। ফলকটির দৈর্ঘ্য ২০ সে.মি., প্রস্থ ১০·৫ সে.মি. এবং বেধ ৩·৯ সে.মি.। খাঁজকাটা অলংকৃত পোড়ামটির ফলকটির মধ্যে বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে প্রথম অবতার মৎস্য অবতার বা মৎস্যরূপী অবতার যা কূর্মের পূর্ববর্তী অবতার। বিষ্ণু প্রথমে মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন।[২] মৎস্য অবতারের অস্ত্র সুদর্শন চক্র ও গদা। পুরাণে বর্ণিত আছে, মৎস্য পৃথিবীর প্রথম মানুষ মনুকে এক বিরাট বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। প্রাচীনকালে মৎস্যকে ব্রহ্মার অবতার হিসেবে গণ্য করা হলেও পরবর্তীকালে এটি বিষ্ণুর অবতার হিসেবেই অধিক পরিচিতি লাভ করে। পোড়ামাটির ফলকটিতে মৎস্যের মুখের ভিতর থেকে বের হওয়া অবস্থায় বিষ্ণুর চার হাতের মধ্যে একহাতে সুদর্শন চক্র ও আশীর্বাদের প্রতীক এবং অন্য হাতে গদা ও কৌমোদকী, গলায় বনমালা, মস্তকে শিরোভূষণ লক্ষণীয়। সহজ প্রকাশ ভঙ্গির সাবলীলতায় ফলকের মধ্যে যে প্রাণপ্রাচুর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। এ ধরনের ফলক ধর্মীয় কারণে প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়।

চিত্র নম্বর ২ (VRM No : 3343) : বিষ্ণুর প্রথম অবতার মৎস্য

ফলক নম্বর ৩ (VRM NO ৩৩৪৪, চিত্র নম্বর ৩)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতেরো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বলিহার, রাজবাড়ি, নওগাঁ থেকে সংগৃহীত এবং ফলকটি বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৯ সে.মি., প্রস্থ ১০ সে.মি. এবং বেধ ৩·৫ সে.মি.। ফলকটির কোনাকুনি পরিমাপ ২৬ সে.মি ও ১৭ সে.মি। কোনাকুনি অলংকৃত কোঠরগত খাঁজকাটা ফলকটির মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম দণ্ডায়মান। এর পূর্বের অবতার মৎস্য এবং পরের অবতার বরাহ। কূর্ম ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার।[৩] একদা ঋষি দুর্বাসা দেবরাজ ইন্দ্রকে দিব্য পুষ্পমালা উপহার দিয়েছিলেন। ইন্দ্র সে মালা সাদরে গ্রহণ করে তার বাহন ঐরাবতের মাথায় রাখেন।

চিত্র নম্বর ৩ (VRM No : 3344) : বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম

---

[২] সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান* (কলকাতা: এম.সি. সরকার, ১৪১৫), পৃ. ৩১৮।

[৩] তদেব, পৃ. ৯৪।

কিন্তু ঐরাবত সে মালা তার শুঁড়ে জড়িয়ে মাটিতে ফেলে নষ্ট করে দেয়। এতে ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে শ্রীহীন হবার অভিশাপ দেন। ব্রহ্মা তখন পুনরায় অমৃত প্রাপ্তির জন্য অসুরদের সাহায্যে সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দেন। মন্থন কালে মন্দর পর্বত সমুদ্রে ঢুকে যায় তখন ভগবান বিষ্ণু কচ্ছপের মুখের ভিতরে থেকে বের হয়ে কূর্মরূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে তাঁর পৃষ্ঠে ধারণ করেন। কূর্ম এর চার হাত-ওপরের ডান হাতে সুদর্শন চক্র, বাম হাতে কৌমোদকী, নীচে বাম হাতে গদা এবং ডান হাতে আশীর্বাদের প্রতীক। মস্তকে শিরোভূষণ সংবলিত পোড়ামাটির ফলকটি সহজ প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতায় যে প্রাণ প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। ফলকটি ছাঁচে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও এটি প্রাচীন শিল্পশৈলির অধিকারী।

ফলক নম্বর ৪ (VRM NO ৩৩৪৫, চিত্র নম্বর ৪)

চিত্র নম্বর ৪ (VRM No : 3345) : বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহ

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতেরো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বলিহার, রাজবাড়ি, নওগাঁ থেকে সংগৃহীত এবং ফলকটি বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৯ সে.মি., প্রস্থ ১০·৫ সে.মি., বেধ ৪ সে.মি.। কারুকার্য খচিত ফলকটির কোনাকুনি মাপ ২৪·৫ সে.মি. ও ১৯ সে.মি.। খাঁজকাটা খিলান বিশিষ্ট খোদিত ফলকটিতে বিষ্ণুর বরাহ অবতার উৎকীর্ণ। বরাহ হলেন হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর অবতার। এ অবতারে বিষ্ণু বন্য শূকরের রূপ ধারণ করেছিলেন। পুরাণ মতে, তিনি হিরণ্যাক্ষ নামক রাক্ষসের হাত থেকে ভূদেবী পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। পোড়ামাটির ফলকটিতে তাঁর চার হাত; চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম লক্ষণীয়। ফলকটিতে বরাহর দন্ত দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় দন্তটি ভেঙে গেছে। বরাহর পরিধানে ধুতি, পায়ে চপ্পল, গলায় অলংকৃত মালা, খাড়া কান, গঠন অতি সাধারণ। মনে হয় মূর্তিটিতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির ও উচ্চ শিল্পের প্রাণের সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে।

ফলক নম্বর ৫ (VRM NO ৩৩৪৬, চিত্র নম্বর ৫)

চিত্র নম্বর ৫ (VRM No : 3346) : বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহ

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতেরো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বলিহার, রাজবাড়ি, নওগাঁ থেকে সংগৃহীত এবং ফলকটি বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ফলকটির দৈর্ঘ্য ২৩·৩৯ সে.মি., প্রস্থ ১০·৭৫ সে.মি, বেধ ৩·৯ সে.মি.। কোঠরগত খাঁজকাটা ফলকের কোনাকুনি মাপ ২৫·২ সে.মি. ও ১৯ সে.মি.। ফলকটিতে বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহ। এ অবতারে বিষ্ণু অর্ধনর ও অর্ধসিংহ রূপ ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করার দৃশ্য লক্ষণীয়। মৎস্য পুরাণ অনুযায়ী নৃসিংহ অষ্টভুজ

হলেও অগ্নিপুরাণ অনুযায়ী তিনি চতুর্ভুজ।[৪] পোড়ামাটির ফলকটিতে নৃসিংহ অর্ধ-মনুষ্য ও অর্ধ-সিংহ আকার বিশিষ্ট। তাঁর দেহ মনুষ্যাকার, কিন্তু সিংহের ন্যায় মস্তক ও নখরযুক্ত। পোড়ামাটির ফলকটিতে নৃসিংহের চার হাত বিদ্যমান। নীচের দুই হাত দিয়ে শত্রুকে বধ করছে। ওপরের দুই হাত খাড়া করে রেখেছে। নৃসিংহের পরনে ধুতি, পায়ে চপ্পল, গলায় অলংকৃত মালা, খাড়া কান, গঠন অতি সাধারণ। এ ধরনের ফলক ধর্মীয় কারণে প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়।

ফলক নম্বর ৬ (VRM NO ৩৬৬০, চিত্র নম্বর ৬)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক উনিশ শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি শামসুল হক মুন্সি (তাড়াশ, পাবনা) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৪ সে.মি., প্রস্থ ১৪ সে.মি. এবং বেধ ৪ সে.মি.। বর্গাকৃতি পোড়ামাটির ফলকটিতে বিষ্ণুর (বামন অবতার) ডান পায়ের নীচে শিব এবং বাম পায়ের নীচে শৃগাল লক্ষণীয়। বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার বামন অবতার।[৫] যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। কশ্যপ মুনির ও তার স্ত্রী অদিতির গর্ভে তিনি বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বলির কাছে বামন ত্রিপদ ভূমি প্রার্থনা করেন। অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে বলি বামনকে ত্রিপদ দান করেন। বামন তার এক পা ভূমণ্ডলে, দ্বিতীয় পা স্বর্গে এবং তৃতীয় পা মস্তকে স্থাপন করেন। পোড়ামাটির ফলকটিতে বামনের এক পা মস্তকের ওপর, অন্য পা ভূমিতে এবং আর একটি পা দেখা যাচ্ছে না। মূর্তিটির পেট স্থূল, চার হাতের মধ্যে তিন হাতে গদা, শঙ্খ ও পদ্ম, গলায় বনমালা কোমরে কোমর বন্ধন, মাথায় মুকুট, উদ্‌গত চক্ষু, নাকের ওপর ভাঙা, পরনে ধুতি লক্ষণীয়। মূর্তিটির ভঙ্গির মধ্যে কোনো লাবণ্য বা সুষমা নেই এবং অন্তর্নিহিত কোনো ভাব বা চিন্তা মুখশ্রীতে ফুটে ওঠেনি। মনে হয় মূর্তিটিতে সৌন্দর্যানুভূতি ও উচ্চ শিল্পের প্রাণ সম্পূর্ণ অভাব হলেও ধর্মীয় কারণে ফলকটি প্রাধান্য পেয়েছে।

চিত্র নম্বর ৬ (VRM No : 3660) : বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার বামন

ফলক নম্বর ৭ (VRM NO ৩৩৯৯, চিত্র নম্বর ৭)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠারো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার (রাজবাড়ি, নওগাঁ) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৯ সে.মি., প্রস্থ ১০ সে.মি. এবং বেধ ৪·৫ সে.মি.। ফলকের কোনাকুনি পরিমাপ ২৪.৫ সে.মি. ও ১৯.৫ সে.মি। এ ধরনের ফলক কোন বিশেষ ধরনের কাজে ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়। খাঁজকাটা অলংকৃত ফলকের মধ্যে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম দণ্ডায়মান। পরশুরামের পিতা জমদগ্নি ব্রাহ্মণ হলেও মা রেণুকা ছিলেন ক্ষত্রিয়। পিতার দিক থেকে ইনি ভৃগুবংশ থেকে উদ্ভূত এবং মাতার দিক থেকে ইনি কুশিক বংশোদ্ভূত।[৬] কঠোর তপস্যা করে তিনি

---

[৪] অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা: বিশ্বকোষ হিন্দুধর্ম* (কলকাতা: ফার্মা কেএলএম, ২০০১), পৃ. ৭৯১।

[৫] সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান*, পৃ. ২৬৩।

[৬] সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান*, পৃ.২২৪।

াবের নিকট হতে পরশু লাভ করেন এবং যুদ্ধ বিদ্যা শিখেন। পরশুরাম ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়। তিনিই লেন প্রথম যোদ্ধা। ফলকটিতে পরশুরামের দুই হাত – ডান াতে পরশু (কুঠার বা টাঙ্গি – এক ধরনের অস্ত্র), বাম হাতে দ্ম, কানে দুল, গলায় বনমালা, হাতে বাজু, মাথায় পাগড়ির রপাশে বনমালা, পায়ে চপ্পল কোমরে কোমর বন্ধনী, ধুতির চি দুই পার্শ্বে নেমে আছে। ফলকটিতে অলংকার শোভিত ঠাম ও বলিষ্ঠ দেবতা পরশুরামের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। এ পাড়ামাটির ফলকটিতে সৌন্দর্যানুভূতির যে প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠিত য়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। তবে এ ধরনের পোড়ামাটির লক ধর্মীয় কারণে প্রাধান্য পেয়েছে।

চিত্র নম্বর ৭ (VRM No : 3399) : বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম

লক নম্বর ৮ (VRM NO ৩৩৮৮, চিত্র নম্বর ৮)

পাড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতেরো শতকের। পাড়ামাটির ফলকটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিহার, রাজবাড়ি, নওগাঁ থেকে সংগৃহীত এবং ফলকটি র্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৭.৫ স.মি., প্রস্থ ১১.৫ সে.মি. এবং বেধ ৪.২৫ সে.মি.। কোনাকুনি রিমাপ ২২.৫ সে.মি ও ১৮.৫ সে.মি। কোঠরগত অলংকৃত াজকাটা ফলকটিতে কৃষ্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট তাঁর মাতুল রাজা ংসকে আক্রমণের দৃশ্য লক্ষণীয়। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। ংস ভোজ বংশীয় অত্যাচারী মথুরার রাজা ছিলেন। রাজা কংস বিষ্যদ্বাণীতে জ্ঞাত কৃষ্ণের আবির্ভাব ঠেকাতে সে নিজের বোন-

চিত্র নম্বর ৮(VRM No : 3388) : কৃষ্ণ ও রাজা কংস

গ্নিপতি অর্থাৎ কৃষ্ণের মাতা-পিতা দেবকী-বসুদেবকে কারাগারে আটকে রাখে এবং নিজের হাতে বানের সন্তানদের হত্যা করে।[৭] পোড়ামাটির ফলকটিতে কৃষ্ণের জন্মকাহিনী এবং তার মাতুলের ক্রতার কাহিনী স্থান পেয়েছে।ফলকটিতে রাজা কংসের মাথায় মুকুট, হাতে তরবারি নিয়ে সিংহাসনে পবিষ্ঠ অন্যদিকে কৃষ্ণের মাথায় পদ্মফুল সুশোভিত মুকুট, গলায় বনমালা, এক হাত কংসের মাথার পর অন্য হাতে তরবারি দিয়ে আক্রমণের দৃশ্য সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। মূর্তিগুলোর দৈহিক ঠন, অবস্থান ও ভঙ্গি এবং বসনের বিন্যাসে এক বিশেষ ধরনের শিল্পরীতির অনুসরণে পরিকল্পিত ও পায়িত। এ ধরনের ফলকও ধর্মীয় কারণে প্রাধান্য পেয়েছে ।

লক নম্বর ৯ (VRM NO ৩৩৯৪, চিত্র নম্বর ৯)

পাড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতেরো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর র্তৃপক্ষ কর্তৃক বলিহার, রাজবাড়ি, নওগাঁ থেকে সংগৃহীত এবং ফলকটি বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত াছে। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৯ সে.মি. প্রস্থ ১১.৫ সে.মি. এবং বেধ ৪ সে.মি.। কোনাকুনি ফলকটির

[৭] *বাংলাপিডিয়া* (২০১১) , " কৃষ্ণ " ভুক্তি।

পরিমাপ ২৫.৫ সে.মি ও ১৯ সে.মি।ফলকটিতে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ এবং লক্ষ্মীর অবতার রুক্মিণী(কৃষ্ণের স্ত্রী) পদ্মফুলের ওপর বসে আছেন এবং পাশে একজন দাসী তার সেবা করছেন। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অষ্টম অবতার এবং তাঁকে স্বয়ং ভগবান এবং বিষ্ণুর পূর্ণাবতারও মনে করা হয়।[৮] রামায়ণ অনুসারে লক্ষ্মী পদ্ম হস্তে সমুদ্র হতে উত্থিত হন।[৯] রুক্মিণীর কানে কর্ণাভরণ, মাথায় মুকুট, গলায় মালা দিয়ে এক হাত কৃষ্ণের কাঁধে, দুইপা পদ্মফুলের ওপর রেখে বসে আছেন। অন্যদিকে কৃষ্ণের পদ্মফুল সুশোভিত মুকুট, গলায় বনমালা, এক হাতে গদা, অন্য হাতে আশীর্বাদের প্রতীক, কানে কর্ণাভরণ, এক পা পদ্মফুলের ওপর এবং অন্য পা ঝুলন্ত, পাশে দাসী দণ্ডায়মান। সহজ প্রকাশ ভঙ্গির সাবলীলতায় ফলকের মধ্যে যে প্রাণ–প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। ফলকটিতে সেকালের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের আলেখ্য পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র নম্বর-৯(VRM No:3394) : কৃষ্ণ ও রুক্মণী

ফলক নম্বর ১০ (VRM NO ৩৫০৭, চিত্র নম্বর ১০)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠারো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার (রাজবাড়ি, নওগাঁ) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৮·৫ সে.মি.,প্রস্থ ১২ সে.মি. এবং বেধ ৫ সে.মি.। ফলকটির কোনাকুনি পরিমাপ ২১·৫ সে.মি. ও ১৯·৫ সে.মি.। ফলকটির নীচের অংশ ভাঙা। কোনাকুনি ফলকটিতে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ রাজা কংসের অনুচর কেশী দানবকে বধ করার চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। কৃষ্ণকে পূর্ণাবতার হিসেবে গণ্য করা হয়।[১০] কথিত আছে যে, শ্রী কৃষ্ণকে বিনাশ করার জন্য কংস কেশী দানবকে বৃন্দাবনে পাঠালে সে অশ্বরূপ ধারণ করে গোপগণের ওপর অত্যাচার করে এবং তাদের গাভীদের বধ করে মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণ তার কাছে গেলে সে কৃষ্ণকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। কৃষ্ণ তখন তার মুখের মধ্যে বিশাল বাহু প্রবেশ করিয়ে শ্বাসরোধ করে কেশীকে হত্যা করে।[১১] ফলকটিতে উৎকীর্ণ দৃশ্যে কৃষ্ণ তাঁর দুই হাত দিয়ে কেশীর দুই পা ধরে কেশীকে বধ করছে। কৃষ্ণের পরনে ধুতি, গলায় বনমালা, কোমরে কোমর বন্ধনী, পায়ে চপ্পল, মাথায় পদ্মফুল শোভিত মুকুট, কানে দুল লক্ষণীয়।

চিত্র নম্বর ১০ (VRM No : 3507) : কৃষ্ণ ও কেশী দানব

---

[৮] *বাংলাপিডিয়া* (২০১১) ," কৃষ্ণ " ভুক্তি।

[৯] সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান*, পৃ. ৯৭।

[১০] John Dowson, *A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature* (Kolkata : Rupa &Co.,1992), p. 361.

[১১] সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান*, পৃ. ১০৩।

ফলক নম্বর ১১ (VRM NO ৩৩৮৫, চিত্র নম্বর ১১)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠারো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার (রাজবাড়ি, নওগাঁ) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৯ সে.মি. প্রস্থ ১০·৫ সে.মি., বেধ ৪ সে.মি.। এ ধরনের ফলক বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়। খাঁজকাটা সুন্দর অলংকৃত ফলকটির মধ্যে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের ভাই বলরাম, বোন সুভদ্রার একটি মঞ্চের পিছনে দণ্ডায়মান। বলরাম রোহিণীর পুত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।[১২] সুভদ্রা বলরামের সহোদরা ও শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী।[১৩] পোড়ামাটির ফলকটি সুন্দর কারুকার্য খচিত। ফলকের কোনায় ত্রিভাজে পদ্মফুল। ফলকের মাঝখানে একটি পদ্মফুল। মূর্তিগুলোর মাথায় অর্ধচন্দ্রের ওপর পদ্মফুল সুশোভিত মুকুট, প্রত্যেকের গলায় তিনটি করে বনমালা, পরিধানে বসন–ভূষণ নেই এবং সুন্দর কারুকার্য খচিত মঞ্চ লক্ষণীয়। ফলকটিতে উৎকীর্ণ মূর্তির গঠন অতি সাধারণ, ভঙ্গির মধ্যে কোনো সুষমা নেই এবং অন্তর্নিহিত কোন ভাব বা চিন্তা মুখশ্রীতে ফুটে ওঠেনি।

চিত্র নম্বর ১১ (VRM No : 3385) : বলরাম, সুভদ্রার ও কৃষ্ণ

ফলক নম্বর ১২ (VRM NO ৩৩৯৬, চিত্র নম্বর ১২)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠারো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার (রাজবাড়ি, নওগাঁ) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৮ সে.মি., প্রস্থ ১০·৫ সে.মি. ও বেধ ৩·৮ সে.মি.। ফলকের কোনাকুনি পরিমাপ ২৯ সে.মি ও ১৫.৫ সে.মি। খাঁজকাটা অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে কল্কি ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন। কল্কি বিষ্ণুরদশ অবতারের শেষ অবতার।[১৪] কল্কি হিন্দু ধর্মের একজন অবতার যিনি কলিযুগে মানুষ সমাজে ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হবেন। পুরাণ থেকে জানা যায় যে কল্কি অবতার সাদা ঘোড়ার পিঠে খোলা তরবারি হাতে আবির্ভূত হবেন। কল্কি অর্থ অশুভ ধ্বংসকারী এবং অন্ধকার দূরকারী। সংস্কৃতে কল্কি অর্থ সাদা ঘোড়া। ফলকটিতে কল্কির পায়ে চপ্পল, হাতে খোলা তরবারি, মাথায় পাগড়ী, মাজায় কাপড় বাধা, পরিধানে রাজকীয় পোশাক। ফলকটিতে সেকালের ধর্মীয় ও সামাজ জীবনের আলেখ্য পরিলক্ষিত হয়।

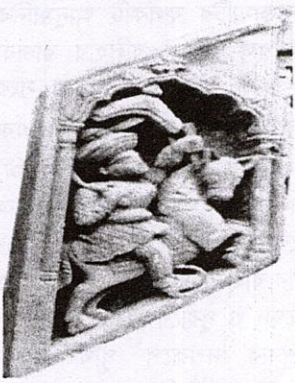

চিত্র নম্বর ১২ (VRM No : 3396) : অশ্বের পিঠে কল্কি

---

[১২] তদেব, পৃ. ২৫৬।

[১৩] তদেব, পৃ. ৪৪৬।

[১৪] সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান*, পৃ. ৭৪।

ফলক নম্বর ১৩ (VRM NO ৬৭৮(A), চিত্র নম্বর ১৩)

চিত্র নম্বর ১৩ (VRM No : 678(A)) : গরুড়

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক উনিশ শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি প্রমথনাথ মুন্সী (পানিসরা, শেরপুর, বগুড়া) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১১·৪৩ সে.মি., প্রস্থ ১০·৭৯ সে.মি. এবং বেধ ৩·৮ সে.মি.। কোনাকুনি অলংকৃত খাঁজকাটা ফলকটির মধ্যে বিষ্ণুর বাহন গরুড় প্রণাম করা অবস্থায় দণ্ডায়মান। গরুড় শব্দের অর্থ বাক্যের ডানা। তিনি বৈদিক জ্ঞানের প্রতীক। হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণে উল্লিখিত গরুড় একটি বৃহদাকার পৌরাণিক পাখি বা পক্ষীতুল্য জীব। তিনি ঋষি কশ্যপ ও বিনতার পুত্র।[১৫] তাঁর দাদা অরুণ সূর্যের বাহন। কথিত আছে যে গরুড় অমৃত আহরণে সক্ষম হলেও অমৃতে তাঁর কোন লোভ ছিল না। অমৃত তিনি নিজের হাতে বহন করে নিয়ে আসলেও একবিন্দু অমৃত পান করেননি। গরুড়ের এ চরিত্রে খুশি হয়ে বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে ইচ্ছা করেন। তখন গরুড় অমৃতপান ব্যতীত অমরত্বলাভ এবং সর্বদা বিষ্ণুর ওপরে থাকার বর প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তা স্বীকার করেন এবং নিজের ওপরে অর্থাৎ নিজের ধ্বজায় গরুড়কে স্থান দেন। এরপর গরুড় নিজেই বিষ্ণুকে আরো একটি বর দিতে অনুরোধ ব্যক্ত করেন। বিষ্ণু বর হিসেবে গরুড়কে তাঁর বাহন বলেন এবং গরুড়ও তা মেনে নেন। সে সময়ে ধর্মীয় এবং নান্দনিক কারণে এ ধরনের ফলক প্রাধান্য পেয়েছে।

ফলক নম্বর ১৪ (VRM NO ৩৩৯৩, চিত্র নম্বর ১৪)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতেরো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বরেন্দ্র গবেষণাজাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বলিহার রাজবাড়ি, নওগাঁ থেকে সংগৃহীত এবং ফলকটি বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৯ সে.মি. প্রস্থ ১২·০৬ সে.মি. এবং বেধ ৩·৮ সে.মি.। কোনাকুনি এ ফলকটির পরিমাপ ২৫ সে.মি. ও ১৯·৫ সে.মি.। এ ধরনের কোনাকুনি পোড়ামাটির ফলক কোনো বিশেষ জায়গায় ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়। কোঠরগত খাঁজকাটা অলংকৃত ফলকের মধ্যে বিষ্ণু তার বাহন গরুড় পিঠে বসে আছেন এবং গরুড় তাঁকে প্রণাম করছে। ঋগ্বেদ ও পুরাণে বিষ্ণুর নানাবিধ বর্ণনা রয়েছে। সৃষ্টি রক্ষাকল্পে বিষ্ণু দশবার দশরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, যাকে বলা হয় দশাবতার।[১৬] বিষ্ণুর চার হাতের মধ্যে নীচের বাম হাতে গদা, ডান হাতে আশীর্বাদের প্রতীক, ওপরে ডান হাতে সুদর্শন চক্র এবং বাম হাতে কৌমোদকী, মাথায় অলংকৃত মুকুট, গলায় বনমালা, বাহুতে অঙ্গদ। মূর্তিগুলোর দৈহিক গঠন, অবস্থান ও ভঙ্গি এবং বসনের বিন্যাস এক বিশেষ ধরনের শিল্পরীতির অনুসরণে পরিকল্পিত ও রূপায়িত। এ ধরনের ফলক ধর্মীয় ও নান্দনিক কাজে ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়।

চিত্র নম্বর ১৪ (VRM No : 3393) : বিষ্ণু ও গরুড়

---

[১৫] তদেব, পৃ. ১১৬।

[১৬] *বাংলাপিডিয়া* (২০১১) ," বিষ্ণু" ভুক্তি।

ফলক নম্বর ১৫ (VRM NO ৩৩৮৯, চিত্র নম্বর ১৫)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতেরো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বলিহার, রাজবাড়ি, নওগাঁ থেকে সংগৃহীত এবং ফলকটি বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ফলকটির দৈর্ঘ্য ২১ সে.মি.,প্রস্থ ১২·৫ সে.মি. এবং বেধ ৫ সে.মি.। কোনাকুনি ফলকটির পরিমাপ ২৪·৫ সে.মি. ও ১৯ সে.মি। কোনাকুনি খাঁজকাটা অলংকৃত ফলকের মধ্যে চতুর্ভুজ ময়ূরবাহনা সরস্বতী। বেদে সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।[১৭] তিনি জ্ঞান, সঙ্গীত ও শিল্পকলার হিন্দু দেবী। কথিত আছে যে তিনি সরস্বতী নদীর অভিন্ন এক রূপ। সরস্বতী হিন্দু ধর্মের সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার পত্নী এবং লক্ষ্মী ও পার্বতীর সংগে একযোগে ত্রিদেবী নামে পরিচিত। পোড়ামাটির ফলকটিতে সরস্বতীর চার হাতের মধ্যে দুই হাত দিয়ে বীণা ধারণ করে আছে। ডানে দেবীর ওপরের এক হাতে পুস্তক অন্য হাতে অক্ষসূত্র, গলায় পুষ্প মালা, মাথায় মুকুট, কানে কর্ণাভরণ লক্ষণীয়। অলংকরণ শোভিত সুঠাম ও বলিষ্ট দেহ সংবলিত পোড়ামাটির ফলকটি সৌন্দর্যানুভূতি দিয়ে নির্মিত শিল্পের প্রাণ চিত্রিত হয়েছে।

চিত্র নম্বর ১৫ (VRM No : 3389) : সরস্বতী দেবী

ফলক নম্বর ১৬ (VRM NO ৩৩৯১, চিত্র নম্বর ১৬) :

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতেরো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বলিহার, রাজবাড়ি, নওগাঁ থেকে সংগৃহীত এবং ফলকটি বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ফলকটির দৈর্ঘ্য ২১ সে.মি., প্রস্থ ১২·৫ সে.মি. ও বেধ ৪ সে.মি.। অলংকৃত খাঁজকাটা কোঠরগত ফলকটির কোনাকুনি পরিমাপ ২৮ সে.মি. ও ১৯ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটিতে শিবের পিঠে মাহেশ্বরী দণ্ডায়মান। পোড়ামাটির ফলকটিতে শিবের হাতে ত্রিশূল, তাঁর ধনুকের নাম পিনাক, তাঁর ললাটে তৃতীয় নয়ন, তাঁর ওপর অর্ধ চন্দ্র, মাথায় জটা, কণ্ঠে সর্পের উপবীত, হস্তে নানাবিধ অস্ত্র লক্ষণীয়। শিবের বাহন নন্দী (ষাঁড়) সর্বদা তাঁর সহচর। শিবের হাতে ডমরু নামে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র সব সময়ে থাকে। পার্বতী রাগান্বিত হলে তিনটি রূপ কালী, চামুণ্ডা ও মহেশ্বরী রূপ ধারণ করে। পোড়ামাটির ফলকটিতে শিল্পী মাহেস্বরীর ধর্মীয় কাহিনী ও নান্দনিক চিত্র তুলে ধরেছেন।

চিত্র নম্বর ১৬ (VRM No : 3391) : মাহেশ্বরী দেবী

ফলকনম্বর ১৭ (VRM NO ৩৫১৩, চিত্র নম্বর ১৭)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠারো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার (রাজবাড়ি, নওগাঁ) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির দৈর্ঘ্য ২১ সে.মি. এবং প্রস্থ ১১·৫

চিত্র নম্বর ১৭ (VRM No : 3513) : ময়ূরের পিঠে উপবিষ্ট কার্তিক

[১৭] সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান*, পৃ. ৪৩১।

সে.মি. এবং বেধ ৪ সে.মি.। ফলকটির কোনাকুনি পরিমাপ ২৬ সে.মি. ও ২১ সে.মি.। খাঁজকাটা অলংকৃত ফলকের মধ্যে দুই হাত বিশিষ্ট যুদ্ধদেবতা কার্তিক ময়ূরের পিঠে উপবিষ্ট। কার্তিক হিন্দু যুদ্ধ দেবতা। তিনি মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র।[১৮] কার্তিকের বাহন ময়ূর। কার্তিকের আবাসস্থল কৈলাস, সঙ্গী গল্পী এবং দেবযানী। পোড়ামাটির ফলকটিতে কার্তিকের বাম পা ময়ূরের পিঠে, ডান পা ঝুলানো, বাম হাত মুষ্ঠিবদ্ধ এবং ডান হাতে তীর, গলায় অলংকৃত মালা, পরিধানে ধুতি লক্ষণীয়। মূর্তিটির দৈহিক গঠন, অবস্থান ও ভঙ্গি এবং বসনের বিন্যাস এক বিশেষ ধরনের শিল্পরীতির অনুসরণে পরিকল্পিত ও রূপায়িত । সে সময় ধর্মীয় কারণে এ ধরনের ফলক প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়।

ফলক নম্বর ১৮ (VRM NO ৩৫১২, চিত্র নম্বর ১৮)

চিত্র নম্বর ১৮ (VRM No : 3512) : চামুণ্ড

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠারো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার (রাজবাড়ি, নওগাঁ) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত।ফলকটির দৈর্ঘ্য ২০ সে.মি., প্রস্থ ১১ সে.মি. ও বেধ ৪·৫ সে.মি.। ফলকটির কোনাকুনি পরিমাপ ২৬ সে.মি. ও ১৯·৫ সে.মি.। এ ধরনের ফলক বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়। পোড়ামাটির ফলকটির মধ্যে চামুণ্ডা (দুর্গাদেবীর রূপবিশেষ) মৃত দেহের ওপর বসে আছে। চামুণ্ডা দুর্গার কপাল গতে উদ্ভূতা।[১৯] তিনি তাঁর কোঠরগত চক্ষু দ্বারা জগৎ ভস্মী-ভূত করেন। ভূত ও প্রেতগণ তাঁর সঙ্গী।[২০]তার আবাস শ্মশানক্ষেত্র অথবা ডুমুর গাছ, বাহন পেচক বা মৃতদেহ, ধ্বজায় বাজপাখির চিত্র অংকিত। চামুণ্ডা শুম্ভ ও নিশুম্ভের সেনাপতি দৈত্য চণ্ড ও মুণ্ডকে নিধন করার জন্য আগতা দেবীবিশেষ। এ দুই দৈত্যকে বধ করে চামুণ্ডা দুর্গার কাছে এদের মুণ্ড দান করেন। সে থেকে এ দেবীর নাম চামুণ্ডা হয়। মূর্তিটির চার হস্ত - এক হস্তে ডমরু, অন্য হস্তে রক্তপূর্ণ পান পাত্র, খড়্গ, বজ্র, গলায় নরমুণ্ডমালা শোভিত, লম্বিত স্তন, মাথায় জট, কঙ্কালসার দেহ, ভয়াল মুখমণ্ডল, সম্মুখ প্রসারিত দন্তপঙ্‌ক্তি, দীর্ঘ নখর ও স্ফীত উদর। কোঠরগত চক্ষু, ভূত ও প্রেতগণ তাঁর সঙ্গী। পোড়ামাটির ফলকটি এক ধরনের শিল্পরীতির অনুসরণে পরিকল্পিত ও রূপায়িত।

ফলক নম্বর ১৯ (VRM NO ৩৫০৬, চিত্র নম্বর ১৯)

চিত্র নম্বর ১৯ (VRM No : 3506) : দুর্গা দেবী

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠারো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার (রাজবাড়ি, নওগাঁ) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে

---

[১৮] সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান*, পৃ. ৭৯।

[১৯] তদেব, পৃ. ১৩৪।

[২০] D. Kinsley, *Hindu Goddesses: Vision of the Devine Feminine in the Hindu Religious Traditions*(California : University of California Press, 1988), p. 147.

প্রত্যর্পিত।ফলকটির দৈর্ঘ্য ২০ সে.মি., প্রস্থ ১২·৫ সে.মি. ও বেধ ৪ সে.মি.। কোনাকুনি ফলকটির পরিমাপ ২৬ সে.মি. ও ২০·২ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটিতে দুর্গা তার বাহন সিংহের পৃষ্ঠে উপ-বিষ্ট। দুর্গা মূলত শক্তির দেবী। দেবী দুর্গা পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বের আদি কারণ ও শিবপত্নী।[২১] হিন্দু পৌরাণিক শাস্ত্র অনুসারে তিনি শিবের স্ত্রী পার্বতী, কার্তিক ও গণেশের জননী এবং কালির অন্যরূপ।ফলকটিতে দুর্গার দুই হাত লক্ষণীয়। দুই হাতে পদ্মফুল, গলায় বনমালা, শাড়ি পরিহিত, বাহুতে বাজুবন্ধন, হাতে বালা, পায়ে মল ও চপ্পল, খাড়া কান এবং কানে দুল, উদ্‌গত চক্ষু, খাড়া নাক, কোমরে কোমর বন্ধন, অলংকৃত হস্ত, গঠন অতি সাধারণ, পরিধেয় বসন–ভূষণও অতিশয় সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত। সহজ প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতায় ফলকটির মধ্যে যে প্রাণ-প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। সে সময় প্রধানত ধর্মীয় কারণে এ ধরনের ফলক খোদিত হয়েছে। তবে শিল্পীর নান্দনিক বোধ ও তার পৃষ্ঠপোষকদের ভূমিকাও এ ধরনের শিল্প কর্ম নির্মাণে উদ্দীপিত করেছে।

ফলক নম্বর ২০ (VRM NO ৩৫০৩, চিত্র নম্বর ২০)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠারো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার (রাজবাড়ি, নওগাঁ) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির দৈর্ঘ্য ২০ সে.মি., প্রস্থ ১১সে.মি. ও বেধ ৪·৫ সে.মি.। কোনাকুনি ফলকটির পরিমাপ ২৯ সে.মি. ও ১৬·৫ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটিতে মনসা দেবী সর্পের ওপর উপবিষ্ট। মনসা সর্পগণের দেবী।[২২] এ দেবী অত্যন্ত সুন্দরী বলে এর নাম জগৎ গৌরী। শিবের শিষ্যা বলে তিনি শৈবী; বিষ্ণুভক্তা বলে বৈষ্ণবী; জনমেজয়ের যজ্ঞে নাগদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন বলে নাগেশ্বরী; বিষ হরণকারিণী বলে বিষহরী; মহাদেবের কাছে সিদ্ধাযোগ পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধযোগিনী আর কশ্যপের মানসী কন্যা বলে মনসা নামে পরিচিত। মনসা সর্বাঙ্গে সর্পাভরণভূষিতা এবং পদ্ম অথবা নাগপৃষ্ঠে আসীন। তাঁর মাথার ওপর সপ্ত ফণাযুক্ত নাগছত্র দেখা যায়। মনসাকে এক চক্ষু কানা দেবীও বলা হয়। কারণ তাঁর একটি চোখ সৎ মা কর্তৃক দগ্ধ হয়েছিল। পোড়ামাটির ফলকটিতে মনসা দেবী সর্পের উপর উপ-বিষ্ট এক হাতে সর্প অন্য হাতে গদা, সর্প অলংকৃত মাথায় মুকুট, গলায় সর্পের মালা, পরিধানের বেশ–ভূষণ সাদা–মাটা, বাহুতে বাজুবন্ধন, হাতে সর্প অলংকৃত মালা লক্ষণীয়। এক বিশেষ শিল্পরীতির অনুসরণে ফলকটি পরিকল্পিত ও রূপায়িত এবং মনে হয় ধর্মীয় কারণে এ ধরনের ফলক প্রাধান্য পেয়েছে।

চিত্র নম্বর ২০ (VRM No : 3503) : মনসা দেবী

চিত্র নম্বর ২১ (VRM No : 3384) : ষষ্ঠী দেবী

[২১] সুধীরচন্দ্র সরকার , *পৌরাণিক অভিধান*, পৃ. ১৭৭।
[২২] সুধীরচন্দ্র সরকার , *পৌরাণিক অভিধান*, পৃ. ৩২৩।

ফলক নম্বর ২১ (VRM NO ৩৩৮৪, চিত্র নম্বর ২১)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠারো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার (রাজবাড়ি, নওগাঁ) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৯ সে.মি., প্রস্থ ১২·৫ সে.মি. বেধ ৪.৫ সে.মি.। অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকটির কোনাকুনি পরিমাপ ২৫ সে.মি. ও ১৯·৫ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটিতে ষষ্ঠী দেবী একটি শিশু কোলে নিয়ে তার বাহন বিড়ালের পিঠে উপবিষ্ট। ইনি শিশুদিগের প্রতিপালনকারী।[২৩] মহাভারতের আদি পর্বে উল্লেখিত হয়েছে, যে ব্যক্তি যৌবন সম্পন্না সপুত্রা এঁর মূর্তি গৃহে রাখে, তার গৃহ সর্বদা ধনধান্য, পুত্র–কন্যাদিতে পূর্ণ থাকে। এঁর নাম ষষ্ঠী দেবী। তিনি শিশুদের প্রতিপালনকারী। ফলকটিতে ষষ্ঠী দেবীর কর্ণে কর্ণাভরণ, গলায় বনমালা, লম্বা নাক, উদগত চক্ষু তারকা বিশিষ্ট, কোমরে কোমরবন্ধন, বাহুতে বাজুবন্ধন, হাতে বালা, মাথায় খোপা, গঠন অতি সাধারণ, পরিধেয় বসন–ভূষণ অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। ফলকটি সাতটি ভাজ বিশিষ্ঠ খিলানের মধ্যে খোদিত, ছাঁচে নির্মিত খিলানটির বহির্ভাগ অলংকৃত। এ ধরনের ফলক ধর্মীয় ও নান্দনিক কারণে প্রাধান্য পেয়েছে।

ফলক নম্বর ২২ (VRM NO ২০৯১, চিত্র নম্বর ২২)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক উনিশ শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি শামসুল হক মুন্সি (তাড়াশ, পাবনা) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির দৈর্ঘ্য ২৬ সে.মি., প্রস্থ ২১ সে.মি. ও বেধ ৪·৫ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটি মনে হয় ছাদের কারুকার্যের একটি অংশ। ফলকটির মধ্যে তিন সারিতে পাঁচটি করে মোট পনেরোটি গৌতম বুদ্ধ বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপসনারত অবস্থায় আসীন। ইনি মানবের আচার, রীতি-নীতি বিষয়ক সংহিতাকার।[২৪] তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক, কশ্যপবুদ্ধের পূর্বসূরী এবং মৈত্রেয় বুদ্ধের উত্তরসূরী। বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানপ্রাপ্ত বা আলোকপ্রাপ্ত। পোড়ামাটির ফলকটিতে ধুতি পরিহিত অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপাসনায় মগ্ন গৌতম বুদ্ধের মূর্তি লক্ষণীয় । এখানে শিল্পী ধর্মীয় ও নান্দনিক দিক ফলকটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

চিত্র নম্বর ২২ (VRM No : 2091) : গৌতমবুদ্ধ

ফলক নম্বর ২৩ (VRM NO ৩৪০০, চিত্র নম্বর ২৩)

পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠারো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার (রাজবাড়ি, নওগাঁ) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির দৈর্ঘ্য ১৭ সে.মি., প্রস্থ ১০ সে.মি. ও বেধ ৪·৫ সে.মি.। কোনাকুনি ফলকটির পরিমাপ ২৪ সে.মি. ও ১৬ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটিতে দশ মহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা কালী তাঁর বাহন শৃগাল অথবা শিবার ওপর দণ্ডায়মান। শক্তি উপসকরা কালীকে আদ্যাশক্তি বলে

---

[২৩] তদেব, পৃ. ৪১৪।

[২৪] সুধীরচন্দ্র সরকার , *পৌরাণিক অভিধান*, পৃ. ১২৪।

পাসনা করেন।[২৫] বঙ্গীয় তন্ত্রসার, শ্যামারহস্য প্রভৃতি তন্ত্রে কালীর বিভিন্ন রূপের কথা বলা হয়েছে, থা: দক্ষিণ, সিদ্ধ, গুহ্য, ভদ্র, শ্মশান, রক্ষা ও মহাকালী।[২৬]তবে ধারণভাবে তাঁর মূর্তিতে চারটি হাতে খড়্গ, অসুরের ছিন্নমুণ্ড, বর ও ভয়মুদ্রা, গলায় মানুষের মুণ্ড দিয়ে গাথা মালা, বিরাট জিভ, কালো গায়ের ং, এলো কেশে এবং তাঁর স্বামী শিবের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বাঙালি হিন্দু সমাজে দেবী কালীর মাতৃরূপের পূজা বিশেষ নপ্রিয়। ফলকটিতে কালির চারটি হাত-দক্ষিণ হস্ত দুইটিতে খট্টাঙ্গ ও ন্দ্রহাস, আর বাম হস্ত দুইটি চর্ম ও পাশা, গলায় নরমুণ্ড, দেহ ব্যাঘ্রচর্মে াবৃত, দীর্ঘদন্তী, রক্তচক্ষু, বিস্তৃত মুখ ও স্থূল কর্ণ, পায়ে চপ্পল লক্ষণীয়। খানে শিল্পি তার নৈপুন্যের মাধ্যমে কালীর রূপ ফলকটিতে তুলে ধরার চষ্টা করেছেন।

চিত্র নম্বর ২৩ (VRM No : 3400) : কালী

লক নম্বর ২৪ (VRM NO ৫৬৪, চিত্র নম্বর ২৪)

পাড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতেরো শতকের। পোড়ামাটির ফলকটি মি. দেবেন্দ্রজতি রায় মান্দাইল, মান্দা, রাজশাহী) কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যর্পিত। ফলকটির র্ঘ্য ২১ সে.মি., প্রস্থ ১৮ সে.মি. ফ্রেমে বাধা। ফলকটিতে হিন্দু ধর্মের দেবতা হনুমান পাহাড়ের ওপর য়ে আছে। হনুমান রামের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি কেশরী বানরের ক্ষেত্রজ বায়ুর ঔরস পুত্র।[২৭] তাঁর অস্ত্র গদা। হিন্দুদের কাছে হনুমান রামভক্ত হিসেবে পরিচিত। হনুমান নামটি এসেছে হনু (চেয়াল) এবং মান (বিশিষ্ট া কদাকার) শব্দদ্বয় থেকে। অর্থাৎ হনুমান শব্দার্থ 'কদাকারচেয়াল বিশিষ্ট'। হিন্দু পুরাণে হনুমানকে বিশেষ স্থান দেয়া হয়েছে। রামায়ণের ূল চরিত্র রাম থেকে হিন্দুরা হনুমানকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার হিসেবে াবি করে। হনুমান সীতাকে উদ্ধারের জন্য লংকায় অভিযানে যান। ফলকটিতে উৎকীর্ণ মূর্তির গঠন অতি সাধারণ, পরিধেয় বসন-ভূষণ নেই, ঙ্গির মধ্যে কোনো সুষমা নেই এবং অন্তর্নিহিত কোনো ভাব বা চিন্তা খশ্রীতে ফুটে ওঠেনি। ফলকটিতে ধর্মীয় তাৎপর্য প্রদর্শনের নিমিত্তে দেবতাদের প্রতি বিশ্বাসের প্রগাঢ় দপ প্রকাশ পেয়েছে।

চিত্র নম্বর ২৪ (VRM No : 564) : হনুমান

উপসংহার

উল্লিখিত পোড়ামাটির ফলকগুলো গ্রাম্য মৃৎশিল্পীরা স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সুলভ্য আঠালো মাটি দিয়ে আনন্দের ছলে যে রূপ সৃষ্টি করেছে তাতে অবসরপুষ্ট গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনের পরিমিত সৌষ্ঠব া মার্জিত রুচির পরিচয়, উচ্চস্তরের ভাবানুভূতি, জটিল মননশীলতার পরিচয় আশা করা যায় না। পাড়ামাটির ফলকগুলো শিল্প নৈপুণ্যের এবং জ্যামিতিক পরিমাপের অভাব থাকতে পারে তবে জীবনের প্রতি গভীর অনুভূতি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রাচুর্য সে অভাবকে পূরণ করে দিয়েছে। মৃৎশিল্পীগণ

---

[২৫] তদেব, পৃ. ৮৫।

[২৬] *বাংলাপিডিয়া* (২০১১) ,"কালী পূজা" ভুক্তি।

[২৭] সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান*, পৃ. ৪৬৩।

সমাজের দরিদ্রস্তরে বসবাস করলেও তাদের অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা চারপাশের চোখে দেখা সমাজকে পোড়ামাটির ফলকগুলোতে ফুটিয়ে তুলেছে। আর সহজলভ্য কাদামাটি ও স্থানীয় শিল্পী দ্বারা তৈরির এসব চিত্রফলকে তৎকালীন সমাজজীবন, ধর্মীয় বিশ্বাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। ফলকগুলোতে বৈচিত্র্য ও বর্ণনা সৌষ্ঠবে এক অপূর্ব দক্ষতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে যথাযথ নিয়মকানুনের এবং সঠিক কলাকৌশল প্রয়োগের অভাব পরিলক্ষিত হলেও জীবনাবেগের প্রাচুর্য ও সহজ প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতায় চিত্রফলকগুলোর মধ্যে যে প্রাণ-প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা সত্যিই অতুলনীয়। ফলকগুলোতে ধর্মীয় তাৎপর্য প্রদর্শনের যে আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে তা যেমন বাস্তবধর্মী তেমন হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণবন্ত। পোড়ামাটির ফলকগুলোতে তৎকালীন গ্রাম-বাংলার মানুষের দেবতা ও অপদেবতাদের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও ভক্তির চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। মোট কথা এসব পোড়ামাটির ফলকগুলোতে গ্রাম বাঙলার লোকশিল্পের এক বাস্তব পরিচয় ফুটে ওঠেছে। সেই সাথে ফলকগুলোতে সেকালের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজজীবনের আলেখ্যও চিত্রায়িত। বিবর্তনের দিক দিয়ে এ শিল্প নিদর্শনগুলোর মূল্য খুব বেশি না হলেও শৈল্পিক বিশ্লেষকের দিক হতে ইতিহাস আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

নবাবি বাংলার প্রাসাদ রাজনীতিতে নারী

নাখলু জাতুল আকমাম*

Abstract: Since the era of the Nawabi rule in Bengal, the women of the *harem* though had received some privileges but they did not enjoy equal treatment and facilities as compared to the men. Sometimes traditional religious bindings pushed them back in terms of playing their roles as socio-political activists which had seen the confinement of women in the four walls of *harem.* But some of the royal ladies had enjoyed high recognitions and dignities due to the influence of their noble deeds in the Nawabi Bengal. This research also attempted to shed light on the impact of the involvement of women in the socio- political arena of Nawabi Bengal.

মিকা

াচীনকাল থেকে সমাজে নারীরা পুরুষের প্রায় সমান সংখ্যা হিসেবে থাকলেও কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা, ংস্কৃতি ও রাজনীতিসহ অনেক ক্ষেত্রেই তারা ছিলো চরমভাবে অবহেলিত। নবাবি শাসনামলে র্দাপ্রথাকে সমাজে আভিজাত্য ও সামাজিক শালীনতা হিসেবে গণ্য করা হতো। পর্দান্তরালে বসবাস রলেও এ সময়ে মুসলমান নারীদের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যাঁরা জ যোগ্যতা ও প্রচেষ্টায় পরবর্তী সময়ের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা রে গেছেন এবং সমাজ ও রাজনীতিতে একটি মর্যাদাজনক আসন অধিকার করে আছেন। নবাবি াসনামলে বাংলায় বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা নারীর সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা পর্দা পালন করলেও ন্দর মহলের চার দেয়ালে আবদ্ধ ছিলেন না, তাঁরা মাতা, ভগ্নি এবং স্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনায় ল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুর্শিদকুলি খানের কন্যা ও উড়িষ্যার সহকারী াসনকর্তা সুজাউদ্দিনের স্ত্রী জিন্নাতুন্নেছা, নবাব সুজাউদ্দিনের কন্যা ও দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের স্ত্রী রদানা বেগম, নবাব সুজাউদ্দিনের কন্যা ও সরফরাজ খানের ভগ্নি নাফিসা বেগম, নবাব আলীবর্দী ানের স্ত্রী শরফুন্নেসা বেগম, নবাব আলীবর্দী খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা এবং নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের পত্নী সেটি বেগম, নবাব আলীবর্দী খানের কনিষ্ঠ কন্যা ও সিরাজউদ্দৌলার মাতা আমেনা বেগম, নবাব রাজউদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেসা, নবাব মীরজাফরের স্ত্রী মুনি বেগম, বব্বু বেগম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এ কল তেজস্বিনী নারী প্রদেশের রাজনীতিতেও অংশ নিয়েছিলেন এবং রাজমহল, কলকাতা ও

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সমকালীন সমাজে সংস্কৃতি ও সুরুচির পরিচয় দিয়ে সামাজিক জীবন সঞ্জীবিত ও আলোকিত করেছিলেন।

নবাবি শাসনামলে বাংলার নারীদের অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাধারণত পর্দান্তরালে বসবাসকারী এ নারীরা ছিলেন পুরুষের উপর নির্ভরশীল এবং তাঁদের শিক্ষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের উচ্চস্তরেই সীমাবদ্ধ ছিলো। দু-একটি ব্যত্যয় ছাড়া তাঁদের সাধারণত আর্থিক ক্ষমতা ছিলো না, যা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য উপাদান। এতৎসত্ত্বেও যে সকল প্রতিভাময়ী নারী এ সময়ে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের সম্পর্কে কিছু বিচ্ছিন্ন লেখনী হলেও সমন্বিত কোনো আলোচনা চোখে পড়ে না। এ প্রবন্ধে সে চেষ্টা করা হয়েছে।

নওসেরি বানু বেগম

নবাবি বাংলার প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খানের একমাত্র পত্নী নওসেরি বানু বেগমের প্রাথমিক পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তিনি ইরানের তুর্কি আফশার গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করায় কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁকে নবাব আলীবর্দী খানের আত্মীয় হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।[১] বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় যে, তাঁর বাবা মোগল সম্রাটের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং ছোটবেলায় তিনি বাবার কাছেই প্রাথমিক ও ইসলামি শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে নবাব মুর্শিদকুলির সাথে তাঁর বিয়ে হয় এবং তাঁকে নিয়েই নবাব সুখে-শান্তিতে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন।[২] একজন নবাব পত্নী হিসেবে নওসেরি বানু বেগম পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সবক্ষেত্রেই অত্যন্ত পারদর্শিতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজকীয় বিভিন্ন কাজে তিনি যেমন নবাবকে সাহায্য করতেন আবার নিজেও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। মোজাফ্ফরনামার বর্ণনামতে, আলীবর্দী খান চাকুরির সন্ধানে স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে বাংলা হয়ে উড়িষ্যা রাজ্যের কটকে সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খানের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময়ে পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি করে মুর্শিদাবাদে জাফর খানের (মুর্শিদকুলি খান) নিকটে যান কিন্তু আলীবর্দীর প্রতি মুর্শিদকুলি খান ভালো ধারণা পোষণ করতেন না বলে নওসেরি বানু বেগম এ ব্যাপারে আলিবর্দীকে সতর্ক করে দেন এবং সাবধানে উড়িষ্যায় চলে যেতে বলেন। বেগমের কথা শুনে আলীবর্দী কটকে সুজাউদ্দীনের নিকট চলে যান।[৩] এখানে নওসেরি বানু বেগম কর্তৃক কৌশল অবলম্বন করে অন্যের কল্যাণ করার প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যায়।

---

[১] ইউসুফ আলী খান, *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবত জঙ্গী*, মূল ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৯৭), পৃ. ৬।

[২] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন*, মূল ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদ ও টীকা, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. ৭; মুন্‌শী রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ড. এ. এম. শরফুদ্দিন (ঢাকা: প্রথম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ ২০০৭), পৃ. ৫৯।

[৩] করম আলি খান, *মোজাফ্ফরনামা*, অনুবাদ, সম্পাদনা ও টীকা, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, মার্চ ১৯৯৮), পৃ. ১১; ইউসুফ আলী খান, পৃ. ৫।

নওসেরি বানু বেগম একজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন নারী ছিলেন। *রিয়াজুস সালাতিন*-এর বর্ণনামতে, মুর্শিদকুলি খানের কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি দৌহিত্র সরফরাজখানকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।[৪] কিন্তু সরফরাজের বাবা এবং মুর্শিদকুলির জামাতা সুজাউদ্দিন নিজ পুত্রের উত্তরাধিকার লাভের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। তিনি ছেলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সসৈন্যে বাংলায় গমন করেন। এমতাবস্থায় সরফরাজ খান তাঁর মাতামহী নওসেরি বানু ও মা জিন্নাতুন্নেছার পরামর্শে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকেন এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। নওসেরি বানুর চেষ্টায় পিতা ও পুত্রের মধ্যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘর্ষ সংঘটিত হয়নি।[৫] লক্ষ করা যায় যে, এরপর থেকে তিনি প্রত্যেকদিন সকালে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে নওসেরি বানু বেগমের কক্ষে আসতেন।[৬] এভাবে একজন সচেতন নারী হিসেবে নওসেরি বানু বেগম মহলের ভেতরে ও বাইরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। পারিবারিক কাজ পরিচালনায়ও নওসেরি বানু বেগম অত্যন্ত পারদর্শী ও রুচিশীল ছিলেন। বেগম হয়েও তিনি মহলের সবদিকে নজর রাখতেন। নবাবের খাবারের তালিকা প্রণয়ন ও খাবার গ্রহণে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। গৃহ ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে তিনি সূচিকর্মের মাধ্যমে শৈল্পিক নকশা ফুটিয়ে তুলতেন এবং মহলের নারীদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের চকবাজারে তিনি একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এখানে একটি মক্তব বা মাদ্রাসাও ছিলো বলে জানা যায়। সেখানে বিনা বেতনে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করতে পারতো।[৭] শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রসাদ রাজনীতির সাথে সাথে নওসেরি বানু বেগমের শিক্ষানুরাগ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

জিন্নাতুন্নেসা বেগম

নবাবি বাংলার ইতিহাসে জিন্নাতুন্নেসা বেগম এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন নারী ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁকে জেবুন্নেছা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] তাঁর উপাধি ছিল আজিমুন্নেছা বেগম। এর অর্থ বেগমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[৯] তিনজন নবাবের ঘনিষ্ঠজন অর্থাৎ নবাব মুর্শিদকুলি খানের কন্যা, নবাব

---

[৪] গোলাম হোসাইন সলীম, *রিয়াজুস সালাতিন*, অনুবাদ, আকবর উদ্দীন (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪), পৃ. ২২৫- ২২৭।

[৫] তদেব, পৃ. ২২৭।

[৬] *A Narrative of the Transaction in Bengal, During the Soobahdaries*, Authors' and book name is unknown, Translated from the original Persian, Francis Gladwin ESC Calcutta: From the Press of Surat and Cooper, 5th February 1788), pp. 58-59; যদুনাথ সরকার (*Bengal Nawabs*) ও শ্যামাপ্রসাদ বসু (*মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাংলা: ১৭০০-১৭২৭*)-সহ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই গ্রন্থটিকে মুন্‌শি সলিমুল্লাহ রচিত *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* এর অভিন্ন অনূদিত গ্রন্থ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।

[৭] এস এম আলী রেজা, *মুর্শিদাবাদ ও বাংলার নাজিম* (কলকাতা: পুথিপত্র প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮), পৃ. ১।

[৮] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, পৃ. ৭-১০।

[৯] এস এম আলী রেজা, পৃ. ৪২।

সুজাউদ্দিন খানের স্ত্রী ও নবাব সরফরাজখানের মাতা হিসেবে জিন্নাতুন্নেসা বেগমের চরিত্রে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সমাবেশ ঘটেছিলো। মুর্শিদকুলি খান বাংলার নাজিম হওয়ার পর জামাতা সুজাউদ্দিনকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন।[১০] জিন্নাতুন্নেসা স্বামীর সাথে উড়িষ্যায় থাকতেন। কিন্তু সুজাউদ্দিনের দুর্বল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা অত্যধিক নারী আসক্তির কারণে এক সময়ে তিনি পুত্রসহ উড়িষ্যা থেকে মুর্শিদাবাদে এসে আলাদা বসবাস শুরু করেন। এর মাধ্যমে আমরা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় লাভ করি। স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকলেও দৃঢ়চেতা ও বুদ্ধিদীপ্ততার কারণে তিনি পরবর্তীতে নবাবি বাংলার রাজনীতিতে নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১১]

১৭২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন নবাব মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যু হলে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী জিন্নাতুন্নেসার পুত্র সরফরাজ খান বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুর্শিদাবাদ এসে সিংহাসন অধিকার করার চেষ্টা করলে পিতা–পুত্রের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে ভেবে সুজাউদ্দিন খান মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। এ সময়ে মুর্শিদাবাদে বসবাসরত তাঁর বেগম জিন্নাতুনেসার নিকট থেকে পত্র আসে যে, যতশীঘ্র সম্ভব নবাব সুজাউদ্দিন খান যেন মুর্শিদাবাদে চলে আসেন।[১২] সুজাউদ্দিন খান বেগমের পত্র পেয়ে মুর্শিদাবাদ চলে যান। কিন্তু পিতা ও পুত্রের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয়নি কারণ সরফরাজকে তাঁর মাতা ও মাতামহী পিতার সাথে সংঘর্ষ না করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সরফরাজ এ উপদেশ মেনে পিতার সাথে সংঘর্ষে না গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মুর্শিদাবাদ নিয়ে আসেন।[১৩] এ ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জিন্নাতুন্নেসা বেগম পুত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে কৌশলে স্বামীকে নবাব হয়ে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতে অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করেন।

ঐতিহাসিক নানা ঘটনায় জিন্নাতুন্নেসার রাজনৈতিক সচেতনতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, আজিমাবাদের নায়েব নাজিমের পদ খালি হলে সেখানে বিশেষ কাউকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো প্রয়োজন ছিলো। এ অবস্থায় নবাব সুজাউদ্দৌলা তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে কাউকে সুবিধাজনক মনে না করে পুত্রদের মধ্যে সরফরাজ অথবা ত্বকি খানকে আজিমাবাদে প্রেরণের কথা বিবেচনা করেন। জিন্নাতুন্নেসা সরফরাজকে এত দূরে প্রেরণ করতে রাজি ছিলেন না আবার এত গুরুত্বপূর্ণ পদে ত্বকি খানকে প্রেরণও যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি, কারণ ত্বকি খান তাঁর নিজের পুত্র ছিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে বেগমকে রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায়। পুত্রদেরকে আজিমাবাদে প্রেরণ না করে তিনি সুজাউদ্দিনকে এই বলে বুঝান যে, আলীবর্দী খানের মত একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আজিমাবাদে প্রেরণ করা নবাবের জন্য উচিত কাজ হবে। ফলে জিন্নাতুন্নেছার পরামর্শে নবাব সুজাউদ্দৌলা আলীবর্দী খানকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আজিমাবাদে প্রেরণের আদেশ

---

[১০] Nawab Nusrat Jang, *Tarikh-i-Nusratjangi,* Translated by Abdus Sobhan (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2005), p. 12.

[১১] সুশীল চৌধুরী, *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪), পৃ. ৮৮-৮৯।

[১২] Karam Ali Khan, "Muzaffar-Namah" in *Bengal Nawabs*, Translated into English by Jadunath Sarkar (Kolkata: The Asiatic Society, First published 1952, Third reprint March 2008), p. 13.

[১৩] গোলাম হোসাইন সলীম, পৃ. ২২৭; ইউসুফ আলী খান, পৃ. ৭৫; Kali Kinkar Datta, "Shuja-ud-din Md Khan," in *History of Bengal (Muslim Period),* Vol.II, Edited by, Jadunath Sarkar (Dhaka: The University of Dhaka, 4th Impression October 2006), p. 423.

প্রদান করেন এবং শপথ গ্রহণের পূর্বেই জিন্নাতুন্নেসা আলীবর্দী খানকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে আজিমাবাদের সুবাদারির সম্মানী পরিচ্ছদ বা খিলাত প্রদান করে বিহারের ছোটো নবাব হিসেবে ঘোষণা করেন।[১৪] অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, সুজাউদ্দিনের কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণের জন্য আলীবর্দী খান ও হাজী আহমদ নবাবের দুই পুত্র সরফরাজ ও তুকি খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধানোর চেষ্টা করেন এবং এর ফলে সরফরাজ ও তুকি খানের মধ্যে যুদ্ধের অবতরণা হলে নবাব সুজাউদ্দিনের হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়। এ ঘটনার পর সুজাউদ্দিন তুকি খানকে তিরস্কার করলেও জিন্নাতুন্নেসার প্রভাবের কারণে সরফরাজকে কিছু বলেননি এমনকি পরবর্তীতে বেগমের অনুরোধেই নবাব তুকি খানকে ক্ষমা করে দেন।[১৫] তেজস্বিনী নারী জিন্নাতুন্নেসার নিজ হাতে আলীবর্দী খান-কে খিলাত প্রদান সহ এ সকল ঘটনা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নবাবি বাংলার প্রাসাদ রাজনীতিতে তিনি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নাফিসা বেগম

নাফিসা বেগম ছিলেন নবাব সুজাউদ্দিন ও জিন্নাতুন্নেসার জ্যেষ্ঠ কন্যা। তাঁর স্বামী সৈয়দ রাজি খান নবাব সরফরাজের পূর্বে বাংলার দিওয়ান ছিলেন। তাঁদের সৈয়দ মুরাদ খান নামে এক পুত্র ছিলো। তিনি একজন জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী ও সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন নারী ছিলেন। বাংলার কোনো নবাবের বেগম না হয়েও তিনি নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে বাংলার রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন। নবাব সরফরাজ খান তাঁর বোন নাফিসা বেগমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং নানা বিষয়ে বোনের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। নাফিসার পরামর্শে তাঁর পুত্র সৈয়দ মুরাদকে নবাব কর্তৃক ঢাকার নৌ-বহরের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগদান, এমনকি বোনের অনুরোধে নিজ কন্যার সাথে মুরাদের বিয়ে এবং বিয়ের পর জামাতাকে জাহাঙ্গীরনগরের ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৬] নাফিসা বেগম শুধু নবাব সরফরাজ খানের শাসনামলেই নয় তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার প্রসাদ রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আলীবর্দী খান বাংলার ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে গিরিয়ার যুদ্ধে (১৭৪০ খ্রি.) নাফিসার ভাই সরফরাজকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করলেও নবাব নাফিসা বেগমের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[১৭] তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ-ই-মহাবত জঙ্গী-এর বর্ণনামতে, নবাব আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদ নগরে এসে প্রথমে নাফিসা বেগমের সাথে দেখা করতে যান এবং স্বহৃদয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ বক্তব্য দ্বারা নাফিসার হৃদয়ের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করেন।[১৮] তবে সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন-এর বর্ণনামতে, আলীবর্দীর কথায় নাফিসা বেগম একদমই আশ্বস্ত হননি।[১৯] সিয়ারের বক্তব্যের সাথে আমরা এ কারণেই একমত পোষণ করতে পারি যে, আলীবর্দী খান যেহেতু তাঁর চাকরিদাতা ও পরম স্নেহকারী নবাব সুজাউদ্দৌলার

---

[১৪] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, পৃ. ১০; ইউসুফ আলী খান, পৃ. ১২; সুশীল চৌধুরী, পৃ. ৮৮-৮৯।

[১৫] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, পৃ. ২৩৪।

[১৬] গোলাম হোসাইন সলীম, পৃ. ২৩৭-২৩৮।

[১৭] Nawab Nusrat Jang, p. 13.

[১৮] ইউসুফ আলী খান, পৃ. ৭৭; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, পৃ. ৩৫৫।

[১৯] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, পৃ. ৩৪০।

ছেলে নবাব সরফরাজকেই ক্ষমতায় আরোহণের জন্য হত্যা করতে পেরেছেন সেহেতু তাঁর বোনকে সম্মান করবেন এ বক্তব্যে আশ্বস্ত হওয়া যায় না। তবে সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন-এর অপর একটি বর্ণনায় দেখা যায় যে, আলীবর্দী খান নাফিসা বেগমের নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করেন এবং তাঁকে সর্বদা সম্মান প্রদানের আশ্বাস দেন। আলীবর্দীর নির্দেশে তাঁর জামাতা নওয়াজিশ মুহম্মদ খান নাফিসা বেগম ও তাঁর অধীন লোকজনকে ঢাকার রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং সরফরাজ খানের সদ্য ভূমিষ্ঠ পুত্রকেও (আকা বাবা) রাজপ্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা করেন। নওয়াজিশ ও তাঁর স্ত্রী ঘসেটি বেগম নাফিসা বেগমকে মায়ের মর্যাদাদান করে তাঁকে গৃহ-সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করেন বলে জানা যায়।[২০] আহওয়াল-ই-মহাবত জং-এর বর্ণনা হতে জানা যায়, নওয়াজিশ (সহমত জং) ও তাঁর স্ত্রী ঘসেটি বেগম নাফিসা বেগমকে সাদরে গ্রহণ করেন।[২১] তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবত জঙ্গী-এর বর্ণনামতে, আলীবর্দী খান প্রতিশ্রুতি অনুসারে নাফিসা বেগমকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়াও এক লক্ষ টাকা বা তারও বেশি বার্ষিক আয়ের নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন এবং সরফরাজের এক শিশুপুত্র সহ তাঁর সন্তানদের মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।[২২] নবাব আলীবর্দী খান ক্ষমতা দখলের পর সরফরাজের বেগম ও সন্তানদের জাহাঙ্গীরনগরে নির্বাসন দেওয়া হয় এবং সরফরাজের খাস তালুকের আয় থেকে তাঁদের ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। আরো জানা যায় যে, নওয়াজিশ আহমদের প্রাসাদে নাফিসা বেগম গৃহ-শিক্ষকরূপে চাকরি নিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র আকাবাবাকে লালন-পালন করতেন।[২৩]

সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন-এর অপর একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, আলীবর্দী খানের বেগম ও কন্যাদের উপরও এই নারীর কর্তৃত্ব ছিলো এবং তাঁর আদেশ নওয়াজিশের অনুমতি ছাড়াই কার্যকর করা হতো। একজন প্রশাসনিক যোগ্যতাসম্পন্ন নারী হিসেবে তিনি নওয়াজিশ খানের খাস তালুক ও পারিবারিক সম্পত্তিরও তত্ত্বাবধান করতেন। নবাব আলীবর্দী খান ও নওয়াজিশ মুহাম্মদ উভয়েই তাঁর প্রতি এত উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতেন ও অনুগত ছিলেন যে, তাঁদের কেউই ভক্তিভরে মাথা নত না করে তাঁর সামনে উপস্থিত হতেন না, কিংবা বিনা অনুমতিতে আসন গ্রহণ করতেন না।[২৪] তবে তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ-ই-মহাবত জঙ্গী-এর বর্ণনায়, নবাব সরফরাজ খানকে হত্যার পর তাঁর গৃহস্থালির সম্পত্তি ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আলীবর্দী খানের স্ত্রী ও কন্যাদের ব্যবহারে অতিশয় রূঢ়তা ও ধৃষ্টতা পরিলক্ষিত হওয়ায় এবং একই সাথে গৃহশিক্ষকরূপে চাকরি নিয়ে ভাতা গ্রহণের ঘটনা থেকে সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন-এর বর্ণনায়[২৫] নাফিসা বেগমকে অতি উচ্চ সম্মান প্রদানের ব্যাপারটি কিছুটা

---

[২০] Kali Kinkar Datta, *op.cit.*, p. 442; এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭)*, দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদ, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ১৮৪।

[২১] Yusuf Ali, *Ahwal-i-Mahabat Jang in Bengal Nawabs*, Translated into English by, Jadunath Sarkar (1952; Kolkata: Asiatic Society, 2008), p. 153.

[২২] *A Narrative of the Transaction in Bengal During the Soobahdaries,* p. 82; ইউসুফ আলী খান, পৃ. ২৮।

[২৩] গোলাম হোসাইন সলীম, পৃ. ২৫৪।

[২৪] এম.এ. রহিম, পৃ. ১৮৪।

[২৫] ইউসুফ আলী খান, পৃ. ২৮; গোলাম হোসাইন সলীম, পৃ. ২৫৪, মূলত: নবাব আলীবর্দী খানের দরবারে সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি-এর পিতা উচ্চপদে কাজ করতেন এবং তাঁর মাতা নবাবের আত্মীয় ছিলেন বলেই তিনি হয়তো এ ধরনের পক্ষপাতমূলক বক্তব্য রেখেছেন; J.H. Little, *"The House of Jagatseth," Bengal Past and Present,* XX, 39-40 (Jan-June 1920), pp. 183-184.

অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। তবে উপরিউক্ত তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায় যে, তিনি দরবার ও মহলে অনেকটা সম্মানজনক অবস্থানে ছিলেন।

শরফুন্নেসা বেগম

নবাব আলীবর্দী খানের স্ত্রী শরফুন্নেসা বেগম যোগ্য সহধর্মিণী হিসেবে নবাবের ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধিমতী ও পরিণত রাজনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী। একজন উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন ও গুণান্বিতা নারী হিসেবে তিনি নবাবি বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছেন। নবাব আলীবর্দী খান নিজে বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও অসাধারণ মানসিক ও প্রশাসনিক ধীশক্তির অধিকারী হলেও স্ত্রীর পরামর্শের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিলো। সঙ্কটের সময়ে বেগম ছিলেন তাঁর আশা ও উৎসাহের উৎসস্বরূপ। করম আলির মতে, একদা চাকুরির প্রয়োজনে আলীবর্দীর উড়িষ্যা গমনের প্রয়োজন হলেও তাঁর কাছে কোনো অর্থ না থাকায় শরফুন্নেসা নিজের গহনা বিক্রি করে স্বামীকে উড়িষ্যায় গমনের ব্যবস্থা করেন।[২৬] এভাবে তিনি সুখে-দুঃখে সর্বদা আলীবর্দীর সাথে থেকে তাঁর প্রেরণার উৎস ও শেষ ভরসা হিসেবে কাজ করেন। এজন্য মধ্যযুগীয় অভিজাত মহলে একাধিক বিয়ে বা অনেক নারীর সংস্পর্শে আসা শাসক বা অভিজাতদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবে গণ্য হলেও আলীবর্দী খান এরূপ কাজ থেকে বিরত ছিলেন। এর মাধ্যমে একদিকে নবাবের পূত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় এবং অন্যদিকে বেগম শরফুন্নেসার যোগ্যতা ও পারদর্শিতার দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২৭]

নবাব আলীবর্দী খান নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ ছাড়া রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে বেগমের পরামর্শ নিতেন এবং সর্বাবস্থায় বেগমকে পাশে রাখতেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও বেগম উপস্থিত থাকতেন। মারাঠাদের সাথে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে, উড়িষ্যার যুদ্ধে ও বালাসোরের যুদ্ধে শরফুন্নেসা নবাবের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং নবাবকে যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে যেমন পরামর্শ প্রদান করতেন, তেমনি সাহসও জোগাতেন বলে জানা যায়।[২৮] শরফুন্নেসা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নবাবকে সাহায্য করতেন এবং নিজেও হস্তক্ষেপ করতেন। মারাঠা নেতা রঘুজি ভোসলের সাথে নবাব আলীবর্দীর যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শরফুন্নেসা একান্তভাবে নিজের সিদ্ধান্তে তাঁর পক্ষ থেকে তুকি আলী খান ও মোজাফ্ফর আলী খানকে দূত হিসেবে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে রঘুজির নিকট প্রেরণ করেন। শত্রুতার কারণে হাবিবুল্লাহ খানের[২৯] পরামর্শে রঘুজি এ প্রস্তাব না মানলেও বেগমের এমন উদ্যোগ তাঁর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই পরিচয় দান করে।

---

[২৬] করম আলি খান, পৃ. ২২।

[২৭] *A Narrative of the Transaction in Bengal During the Soobahdaries*, p. 82.

[২৮] ইউসুফ আলী খান, পৃ. ৮১-৮২।

[২৯] হাবিবুল্লাহ খান মূলত মীর হাবিব নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ইরানের শিরাজ নগরের অধিবাসী ছিলেন এবং ভাগ্যান্বেষণে তিনি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে ভারতে আসেন এবং কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে নবাব শুজা-উদ-দৌলাহর জামাতা ও ঢাকার নায়েবে নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের সেনাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্য দখল করে এর নাম 'রওশনাবাদ' রাখেন। পরে তিনি দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের সাথে মুর্শিদাবাদ গমন করেন এবং মারাঠা-নবাবদের দ্বন্দ্বের সময়কালে মারাঠাদের সাথে হাত মেলান। শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মারাঠাদের হাতেই শোচনীয়ভাবে নিহত হন। (বিস্তারিত দেখুন, Azad-al

নবাব আলীবর্দীর শাসনামলে মারাঠাদের মতো আফগানগণও বাংলায় বিভিন্ন ধরনের উৎপাত করতে থাকে। নবাবের প্রধান সেনাপতি মোস্তফা সমশের খাঁ সহ কয়েকজন আফগান বিহার প্রদেশে গোলযোগ সৃষ্টি করে ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পরবর্তীতে কৌশলে নবাবের জামাতা জৈনুদ্দিনের সাথে দেখা করে আনুগত্য প্রকাশ করার ভান করে এবং পরে সুযোগ বুঝে জৈনুদ্দিনসহ তাঁর পরিবারের কতিপয় সদস্যকে হত্যা ও নারীদের ভীষণভাবে লাঞ্ছিত করে। স্নেহের জামাতা, কন্যা ও পরিবারের এই শোচনীয় কষ্টের খবর শুনে নবাব আলীবর্দী খান অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং ভেঙে পড়েন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে শরফুন্নেসা বেগম বিভিন্ন উপদেশ ও প্রশান্তিমূলক কথার মাধ্যমে নবাবের মনকে হালকা করার চেষ্টা করেন। তিনি নবাবকে উজ্জীবিত করতে তাঁকে 'দুর্বল হৃদয়ের মানুষ' বলে নিন্দা করে আফগানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন এবং নবাবকে কন্যা ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করার উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দেন।[৩০] বেগমের উৎসাহে নবাব আফগানদের দমনে দৃঢ় সংকল্প হন এবং পরিজনদের উদ্ধার করে আফগানদের শাস্তি দিলেও তাদের পরিবারের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদান করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, বেগম যদি আলীবর্দী খানকে আফগানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত না করতেন তবে তিনি শোকে এত মুহ্যমান হয়ে পড়তেন যে সহসা শত্রুদের দমন করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।[৩১]

বেগমের অসাধারণ প্রতিভার জন্য আলীবর্দী খান রাজধানী হতে তাঁর অনুপস্থিতিকালে বেগমের প্রতি রাজকার্যের ভার প্রদান করতেন এবং এজন্য তিনি দিল্লির সম্রাটের নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন। সম্রাটের অনুমতির ফলে এ সময়ে হতে মুর্শিদাবাদে 'গদিনসীন বেগম' পদের সৃষ্টি হয়।[৩২] ফলে এ সময়ে রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বেগমকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। উড়িষ্যা বিজয়ের পর নবাব আলীবর্দী খান বিজয়ী বেশে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ে শরফুন্নেসার পরামর্শে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মীর্জা নিরকের পুত্র কাসিম আলী খানকে বখশির পদ থেকে সরিয়ে রংপুরের ফৌজদারের পদে নিয়োগ করা হয়। আলীবর্দী খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিলো না বলে পরবর্তী উত্তরাধিকারী নিয়ে কন্যাদের মধ্যে বড়ো ধরনের দ্বন্দ্বের মনোভাব দেখা দেয়। এমতাবস্থায় শরফুন্নেসা পরামর্শে নবাব আলীবর্দী খান ১৭৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দে সুবে বাংলার পরবর্তী নবাব হিসেবে সিরাজউদ্দৌলাকে মনোনীত করেন। এছাড়া বিহার পুনরুদ্ধারের পর বিহারের নায়েব নাজিম নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রভাবশালী অভিজাতদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিলো সেখানে নবাবকে আশ্বস্ত করে নিজ স্নেহাস্পদ সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়োগের মাধ্যমে তিনি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করেন।[৩৩] শরফুন্নেসা সিরাজকে বিহারের নায়েব নাজিম নিয়োগ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি সর্বাবস্থায় সিরাজের পরামর্শক ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং অন্যদিকে সিরাজও তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করতেন। এ কারণে সিরাজউদ্দৌলা নবাব হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্য পরিচালনায়ও তিনি নবাব সিরাজকে বিভিন্নকাজে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেন। এমনকি সিরাজের চির বিরোধী ঘসেটি বেগমের সাথে যাতে সিরাজের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় সেজন্য তিনি এ দুজনের মধ্যকার বিরোধ

Husaini, "Nau-Bahar-i-Murshid Quli Khani" in *Bengal Nawabs*, pp. 4-9; Karam Ali Khan, "Muzaffar-Namah" in *Bengal Nawabs*, p. 28; ইউসুফ আলী খান, পৃ. ৪৭-৪৮)।

[৩০] গোলাম হোসাইন সলীম, পৃ. ২৭৯-২৮০।

[৩১] নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* (ঢাকা: প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ, ২০১০), পৃ. ৮৭।

[৩২] তদেব, পৃ. ৮৮।

[৩৩] ইউসুফ আলী খান, পৃ. ১১৬।

মটানোর চেষ্টা করেন এবং এজন্য জগৎশেঠ ও ঘসেটি বেগমকে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করতে নুরোধ করেন। এমনকি মীর জাফর তাঁর কথা না শুনলেও পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে সিরাজের পক্ষ থকে মীর জাফরের নিকট পূর্ববর্তী অসদাচরণের জন্য শরফুন্নেসা কর্তৃক ক্ষমা চাওয়া ও তোষামোদের টনা তাঁর কৌশলী চিন্তার পরিচয় দেয়।[৩৪]

শরফুন্নেসা এতটাই কৌশলী ছিলেন যে, হোসেন কুলি নামক প্রভাবশালী অমাত্যের সাথে ঘসেটি বগম ও নবাব সিরাজের মা আমেনা বেগমের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠার বিষয়টি জানতে পেরে রিবারের সম্মান যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং এ থেকে পরিবারের সম্মান রক্ষার ন্য হোসেন কুলিকে দমনের মনস্থ করেন। একই সাথে হোসেন কুলি ঘসেটি বেগম ও আমেনার সাথে ম্পর্কের সুযোগে দরবারে সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে থাকায় শরফুন্নেসা তা নবাব সিরাজের জন্য পদজনক মনে করেন। এজন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন হোসেন কুলিকে হত্যা করেন তখন তিনি ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৩৫] শরফুন্নেসা পরিবার ও রাজনীতিতে দারতার সাথে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শাসনকার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তিনি একই রকম ছিলেন লে জানা যায়। একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, নবাব আলীবর্দীর মৃত্যুর পর নবাব সিরাজ যখন লকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করে কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী ও নারীদের বন্দি করে র্শিদাবাদে নিয়ে আসেন তখন তিনি সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বন্দিদের ক্তিদানের জন্য নবাব সিরাজকে অনুরোধ করেন এবং নবাব সিরাজ তাঁর অনুরোধে বন্দিদের মুক্তি দন।[৩৬] এর মাধ্যমে একদিকে প্রাসাদের রাজনীতি ও সমকালীন প্রশাসনে যেমন তাঁর প্রভাব লক্ষ করা য় তেমনিভাবে তাঁর উদারতাও ফুটে ওঠে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ, রাজনৈতিক প্রয়োজনে পছন্দের ব্যক্তিকে চাকরি প্রদান, মীর াফরের কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রভৃতি কাজ যেমন শরফুন্নেসা বেগমের কৌশলী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন রে তেমনি, গদিনশীন বেগম পদাধিকার তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তির পরিস্ফুটন ঘটায়। আবার াজনৈতিক প্রয়োজন ছাড়াও একজন উদ্যেমী ও সাহসী নারী হিসেবে স্বামীকে সঙ্গ ও অনুপ্রেরণা দওয়ার জন্য আলীবর্দীর সাথে তিনি সুন্দরবনে শিকার ও প্রমোদভ্রমণে যেতেন। এছাড়া শরফুন্নেসা বগম অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করলেও জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগমের মতিঝিলের প্রাসাদে ায়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন: নওরোজ উৎসব, হোলি, জন্মদিন, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ রতেন এবং এ থেকে তাঁর নানা সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রমাণও পাওয়া যায়। তাই শরফুন্নেসার জ্ঞা, কর্মনিষ্ঠা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, মহানুভবতা, বদান্যতা ও অমায়িক ব্যবহারের বিরল ংমিশ্রণ লক্ষ করে এম. এ. রহিম যথার্থই তাঁকে স্ত্রী জাতির মধ্যে উচ্চস্থান ও সম্মানধারীদের মধ্যে কজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩৭]

রদানা বেগম

বাবি বাংলার তেজস্বিনী ও প্রভাবশালী নারীদের মধ্যে দুরদানা বেগম ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন কাধারে নবাব মুর্শিদকুলি খানের নাতনি, নবাব সুজাউদ্দিনের কন্যা ও নবাব সরফরাজখানের বোন।

---

[৩৪] গোলাম হোসাইন সলীম, পৃ. ২৮৪ ও ২৮৯।

[৩৫] শ্রী নিখিলনাথ রায়, পৃ. ১২৫।

[৩৬] এস এম আলী রেজা, পৃ. ৪৪।

[৩৭] এম.এ. রহিম, পৃ. ১৮৬।

তিনি সুরাটের এক বণিকপুত্র মির্জা লুৎফুল্লাহ (ইতিহাসে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান নামে পরিচিত ছিলেন)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানকে ঢাকার নায়েবে নাজিম হিসেবে নিয়োগদান করা হলে স্বামীর সাথে কিছুদিন ঢাকায় অবস্থান করেন। বাংলায় তিনি তাঁর স্বামী অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।[৩৮] আলীবর্দী খান যখন নবাব সরফরাজ খানকে পরাজিত ও হত্যা করেন তখন একজন দূরদর্শী নারী হিসেবে তিনি শোকে মুহ্যমান না হয়ে বরং এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য স্বামী মুর্শিদকুলিকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। তিনি স্বামীকে রাজি করার জন্য বলেন যে, যদি তিনি নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি তাঁর মতো একজন ভীরু স্বামীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবেন এবং সমুদয় ধন সম্পদ তাঁর জামাতা উড়িষ্যা প্রদেশের মির্জা বাকির খানকে প্রদান করবেন। এখানে দেখা যায় যে, ভাই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য স্বামীকে স্বাভাবিকভাবে রাজি করাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি কৌশলে স্বামীকে এটি করতে বাধ্য করেন। মূলত স্বামীকে স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের নিকট হার মানতে হয়েছিলো। এরই ফলস্বরূপ ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে আলীবর্দী খান ও দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের সাথে উড়িষ্যায় একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তবে আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানকে প্ররোচিত করার পেছনে দুরদানা বেগমের ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্য ছিল বলে ধারণা করা হয়। বস্তুত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে বিজয়ী হলে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত তালুকই রক্ষা হবে না, নিহত ভাই সরফরাজের রেখে যাওয়া সম্পত্তিরও তিনি ভাগিদার হবেন।[৩৯] এ যুদ্ধে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান পরাজিত হলে দুরদানা বেগমের বিচক্ষণতা ও পরামর্শে তাঁরা জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক রাতিপুরের রাজা হাফিজ কাদিরের সহায়তায় হায়দ্রাবাদের নিজামের কাছে আশ্রয় নেন,[৪০] এবং হায়দ্রাবাদের অধিপতি আসাফ খাঁ দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানও দুরদানা বেগমকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজ মহলে অতিথি হিসেবে আশ্রয় দেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।[৪১] নিজ কর্মতৎপরতা দ্বারা দুরদানা বেগম দাক্ষিণাত্যে এতটাই পরিচিতি পেয়েছিলেন যে, সেখানে তাঁকে 'বাঙালি বেগম' নামে ডাকা হতো।[৪২] এছাড়া তিনি 'মেহমান বেগম' নামক সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।[৪৩] সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন-এর বর্ণনায় জানা যায় যে, দুরদানা বেগম সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং উর্দু ও ফার্সি সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিলো।

শাহ খানম

নবাবি বাংলার নারীদের মধ্যে শাহ খানম অন্যতম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও রাজকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নারী ছিলেন। তিনি নবাব আলীবর্দী খানের বোন এবং মীরজাফরের প্রথম স্ত্রী ছিলেন। আলীবর্দী তাঁর বোন

---

[৩৮] এস এম আলী রেজা, পৃ. ৪৪।

[৩৯] মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, *নবাবী বাংলার রাজনীতি ও অভিজাত শ্রেণী: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস (ঢাকা: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩), পৃ. ২২০।

[৪০] গোলাম হোসাইন সলীম, পৃ. ২৬১; Nawab Nusrat Jang, *op.cit.* p. 14; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, পৃ. ৯৪।

[৪১] Azad-al Husaini, "Nau-Bahar-i-Murshid Quli Khani" in *Bengal Nawabs*, Translated into English by, Jadunath Sarkar (Kolkata: The Asiatic Society, First published 1952, Third reprint March 2008), p. 8.

[৪২] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, পৃ. ৯০।

[৪৩] আজাদ-আল-হোসাইনি, *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলি খানি*, অনুবাদ, সম্পাদনা ও টীকা, আবুল কালাম যাকারিয়া (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃ. ১৩২।

শাহ খানমকে খুব স্নেহ করতেন। দরবারি রাজনীতিতে মীরজাফরের গৌরব বৃদ্ধির মূল কারণ ছিলো শাহ খানমের সাথে তাঁর বিয়ে। শাহ খানমের স্বামী হবার কারণে মীরজাফরকে নবাব পরিবার ও সকল শ্রেণীর মানুষ আলাদা চোখে দেখতেন। অত্যন্ত ধার্মিক নারী হওয়ায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিলো না। শাহ খানম অত্যন্ত উদার ও দয়ালু মানুষ ছিলেন। দাস-দাসীসহ সকল মানুষের সাথে তাঁর আচরণ ছিলো খুবই মধুর। একজন উদার ও সংস্কৃতিমনা নারী হিসেবে তিনি একটি বাগান পরিচর্যা করতেন এবং তাঁর এ বাগানে নানা জাতের উন্নত ধরনের ফুল ও ফলের চাষ করা হতো। অন্যদিকে তিনি মুরগি, কাকাতুয়া, টিয়া, পায়রা ও ময়ূর পালন করতেন বলে জানা যায়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পুত্র মিরনের মৃত্যুর পর তিনি এত মর্মাহত হন যে, সকল ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন শুধু মীরনের পুত্র ও পরিবারের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখেন। এ বছরই মীরজাফর মসনদচ্যুত হয়ে কলকাতায় যাবার সময়ে বেগমকে সাথে নিতে চান কিন্তু তিনি রাজি হননি। মীরজাফরের আরেক স্ত্রী মুনি বেগম নবাবের সাথে যান এবং তখন থেকে পরিবার ও রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্ব অনেকটা কমে আসে। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শাহ খানম মুর্শিদাবাদেই থাকেন এবং তাঁকে তাঁর শখের বাগানেই সমাহিত করা হয়েছিলো।

মেহরুন্নেসা (ঘসেটি বেগম)

নবাব আলীবর্দী খানের কন্যা মেহরুন্নেসা 'ঘসেটি বেগম' নামে পরিচিত ছিলেন। নবাবি বাংলার প্রসাদ রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তিনি ছিলেন একজন বিশেষ প্রভাববিস্তারকারী নারী। নবাব পরিবার, সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ও মর্যাদা ছিলো। শুধু নবাবের জ্যেষ্ঠ কন্যা হিসেবেই নয়, তিনি ছিলেন রাজনৈতিকভাবে দূরদর্শী, কূটকৌশলী ও বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। নবাব আলীবর্দী খান তাঁকে নিজের বড়ো ভাই হাজী আহমদের বড়ো ছেলে, সুবে বাংলার দিওয়ান নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পর বিভিন্নভাবে তাঁর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বেড়ে যায়। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনামতে, আফগানরা যখন আলীবর্দীর জামাতা জনুদ্দিন, ভাই হাজী আহমদ ও তাঁদের পরিবারের অনেককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে আমিনা বেগমসহ পরিবারের সদস্যদের বন্দি করে তখন এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি ও আফগানদের শায়েস্তা করার জন্য ঘসেটি বেগম ও তাঁর স্বামী নওয়াজিশ নবাব আলীবর্দী খানকে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ দিয়ে সহায়তা করেন এবং অনুপ্রেরণা যোগান।[৪৪] বাংলার মসনদের প্রতি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সীমাহীন লোভ ছিলো। ঘসেটি বেগম ও তার স্বামী নওয়াজিশ উভয়েই বাংলার মসনদের অধিকারী হওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। তবে, নবাব আলীবর্দী খানের জীবদ্দশাতেই ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান মৃত্যুবরণ করলে তিনি আরো স্বাধীনভাবে কাজ করতে থাকেন। নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর নবাব আলীবর্দী খান ঘসেটি বেগমকে সুবা বাংলার দিওয়ান হিসেবে নিয়োগদান করলে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে দিওয়ানির দায়িত্ব পালন করেন।[৪৫] তবে নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর নবাব আলীবর্দী খান ঘসেটি বেগমকে জাহাঙ্গীর নগরের দায়িত্ব প্রদান করলেও ঘসেটি বেগম সেখানে বসবাস না করায় সেখানকার নায়েবে দিওয়ান রাজবল্লভ বাংলায়

---

[৪৪] কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস; নবাবী আমল* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউজ, এপ্রিল ২০০৩), পৃ. ১১০।

[৪৫] এম.এ. রহিম, পৃ. ১৮৭।

একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৪৬] তবে ঘসেটি বেগম এতটাই কূটকৌশলী ছিলেন যে, বাংলার মসনদকে কুক্ষিগত করার জন্য তিনি তাঁর পালকপুত্র ও সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইকরাম-উদ-দৌলাহ্‌কে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে নিজে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত হতে চেয়েছিলেন।[৪৭] পরবর্তীতে ইকরাম-উদ-দৌলাহ্ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেলে তিনি তাঁর আরেক বোনের পুত্র শওকত জঙ্গকে সিংহাসনে বসানোর ইচ্ছা পোষণ করেন এবং এক্ষেত্রে মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভসহ অন্যান্য অভিজাতবর্গ তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি শুধু শওকত জঙ্গকেই সিংহাসনে বসাতে চাননি, সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার রাজনীতি থেকে চিরতরে উৎখাতও করতে চেয়েছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসনভার গ্রহণের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন ব্যাপারে ঘসেটি বেগমের সাথে তাঁর সংঘাত চলতে থাকে। সিরাজ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম রাজবল্লভকে আটক করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। এ সময়ে ঘসেটির তৎপরতায় রাজবল্লভ মুক্তি পান। এতে সিরাজ ঘসেটির উপর অনেক রুষ্ট হন। আবার হোসেন কুলি খান নামক এক ব্যক্তির সাথে ঘসেটি বেগমের বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠলে এক পর্যায়ে সিরাজের নির্দেশে ঐ ব্যক্তিকে মেরে ফেলা হয়। এতে ঘসেটি বেগম সিরাজের প্রতি চরম ক্ষুব্ধ হন এবং নবাবের বিরুদ্ধে আরও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।[৪৮] দেশীয় ও বিদেশী (বিশেষত ইংরেজ) স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সাথে আঁতাত করে তিনি তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঘসেটি অনেক অর্থ-সম্পদের মালিক ছিলেন। এ অর্থের একটা বড়ো অংশ তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন। ইউসুফ আলী খানের মতে, মীর নজর আলী, মীর কুদরত উল্লাহ, মীর শফিউদ্দিন ও মীর গোলাম আলী প্রমুখ সামরিক অভিজাতগণ ঘসেটি বেগমের বদান্যতায় ব্যাপক অর্থের মালিক হয়েছিলেন।[৪৯] যদুনাথ সরকারের মতে, ক্ষমতায় বসার পর সিরাজের প্রধান লক্ষ্য ছিল ঘসেটি বেগমকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে ফেলা; কেননা অর্থই ছিল তাঁর ক্ষমতার মূল শক্তি।[৫০] এজন্য ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে নবাব ঘসেটি বেগমের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাঁকে বন্দি করার নির্দেশ দেন।[৫১] সিরাজের সৈন্যরা ঘসেটি বেগমকে বন্দি করে মুর্শিদাবাদে আনলে নবাব তাঁকে নিজ প্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং মাতা আমেনা বেগমের তত্ত্বাবধানে রাখেন যাতে তিনি কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র করতে না পারেন। কিন্তু এখানে এসেও তিনি চুপ করে থাকেননি। জানা যায় যে, তিনি এখান থেকে মীর জাফর আলী খানের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং অর্থ ও পরামর্শ পাঠিয়ে সিরাজকে উৎখাত করার জন্য উৎসাহ দিতেন। ঘসেটি বেগমের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কারণেই বাংলার প্রভাবশালী এই বিশেষ গোষ্ঠী ও ইংরেজ কোম্পানি উভয়ের সাথে তিনি কৌশলী ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরই ফলস্বরূপ সিরাজ বিরোধী এই ষড়যন্ত্র পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতন পর্যন্ত চলতে থাকে এবং ইংরেজদের হাতে নবাবের পতন ঘটে, যার মূলে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন ঘসেটি বেগম।

---

[৪৬] হাবিবুর রহমান, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ১৫৬।

[৪৭] মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, পৃ. ২৩৩।

[৪৮] শ্রী নিখিলনাথ রায়, পৃ. ১২৫।

[৪৯] ইউসুফ আলী খান, পৃ. ১৮৪।

[৫০] Jadunath Sarkar, "Siraj-ud-daulah," in *History of Bengal (Muslim Period),* Vol.II, Edited by, Jadunath Sarkar (Dhaka: The University of Dhaka, October 2006), p. 470.

[৫১] Nusrat Jang, p. 19; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, পৃ. ৪৩৩।

ঘসেটি বেগম সারা জীবন আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করেছেন। বিয়ের পর থেকে তিনি স্বামীর সাথে ঢাকায় বসবাস করতেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদের মতিঝিলে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করে সেখানে বসবাস শুরু করেন। তাঁর প্রাসাদে কয়েক দিন ব্যাপী বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। এসব জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো নওরোজ উৎসব, ঈদ-ই-মিলাদ-উন-নবী, বিবাহ বার্ষিকী পালন প্রভৃতি। জানা যায় যে, এ সকল অনুষ্ঠানের সময়ে প্রাসাদ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হতো এবং দামি দামি আতসবাজি পোড়ানো হতো। মতিঝিল প্রাসাদের নিকটে তিনি একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘষেটির ষড়যন্ত্র আমাদের ব্যথিত করলেও অনুষ্ঠান পালন, মায়ের সাথে থাকা, মসজিদ নির্মাণ প্রভৃতি কাজ তাঁর উদার মনের পরিচয়ও বহন করে।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নবাবি বাংলার প্রসাদ রাজনীতিতে কৌশলী ও দূরদর্শিতার কারণে ঘসেটি বেগম একদিকে অগাধ ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন, অন্যদিকে নারী হয়েও প্রভাবশালী ইংরেজ ও দেশীয় অভিজাতদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত এমনকি অনেকক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্ত তাঁদের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমেনা বেগম

নবাব আলীবর্দী খানের তৃতীয় কন্যা ও সিরাজউদ্দৌলার মাতা আমেনা বেগম নবাবি বাংলার ইতিহাসে একজন বিশেষ পরিচিত মুখ। এম এ রহিমের মতে, আমেনা বেগম তাঁর সুরুচি ও শিষ্টাচারের গুণে সে যুগের সমাজজীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছেন।[৫২] আলীবর্দীর বড়ো ভাই হাজী আহমদের ছোটো ছেলে জৈনুদ্দিন আহমেদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। আলীবর্দী খান যখন বাংলার সুবাদারি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তখন তিনি জামাতা জৈনুদ্দিনকে বিহারের নায়েবে নাজিম পদে নিয়োগ দেন। আমেনা স্বামীর সাথে বিহারেই থাকতেন এবং আমেনার তিন পুত্রের মধ্যে সিরাজকেই তাঁর বাবা নিজের সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে মনে করতেন। কেননা সিরাজের জন্মের পরে তাঁর চাকুরিতে পদোন্নতি হয় অর্থাৎ তিনি রাজমহলের ফৌজদারের পদ লাভ করেন।[৫৩] আলীবর্দী তাঁকে শুধু লালন-পালনই করেননি পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবেও মনোনীত করেন। নবাবের মাতা হিসেবেও আমেনা বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। দরবার থেকে তিনি ঝালরযুক্ত পালকি, পতাকা, দামাদা ও অন্যান্য সম্মানসূচক দ্রব্যাদি লাভ করেন।[৫৪]

আমেনা বেগম প্রজ্ঞানিষ্ঠ ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের ছিলেন। সর্বাবস্থায় তিনি স্বামী জৈনুদ্দিনকে পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন। জৈনুদ্দিনকে আলীবর্দী বিহারের নায়েব নিযুক্ত করলেও তিনি এ পদ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং এজন্য তিনি আলীবর্দীকে বাংলার মসনদ থেকে উৎখাত করার জন্য আফগানদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি বাবা ও স্বামী উভয়ের সাথেই ভালো সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জৈনুদ্দিনের ষড়যন্ত্র সফল হবার আগেই ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে শেরখান নামক

---

[৫২] এম.এ. রহিম, পৃ. ১৮৮।

[৫৩] Karam Ali Khan, "Muzaffar-Namah" in *Bengal Nawabs*, Translated into English by, Jadunath Sarkar (Kolkata: The Asiatic Society, First published 1952, Third reprint March 2008), p. 13; The Begums of Bengal, p. 25.

[৫৪] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, পৃ. ১১।

এক আফগানের হাতে তিনি নিহত হন এবং রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বন্দি করা হয়। এমতাবস্থায় আলীবর্দী সসৈন্যে পাটনায় গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেন।

আমেনা বেগম অনেক দূরদর্শী নারী ছিলেন। স্বামীকে তিনি যেমন বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন তেমনি সিরাজকেও বারবার ইংরেজদের সাথে বিবাদ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিতেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন অনাথ ও দুঃখীদের জন্য বড়ো আশ্রয়স্থল। সমস্যাগ্রস্থ অনেক ব্যক্তি তাঁর কাছে আশ্রয় পেতেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিরাজের স্ত্রী লুৎফুন্নেসা। তিনি ছোটবেলায় ক্রীতদাসী হয়ে বেগমের নিকট আশ্রয় লাভ করেন। বেগম তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করেন এবং পরবর্তীতে সিরাজের সাথে বিয়ে দেন।[৫৫] এরূপ অসহায়কে সাহায্য করে উন্নত জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমেনা বেগমের নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল। তিনি মুহম্মদী বেগ (সিরাজের হত্যা কার্যকরকারী) নামক এক গরিব বালককে লালনপালন করে পরবর্তীতে বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এভাবে শুধু পরোপকার নয় তিনি মানুষের অপরাধও ক্ষমা করে দিতেন এবং সিরাজকেও নানা সময়ে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দিতে আদেশ ও পরামর্শ দিতেন। এর অন্যতম উদাহরণ হলো: আলীবর্দী খান পীড়িত থাকাবস্থায় সিরাজ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশুনা করতেন। এ সময়ে তিনি রাজস্বের হিসাবে বহু অনিয়ম দেখতে পান। এঁদের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগরে ঘসেটি বেগমের দিওয়ান রাজবল্লভ বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করে হিসাব দিতে পারেননি ফলে রাজবল্লভকে আটক করে মুর্শিদাবাদে এনে কঠোর পাহারায় রাখা হয়। এক পর্যায়ে আমেনা বেগমের আদেশে সিরাজ তাঁকে মুক্তি দেন। এভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি পরামর্শ প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে হস্তক্ষেপ করতেন। আমেনা বেগম অনেক সম্মানের সাথে জীবন অতিবাহিত করলেও তাঁর শেষ জীবন ছিলো দুঃখময়। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বামীকে হারান, ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পুত্র একরামউদ্দৌলা মারা যায় এবং ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সবশেষে জ্যেষ্ঠপুত্র সিরাজ নিহত হলে রাজপরিবারে অন্ধকার নেমে আসে। সিরাজের মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি দিশেহারা হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং পুত্র শোকে অধীর হয়ে বুক চাপড়াতে থাকেন। নবাব সিরাজের মৃত্যুর পর মীর জাফরের পুত্র মিরণের নির্দেশে ঘসেটি বেগম ও সিরাজের মা আমেনা বেগমকে নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়।[৫৬] রাজনৈতিকভাবে সচতেনতার পাশাপাশি আমেনা বেগমের উদার মানবিক দিকগুলো আমাদের হৃদয়কে বেশি স্পর্শ করে।

লুৎফুন্নেসা বেগম

নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রিয় স্ত্রী ছিলেন লুৎফুন্নেসা। তাঁর বাল্যনাম *রাজকুঁয়া*। তিনি খুব সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ছোটবেলায় ক্রীতদাসীরূপে আলীবর্দীর সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন গ্রন্থে তাঁকে সিরাজের '*জারিয়া*' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৭] তাঁর মাতা শরফুন্নেসা বেগমের মহলের খাস পরিচারিকা ছিলেন। তাঁর ভাই মোহনলাল মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নবাব সিরাজের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। রাজকুয়াঁ মায়ের সাথে মহলে থাকতেন এবং ধীরে ধীরে সেখানে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। এর পিছনে অন্যতম কারণ হলো তাঁর বুদ্ধি ও অপার সৌন্দর্য। প্রথমদিকে

---

[৫৫] Karam Ali Khan, p. 31.

[৫৬] শ্রী নিখিলনাথ রায়, পৃ. ৯২।

[৫৭] 'জারিয়া' বলতে ক্রীতদাসী বুঝায় তবে তাঁরা অত্যন্ত নিচুভাবে দাসী নয়। তাঁরা যে সংসারে থাকে সেখানে কেউ ইচ্ছা করলে তাদের বিয়ে করতে পারে। যেমন রাজকুয়াঁরকে সিরাজ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

তনি আমেনা বেগমের প্রধান পরিচারিকা হন এবং পরবর্তীতে সিরাজের বেগম হবার সৌভাগ্য লাভ রেন। সিরাজ-ই তাঁর নতুন নাম দেন 'লুৎফুন্নেসা'।[৫৮] অতি সামান্য অবস্থা থেকে তিনি বিশেষ র্যাদার অধিকারী হতে পেরেছিলেন। লুৎফুন্নেসা ও তাঁর ভাই মোহনলাল প্রাসাদ ও দরবারে বিশেষ ভাব বিস্তার করতেন। তাঁরা সিরাজের রাজনৈতিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতেন। রায়দুর্লভকে সরিয়ে মোহনলালকে সিরাজের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগদানের মধ্য দিয়ে দরবারের রাজনীতিতে লুৎফুন্নেছার প্রভাব ক্ষ করা যায়।[৫৯] অবার আমরা দেখি যে, লুৎফুন্নেসা ও মোহনলালকে কেন্দ্র করে পলাশীর যুদ্ধের ময়েও বাংলার রাজনীতি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। লুৎফুন্নেছার কারণেই সিরাজের প্রথম স্ত্রী ইরাজ ানের কন্যা উদাতুন্নেসার সাথে সিরাজের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। এর রেশ ধরে পলাশীর যুদ্ধে রাজ খান সিরাজের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তবে নানা সমস্যা সৃষ্টি হলেও নবাব সিরাজ তাঁকে ত্যধিক পছন্দ করতেন এবং সর্বাবস্থায় লুৎফুন্নেসাকে সাথে রাখতেন। পাটনা অধিকারের সময়ে মনকি পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সিরাজ যখন রাজমহলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখনও লুৎফা িরাজের সাথে ছিলেন, অর্থাৎ সিরাজের মৃত্যু পর্যন্ত এ মহিয়সী নারী তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি শুধু বাবের পাশেই থাকেননি প্রয়োজনে তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সাহায্য করেছেন। যেমন ইংরেজ কাম্পানির মি. ওয়াটসকে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিতে তিনি নবাবকে রাজি করিয়েছিলেন।

লুৎফুন্নেছা এতটাই দৃঢ়চেতা ছিলেন যে, নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর মীরজাফরের পুত্র মিরণ াঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। নবাব সিরাজের মৃত্যুর পর ইংরেজগণ তাঁকে র্শিদাবাদের খোসবাগে হাজী আহম্মদ, নবাব আলীবর্দী ও সিরাজের সমাধির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন বং এজন্য তাঁকে মাসিক তিনশ পাঁচ টাকা ভাতা প্রদান করা হতো। এছাড়া পরিবার পরিচালনার জন্য তিনি আরও একশত টাকা বৃত্তি পেতেন। এত অল্প পরিমাণ টাকা দিয়ে তিনি অতি কষ্টে জীবন তিবাহিত করতেন এবং এ টাকার কিছু অংশ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন; যার একটি অংশ দিয়ে তিনি একটি লঙ্গরখানা ও একজন কোরআন পাঠকের ব্যয়ভার বহন করতেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ুৎফুন্নেসার মৃত্যু হয় এবং তাঁকে খোসবাগে সিরাজের সমাধির পাশেই সমাহিত করা হয়।

নি বেগম

বাবি বাংলার ইতিহাসে মুনি বেগম[৬০] একজন বিশেষ খ্যাতনামা নারী। তিনি মীরজাফরের প্রিয়তমা বেগম ছিলেন। সেকেন্দ্রার নিকট বালকুণ্ডা নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। দরিদ্রতার কারণে তাঁর মা তাঁকে বিশু নামক এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেন। বিশু দিল্লীতে নর্তকীর দলে রেখে তাঁকে নাচ শেখান এবং এ ্যবসায় যুক্ত করেন। একরামউদ্দৌলার বিয়ে উপলক্ষে বিশু ও তাঁর নর্তকী দল মুর্শিদাবাদ আসেন। এ ময়ে মীরজাফরের সাথে মুনির প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরে তাঁদের বিয়ে হয়। তাঁর গর্ভে ীরজাফরের দুই সন্তান নজমউদ্দৌলা ও সৈফউদ্দৌলা জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চাভিলাষী হলেও মুনি বেগম ুব কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমতী ও দৃঢ় চরিত্রের নারী ছিলেন। সামান্য নর্তকী থেকে তিনি মীরজাফরের হারেমে

---

[৫৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বেগমস অব বেঙ্গল*, বাংলা অনুবাদ, এম. এ. কাসেম ও সুভাষ চন্দ্র রায় ঢাকা, ১৯৯৬), পৃ. ২৫।

[৫৯] এস এম আলী রেজা, পৃ. ৫০।

[৬০] কোনো কোনো বর্ণনাকার তাঁকে মণিবেগম (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৯৭-৩০০), মুন্নি বেগম নিখিলনাথ রায়) বলে উল্লেখ করেছেন।

স্থান লাভ করেন এবং পরে নাবালক নবাবের অভিভাবকের মর্যাদাজনক পদও দখল করেন। মুনি বেগম খুব কৌশলী নারী ছিলেন। তিনি মীরজাফরের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতেন। মীরজাফরের প্রথম স্ত্রী ছিলেন নবাব আলীবর্দীর বৈমাত্রেয় বোন শাহ খানম। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের পর নবাবের ওপর মুনি বেগমের প্রভাব প্রথম স্ত্রীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।[৬১] মীরজাফর নবাব হবার পর সিরাজউদ্দৌলার হিরাঝিলের প্রাসাদ থেকে যে সকল হীরা জহরত পেয়েছিলেন তার সব কিছুই মুনি বেগম নিজে অধিকার করেন।[৬২] এভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন।

মীরজাফর ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মসনদচ্যুত হলে ইংরেজরা তাঁকে মুনি বেগমসহ কলকাতায় নিয়ে যান। কলকাতায় তিনি মীরজাফরের ঘনিষ্ঠ সহচররূপে সকল রাজনৈতিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এসময়ে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। কোম্পানির সাথে তাঁর এই ঘনিষ্ঠ ও কৌশলী সম্পর্ক মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলো। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফর পুনরায় বাংলার মসনদ লাভ করলে মুনি বেগম এতটাই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মীরজাফরের কাছ থেকে অত্যন্ত কৌশলে পুত্র নজমউদ্দৌলার জন্য নবাবি মসনদের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন। মীর জাফরের মৃত্যুর পর মুনি বেগম আরও বেশি ক্ষমতার মালিক হয়েছিলেন। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অনেক ধন-সম্পদ প্রদান করে হাতের মুঠোয় এনেছিলেন এবং তাঁদের সাহায্যে নিজ পুত্রকে বাংলার মসনদে বসাতে সক্ষম হয়েছিলেন। মীরজাফর জীবিত থাকতেই তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মিরনের মৃত্যু হয়েছিলো। মিরনের পুত্ররা ভাই মর্তুজাকে মসনদে বসাতে চেয়েছিলো কিন্তু কলকাতা কাউন্সিলের সভ্যরা তাঁদের আবেদন না শুনে মুনি বেগমের চাহিদা মতো নজমউদ্দৌলাকেই মসনদ প্রদান করেন।[৬৩] নজমউদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসানোর পর মুনি বেগম বাংলার সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তিনি কোম্পানির আমলাদের সাথে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন যে, তারা তাঁকে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জননী' বলে আখ্যা দেয়।[৬৪] তিনি ছোটো বড়ো অনেক অফিসারকে উৎকোচ প্রদান করে বশীভূত করেন। এমনকি রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসকে হাতির দাঁতের অপরূপ কারুকার্য খচিত মূল্যবান সোফাসেট ও অলংকারাদি উপহার দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। শুধু উপহার নয় কর্তাব্যক্তিদের তিনি বিভিন্ন কাজে সাহায্যও করতেন। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মে নজমউদ্দৌলা মৃত্যুবরণ করলে মুনি বেগম তাঁর অন্য পুত্র সৈফউদ্দৌলাকে মসনদে বসাতে সক্ষম হন। নাবালক পুত্রের কারণে এ সময়েও সকল ক্ষমতা তিনি নিজ হাতেই রাখেন। মীরজাফরের অন্য স্ত্রীদের চেয়ে মুনি বেগম বেশি প্রভাবশালী ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে নজমউদ্দৌলার সাথে কোম্পানির চুক্তি হয়। এতে মীরজাফরের সমমর্যাদাসম্পন্ন দুই স্ত্রী বব্বু বেগম ও মুনি বেগম যথাক্রমে আট হাজার ও বারো হাজার টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। সমমর্যাদাসম্পন্ন হলেও মুনি বেগমই বেশি টাকার সম্মানী পেয়েছিলেন। আবার ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফরের আরেক স্ত্রী বব্বু বেগমের পুত্র মোবারকউদ্দৌলা নিজামত প্রাপ্ত হন। মোবারক নাবালক হওয়ার কারণে অভিভাবকের দায়িত্ব পেতে মাতা বব্বু বেগম ও বিমাতা মুনি বেগম উভয়েই আবেদন করেন। হেস্টিংসের সাথে সুসম্পর্কের ফলে বিমাতা হয়েও মুনি বেগমই দায়িত্ব পান।[৬৫] এর মাধ্যমে কোম্পানির উপর তাঁর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

---

[৬১] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪১।
[৬২] কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩০০।
[৬৩] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪১।
[৬৪] মুন্‌শী রহমান আলী তায়েশ, পৃ. ৭৫।
[৬৫] নিখিলনাথ রায়, পৃ. ২৫৪।

মুনি বেগম খুবই দূরদর্শী ও ক্ষমতাধর নারী ছিলেন। নবাব আলীবর্দীর স্ত্রী শরফুন্নেসার পর তিনিই কমাত্র বেগম যিনি 'গদিনসিন বেগম' পদটি লাভ করেছিলেন।[৬৬] প্রতাপের সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগ করলেও তিনি জনকল্যাণমূলক কাজ করতেন। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুর্শিদকুলি নির্মিত দরবার হেল সেতুনের ভগ্নাবশেষের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা চক মসজিদ নামে খ্যাত। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ৯৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর কোষাগারে প্রাপ্ত কয়েক লক্ষ নগদ দ্রা, বহুল পরিমাণ অলঙ্কারাদি ও মাসিক বৃত্তির বিপুল অর্থ দিয়ে মুনি বেগম ফান্ড গঠিত হয়। এই াণ্ডের টাকা নবাব পরিবারের বিভিন্ন কাজে ও জনকল্যাণে ব্যয় করা হতো। বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা ও রদর্শিতা দ্বারা ইংরেজদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে মুনি বেগম নবাবি বাংলার প্রাসাদ রাজনীতিকে র্ঘ সময় ধরে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

ব্বু বেগম

বাব মীরজাফরের তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন বব্বু বেগম। তাঁর পিতার নাম আম্মান আলী। তিনি দিল্লির খ্যাত একটি নাচ-গান পার্টির প্রধান ছিলেন। একরামউদ্দৌলার বিয়ে উপলক্ষে তাঁরা মুর্শিদাবাদে াসেন। পরে মীরজাফর তাঁর রূপে মোহিত হয়ে বব্বুকে নিজের তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। বাবের উপর তাঁর বিশেষ কোনো প্রভাব ছিলো না। তিনি সহজ সরল মানুষ ছিলেন। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে াঁর ১২ বছর বয়সী নাবালক পুত্র মোবারকউদ্দৌলা বাংলার নিজামতের দায়িত্ব পেলেও মা হিসেবে ভিভাবকের দায়িত্ব তিনি পাননি।[৬৭] বিমাতা মুনি বেগমের কোম্পানির ওপর এত প্রভাব ছিলো যে, তিনিই এ দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি বেশি কৌশলী ছিলেন না বলে সমমর্যাদাসম্পন্ন হয়েও মাসিক আট াজার টাকা বৃত্তি পেতেন যা মুনি বেগমের চেয়ে কম। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে বব্বু বেগমের মৃত্যু হলে তাঁকে াফরগঞ্জে সমাহিত করা হয়।

উপসংহার

বাবি বাংলার প্রাসাদ রাজনীতিতে সমকালীন সাধারণ নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য াওয়া না গেলেও নবাবি মহলের নারীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে দেখা যায় যে, প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও মহলের নারীরা সমকালীন রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন এমনকি প্রাসাদ রাজনীতিতেও যুক্ত হয়েছেন। আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করি যে, মুসলিম সামাজিক ও ধর্মীয় বেড়াজালকে ছিন্ন করে নওসেরি বানু বেগম, জিন্নাতুন্নেসা বেগম, নাফিসা বেগম, শরফুন্নেসা বেগম, দুরদানা বেগম, ঘসেটি বেগম ও আমেনা বেগম প্রমুখ কিভাবে নবাবকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করতেন। এমনকি নবাব আলীবর্দী খানের স্ত্রী শরফুন্নেসা বেগম কর্তৃক মারাঠাদের সাথে সন্ধি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার ঘটনা এবং গদিনসিন বেগমের পদলাভ আমাদের তৎকালীন নবাবি মহলের কতিপয় বিশিষ্ট নারীর চৌকস রাজনৈতিক জ্ঞান ও প্রভাবের বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

---

[৬৬] তদেব, পৃ. ১৫৮।

[৬৭] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৪।

এছাড়া স্বজন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্দীপ্তকরণ, যুদ্ধে নবাবের পাশে থাকা এমনকি আর্থিকভাবে সহায়তা দান করার বিষয়গুলোও নবাবি বাংলার অভিজাত নারীদের স্বাতন্ত্রিক অবস্থানকে উচ্চে তুলে ধরে। অন্যদিকে, ঘসেটি বেগমের চৌকস রাজনৈতিক কার্যাবলি দীর্ঘসময় ধরে তাঁকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেয় যা নিঃসন্দেহে নবাবি বাংলার রাজনীতিতে নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতির প্রমাণ দেয়। আবার নিজ যোগ্যতা বলে মুনি বেগম কর্তৃক গদিনসিন বেগমের মর্যাদা লাভ এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মাতা উপাধি লাভ নবাবি বাংলার নারীদের বিশেষ যোগ্যতার-ই প্রমাণ বহন করে। আবার কখনও কখনও তাঁরা নবাবের মানসিক শক্তির উৎস হিসেবেও কাজ করেছেন যা আমরা জিন্নাতুন্নেসা বেগম, শরফুন্নেসা বেগম, দুরদানা বেগমের কর্মপন্থা থেকে নিশ্চিত হতে পারি। অপরদিকে একজন সাধারণ নারী হয়েও নিজ যোগ্যতা ও কর্মের দ্বারা নবাবি মহলে স্থান করে নিয়ে নবাবের কর্মপন্থা এবং সমকালীন সমাজ ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে লুৎফুন্নেছা বেগম, মুনি বেগম ও বব্বু বেগমগণ বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

ছয় দফা প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানীর দৃষ্টিভঙ্গি

সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী*

Abstract: Moulana Bhasani was one of the popular Muslim political leaders of the British Bengal and Assam. He played important role in the 'Pakistan Movement.' However, after the establishment of Pakistan, he left Muslim League and established Awami Muslim League in 1949. From then he used to demand provincial autonomy of East Bengal (East Pakistan). Later he left Awami League and established National Awami Party (NAP). Although he demanded 'provincial autonomy', he did not support 'six points demand' of Sheikh Mujibur Rahman. He considered the 'six points' as the blueprint of colonial power. He remarked that it was composed for the welfare of less than one percent of rising Bengali bourgeoisie class. He also blamed the 'six points' for a conspiracy of dismembering Pakistan. The speeches and the activities of Maulana Bhasani during the 'six points' movement from 1966 to 1969 blurred his 'nationalist image', and therefore, he lost his popularity to a great extent.

ভূমিকা

মওলানা ভাসানী ছিলেন স্বাধীন পাকিস্তানে পূর্ববাংলার জাতীয় নেতাদের অন্যতম। জনপ্রিয়তায় একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরেই ছিল তাঁর অবস্থান। তিনি অনর্গল ভাষণ দিয়ে দীর্ঘক্ষণ শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। কাজেই এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তিনিই হতে পারতেন পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত জাতীয়তাবাদী নেতা। কিন্তু তিনি তা হতে পারেননি। তাঁকে অতিক্রম করে তাঁরই শিষ্যসম শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে গেলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির জনক। সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যখন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছয় দফার আন্দোলনে সোচ্চার, আইয়ুব খান যখন সেই গণকণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগ করে চলেছেন, তখন কী এক রহস্যজনক কারণে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির মূল স্রোত থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং স্ববিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তা আজও গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। তিনি কী শেখ মুজিবকে ঈর্ষা করতেন?

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁর শিষ্যসম শেখ মুজিব তাঁকে ছাড়িয়ে জনতার নয়নের মণি হয়ে উঠছেন – এটি কি তাঁর মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল? কেন তিনি ছয় দফার বিরোধিতা করেছিলেন? তিনি তো স্বায়ত্তশাসন দাবির পক্ষেই ছিলেন। তিনি তো লাহোর প্রস্তাবেরও সমর্থক ছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা মেনিফেস্টোর প্রধান দাবিই ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। তিনি তো যুক্তফ্রন্টের নৌকার যাত্রী ছিলেন। তাহলে কেন এই বিরোধিতা? এই প্রবন্ধে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে পরস্পরবিরোধী প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। তিনি একদিকে ছিলেন পীরবাদের সমর্থক, ধর্মীয় আচারনিষ্ঠ মুসলিম; অপরদিকে তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের চরম বিরোধী, বাম চেতনার সমর্থক। ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখার পরিবর্তে তিনি একীভূত করতে চেয়েছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' নাকি 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' – এই দ্বন্দ্বে স্ববিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রবল ভারত-বিরোধী মনোভাবের কারণে 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের' সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছয় দফার মধ্যে পাকিস্তানের ভাঙনের আলামত দেখতে পেয়েছিলেন, যা তিনি চাননি। তাছাড়া তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ পরশ্রীকাতরতা থেকেও নিজেকে উত্তীর্ণ করতে ব্যর্থ হন। ছয় দফার বিরোধিতা সম্ভবত এই মনোজাগতিক দ্বন্দ্বের ফল।

ছয় দফা উত্থাপনের প্রেক্ষাপট ও ছয় দফার প্রস্তাবসমূহ

১৯৬৫ সালের ৬-২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৭ দিন ব্যাপী কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানকে প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল। ১৭ দিনব্যাপী যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানসহ পুরো বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভারত ইচ্ছে করলে অনায়াসেই এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানকে দখল করে নিতে পারতো। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যসহ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বেড়ে যায়। চরম খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে কত নিম্নগামী তা হাড়ে হাড়ে টের পায়। সকল ক্ষেত্রে তারা যে ব্যাপক শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হয়েছে তা তারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে। এরফলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

অপরদিকে ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সেই কোসিগিনের মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তান উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে এক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটায়। কিন্তু কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ সংঘটিত হলেও তাসখন্দ চুক্তির ৯টি ধারার কোনোটিতেই কাশ্মীর সংক্রান্ত কোনো ধারা ছিল না। এটি পাকিস্তানের জন্য ছিল এক অপমানকর চুক্তি। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুববিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এরূপ পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের উদ্যোগে লাহোরে নেজামে ইসলামীর নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালের সভাপতিত্বে নিখিল পাকিস্তান বিরোধীদলসমূহের দুইদিন ব্যাপী এক জাতীয় সম্মেলন শুরু হয়। এ সম্মেলনেই শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ৫ই ফেব্রুয়ারি বিষয় নির্বাচনী কমিটি এটি সম্মেলনে পাঠ করার অনুমতি না দিলে তিনি ও তাঁর দল সম্মেলন বর্জন করে ফিরে আসেন। তবে সম্মেলনস্থলে পূর্বেই এটি লিফলেট আকারে বিলি করা হয়েছিল।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে নিখিল পাকিস্তান বিরোধিদলসমূহের সম্মেলনে শেখ মুজিব

য ছয় দফা উত্থাপন করেছিলেন,[১] তা ছিল নিম্নরূপ –

প্রস্তাব এক : শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

দশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং এর ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব দুই : কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যথা – দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব তিন : মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে। ক) সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা, খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য

---

[১]ছয় দফা উত্থাপনের তারিখ নিয়ে অনেকের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এর একটি কারণ এই যে, পাকিস্তান সরকার ৪ঠা ফেব্রুয়ারির গভীর রাতে অর্থাৎ ৫ই ফেব্রুয়ারির আগের রাতে পাকিস্তান রক্ষা বিধির (ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস) ৫২ ধারা অনুযায়ী বিরোধী দলসমূহের আহূত লাহোর সম্মেলনের কার্যবিবরণী ও বক্তৃতাসমূহ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর ফলে পত্র-পত্রিকাসমূহ পিপিএ পরিবেশিত সেন্সরযুক্ত খবর ব্যতীত আর কিছু প্রকাশ করতে পারেনি। তবে পরবর্তীতে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, উক্ত সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী সভা ছিল ৫ই ফেব্রুয়ারি। এ সভায় বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন। তবে তিনি যখন তাঁর ছয় দফা প্রস্তাব পরবর্তী দিনের কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তা উত্থাপন করতে যান, তখন প্রবল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়; তাঁকে তা উত্থাপন করতে দেওয়া হয়নি। [দেখুন: হারুণ-অর-রশিদ, *আমাদের বাঁচার দাবি: ৬দফা'র ৫০ বছর* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬), পৃ. ৩৫, ৩৭; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬, পৃ.১,৮; *দৈনিক সংবাদ*, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, পৃ.১, ৮; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, পৃ. ৩।] আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আব্দুল মমিন কর্তৃক ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ ছয় দফার উপর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। শেখর দত্ত ২০১৫ সালে তার পুস্তকে লিখেছেন যে, "... ফেব্রুয়ারি সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির বৈঠকে তিনি (বঙ্গবন্ধু) সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি হিসেবে ৬-দফা পেশ করেন এবং সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে তা গ্রহণ করার জন্য চাপ দেন। ... ঐ বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের নেজামে ইসলামীর প্রতিনিধি ফরিদ উদ্দিন আহমেদসহ অন্য দলগুলোর নেতারা ৬-দফা দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন। সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করা যাবে না।" [দেখুন: শেখর দত্ত, *ষাট দশকের গণজাগরণ: ঘটনাপ্রবাহ, পর্যালোচনা, প্রভাব* (ঢাকা: সমাজ বিকাশ প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ.২৫০। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী এনডিএফ নেতা আতাউর রহমান খান লিখেছেন, "...অধিবেশন চলাকালে শেখ মুজিব হঠাৎ বোমা নিক্ষেপ করলেন, ৬-দফা প্রস্তাব বা দাবির আকারে একটা রচনা নকল করে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হল। কোন বক্তৃতা বা প্রস্তাব নেই, কোন উপলক্ষ নেই, শুধু কাগজ বিতরণ। পরে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল।" দেখুন: শেখর দত্ত, পৃ. ২৭৭] এ থেকে বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু ৫ই ফেব্রুয়ারির বিষয় নির্বাচনী বৈঠকের আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বেই সম্মেলনস্থলে ৬-দফা প্রস্তাব কাগজ আকারে বিলি করেছিলেন। অবশ্য মাহবুবর রহমান লিখেছেন ৬ তারিখ। [দেখুন: মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: সময় প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৮৫-৮৬]; আবুল ফজল হক লিখেছেন ১৩ তারিখ। [দেখুন: আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ১০৪] তবে ছয় দফার প্রবক্তা বঙ্গবন্ধুর নিজের সংগঠন আওয়ামী লীগ ৫ ফেব্রুয়ারিকে ছয় দফা উত্থাপন দিবস হিসেবে পালন করে। [দেখুন:হারুণ-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬), পৃ. ৮৭-৮৯।

একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক ও অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব চার : রাজস্ব, কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সবরকম কর আদায় করার ক্ষমতা থাকবে। শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব পাঁচ : বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকবে।

গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোই মিটাবে।

ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।

ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব ছয় : আঞ্চলিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন করার ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।[২]

ছয় দফা প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা-বিবৃতি

মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন কামনা করলেও তিনি চাননি যে আওয়ামী লীগ কিংবা শেখ মুজিবের একক নেতৃত্বে তা সফল হোক। কেননা তিনি তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আয়য়ামী লীগ ছেড়ে ন্যাপ গঠন করেছিলেন। আওয়ামী লীগের সাথে তার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বই তাঁর ছয় দফা বিরোধিতার অন্যতম কারণ। তিনি আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবকে এতটাই অপছন্দ করতে শুরু করেন যে, ১৯৬৬ সালের ৮ই মে রাত একটায় শেখ মুজিবকে যখন তার বাসা থেকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩১(১) ধারায় বিচ্ছিন্নতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তখন জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা নূরুল আমিন, সংসদ উপনেতা শাহ আজিজুর রহমান, নেজামে ইসলামী নেতা ফরিদ আহমেদ প্রমুখ মুজিবসহ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের নিন্দা করে পত্রিকায় বিবৃতি দিলেও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ নীরব থাকে।[৩]

---

[২] ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আব্দুল মমিন কর্তৃক এভাবেই পুস্তিকাকারে ৬-দফা পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

[৩] শেখর দত্ত, *ষাট দশকের গণজাগরণ: ঘটনাপ্রবাহ, পর্যালোচনা, প্রভাব* (ঢাকা: সমাজ বিকাশ প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ.২৮৪-৮৫।

এমনকি সারা দেশের মানুষ যখন ৬-দফার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত তখন তিনি ন্যাপের র্যক্রম থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কৃষক সমিতির কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একে মওলানা াসানীর 'Don't disturb Ayub' নীতির প্রতিফলন বলে মনে করা হয়।

তবে মে মাসে ন্যাপের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে এ বৈঠকে মওলানা ভাসানীর ভাপতিত্বে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় –

> ... বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের এবং একচেটিয়া পুঁজি, সামন্তবাদ ও আমলাতন্ত্রের শাসন তথা রক্ষকগোষ্ঠীর প্রতিভূ আইয়ুব শাসনের অবসান ঘটিয়ে একটি সত্যিকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে না পারলে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত করা, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা এবং স্বাধীন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন করা কখনই সম্ভব নয়।[৪]

মওলানা ভাসানী ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় আইয়ুব খানের নীতির সাথে কাত্মতা ঘোষণা করেন এবং এজন্য তিনি ও তাঁর দল ন্যাপ লাহোরে নিখিল পাকিস্তান রোধীদলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। আইয়ুবের নীতি সমর্থনের রাবাহিকতার অংশ হিসেবেই তিনি এবং তাঁর দল ন্যাপ ছয় দফার বিরোধিতা করে। এর প্রমাণ াওয়া যায় ১৯৬৬ সালের ১৫ মার্চ কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীতে ন্যাপের এক জনসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণ থকে। এ সভায় মওলানা ভাসানী বলেন, "তাসখন্দের ঘোষণার ফলে পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব াখিল হইয়াছে এবং পাকিস্তানের সাথে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের সম্পর্ক পূনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে।"[৫] াহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রায় সকল প্রধান বিরোধীদলের সম্মেলনে যেখানে তাসখন্দ চুক্তিকে ত্যাখ্যান করা হয় সেখানে মওলানা ভাসানীর এই চুক্তির সপক্ষে অবস্থান তাঁর আইয়ুব প্রীতিরই মান্তর।

আসলে পাকিস্তানের ইসলামপন্থী দলগুলো বরাবরই আইয়ুব খানের প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত রখেছে। ন্যাপ যদিও ইসলামপন্থী দল নয়, তথাপি এর নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ও কর্মসূচি ইসলামপন্থী লগুলোর মতোই আইয়ুব খানের পক্ষে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন নিখিল পাকিস্তান ন্যাপের াধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানীর ঢাকায় প্রদত্ত বিবৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। জনাব সমানী ১৯৬৬-এর ফেব্রুয়ারির লাহোর সম্মেলনের পর ঢাকায় এসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ন্যাপও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চায়, তবে তা ফেডারেল পদ্ধতির নয়। কেন্দ্রের হাতে দেশরক্ষা, বদেশিক নীতি (বিদেশি বাণিজ্যসহ) এবং মুদ্রা – এই তিনটি বিষয় কেন্দ্রের হাতে রাখিয়া যতখানি ায়ত্তশাসন দেওয়া যায় ন্যাপ ততখানি চায়।"[৬] তাঁর এই বক্তব্যের সাথে পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর ভাপতি মওলানা মওদুদীর বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়। লাহোর থেকে করাচি হয়ে ঢাকায় ফিরে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মওলানা আবুল আলা মওদুদী বলেন, "দেশের অখণ্ডতা রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করিয়া প্রদেশসমূহকে যতখানি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া সম্ভব, তিনি ততখানি স্বায়ত্তশাসনই াদেশসমূহকে দেওয়ার পক্ষপাতি।" মওদুদী আরও বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক ায়ত্তশাসনের জন্য যে ছয় দফা সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আর 'একপদ' আগাইলেই দেশের খণ্ডতা নষ্ট হইবে এবং এই জন্যই তিনি শেখ মুজিবরের ৬-দফার ঘোর বিরোধী।"

---

[৪] তদেব।

[৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, মার্চ ১৬, ১৯৬৬, পৃ. ১।

[৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৬৬, পৃ. ১।

উল্লেখ্য, শেখ মুজিব কর্তৃক ঘোষিত ছয় দফা দাবির প্রথম দফায় উল্লেখিত ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থাকে আইয়ুব সমর্থকগণ 'কনফেডারেশন' দাবি বলে অপব্যাখ্যা করেছিল এবং ছয় দফাকে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করেছিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তানের আইন ও পার্লামেন্ট দফতরের মন্ত্রী আব্দুল হাই এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে লইয়া কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবের নিন্দা করেন।[৭] আব্দুল হাই আরও বলেন, "...এরূপ প্রস্তাব দেশদ্রোহিতার নামান্তর।"[৮] মওলানা ভাসানীও তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে এই ব্যাখ্যারই সমর্থন করেছেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে এটা প্রতিভাত হয়েছে যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত বাঙালি জনগণের মুক্তির চাইতে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার বিষয়েই অধিক চিন্তিত ছিলেন।

২৬ মার্চ ১৯৬৬ তারিখে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার এক রিপোর্টে দেখা যায় যে মওলানা ভাসানী ২২শে মার্চ হবিগঞ্জে এক জনসভায় ভাষণ দেন। সেখানে ছয় দফা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তাঁর দল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। তিনি আরও বলেন, "পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ উচ্ছেদ সাধনের মাধ্যমে পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ন্যাপ শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।"[৯]

১৯৬৬ সালের ১৯-২০ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে ছয় দফা পাশের পর শেখ মুজিবুর রহমান যখন প্রচারণার অংশ হিসেবে ৭ এপ্রিল পাবনার নগরবাড়িতে পৌঁছেন এবং বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন ঐদিন *দৈনিক ইত্তেফাক* পরিবেশিত এক সংবাদে জানা যায়, মওলানা ভাসানীকে ৬ই এপ্রিল যখন ছয় দফা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি একে 'ডিসমিস' করে দেন। এর কারণ হিসেবে ভাসানী বলেন, "... সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের হাত হইতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধের কোন ব্যবস্থাপত্র ইহাতে নাই।"[১০] তিনি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আরও বলেন,

> পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের ব্যাপারে আন্তরিক হইলে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রায় একইরূপ কর্মসূচিসম্পন্ন অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে লইয়া একই প্লাটফর্ম হইতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনাই অধিকতর বিজ্ঞতার কাজ হইত। ... পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কস্মিনকালেও তাহাদের সমস্যা সমাধানের জন্য সাম্রাজ্যবাদী মহলের দেওয়া কোন ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করিবে না।[১১]

তিনি আরও বলেন,

> [তিনি] ১৯৪০ সালের লাহোর ঐতিহাসিক প্রস্তাবে বর্ণিত বিধানমতে প্রদেশসমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী। তবে দেশের অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের ব্যাপারে পাকিস্তানের ১০ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উহাতে অবশ্যই প্রতিফলিত হইতে হইবে।[১২]

ছয় দফায় বর্ণিত দাবিসমূহ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবেরই প্রতিধ্বনি। কেননা মূল লাহোর প্রস্তাবে 'মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ' নিয়ে 'states' গঠনের কথা বলা হয়েছিল। ভাসানী যদি

---

[৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৬৬, পৃ. ১।

[৮] তদেব।

[৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, মার্চ ২৬, ১৯৬৬, পৃ. ১।

[১০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, এপ্রিল ৭, ১৯৬৬, পৃ. ১।

[১১] তদেব।

[১২] তদেব।

সত্যিকার অর্থেই লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন তবে ছয় দফার সাথে তার বিরোধ থাকার কথা নয়। অথচ তিনি ছয় দফার বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং এই বিরোধিতা আদর্শিক নয়, এর পেছনে অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। *ইত্তেফাক*-এর মতে এর কারণ হলো, 'আওয়ামী লীগের একক ভূমিকা ভাসানীর না-পছন্দ।'[১৩]

পাঠক, লক্ষ করুন! মওলানা ভাসানী তাঁর বক্তৃতায় ছয় দফা সমর্থন না করার কারণ হিসেবে একদিকে আওয়ামী লীগকে এই বলে দোষারোপ করেছেন যে, তারা সমমনা দলগুলোকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম করেনি; অপরদিকে তিনি একে সাম্রাজ্যবাদী মহলের তৈরি করা প্রস্তাব বলে উল্লেখ করেছেন।

ভাসানীর এই অভিযোগ সত্য নয়। কেননা আওয়ামী লীগ বিরোধীদলের একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম করার উদ্দেশ্যেই ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু সেখানে তারা তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পায়নি। তাছাড়া মওলানা ভাসানী নিজেও উক্ত সম্মেলনে যোগ দেননি। আসলে তিনি চীনপন্থী সমাজতন্ত্রের অনুসারী হওয়ায় চীনের অনুরোধে আইয়ুব খানের বিরোধিতা করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে গিয়ে প্রকারান্তরে বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামকেই বিভ্রান্তিতে ফেলে দেন।

ছয় দফার প্রতি মওলানা ভাসানীর মনোভাব আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে ১৯৬৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর রংপুর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(ন্যাপ)-এর বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে। এ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন,

> পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠির সাথে বাঙালি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বকেই ছয় দফার নামে স্বায়ত্তশাসনের লেবাস পড়াইয়া হাজির করানো হইয়াছে। ... অবাঙালি আদমজি, দাউদের স্থলে কয়েকজন বাঙালি আদমজি দাউদ সৃষ্টিই যদি ছয় দফার লক্ষ্য হইয়া থাকে, তবে স্বায়ত্তশাসনের নামে বাংলার কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ কোনদিনই তার জন্য বুকের রক্ত ঢালিতে যাইবে না। কেননা, যে ছয় দফা কর্মসূচিতে বাংলার কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের অধিকারের কোন স্বীকৃতি নাই, স্বায়ত্তশাসনের নামে সেই ছয় দফা ভিত্তিক তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অনিবার্যভাবেই ... শোষণ-পীড়ন চালাইবার অধিকারে পর্যবসিত হইবে।[১৪]

এ সম্মেলনে মওলানা ভাসানী ছয় দফার বিরোধিতা করে বলেন, "এতে দেশের মাত্র শতকরা এক ভাগেরও কম উদীয়মান বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে এটি জাতীয় মুক্তিসনদ হতে পারে না।" এজন্য তিনি ১৪ দফা দিয়েছেন।

ছয় দফার প্রতি মওলানা ভাসানীর মনোভাব আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে প্রখ্যাব বুদ্ধিজীবী মজহারুল ইসলামকে প্রদত্ত তার সাক্ষাৎকার থেকে। ভাসানী ছয় দফা প্রসঙ্গে তাকে বলেছিলেন,

> ... আমি ওইসব বাংলা ফাংলা বুঝি না। বর্তমান দুনিয়ায় আর্ন্তজাতিক সম্পর্কই হল আসল। ... পৃথিবীর মজলুম মানুষ সব এক, তারা যেখানেই বাস করুক। তাছাড়া বেশি বাংলা বাংলা করলে পাকিস্তান ভেঙে যাবে। এটা আল্লাহর দেশ। পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এই দেশকে তোমরা ভাঙতে চাও? আমি তা হতে দেব না।[১৫]

---

[১৩] তদেব।

[১৪] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ২৯৩।

[১৫] শেখর দত্ত, *ষাট দশকের গণজাগরণ: ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা প্রভাব*, পৃ. ২৮৫।

ভাসানীর এই বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ের চেয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের সংহতি নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। তাঁর এরূপ মনোভাবের কারণ হতে পারে তাঁর চিন্তাধারার উপর তার যাপিত জীবনের প্রভাব। জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে কাটিয়েছেন। বাংলাদেশে তার জন্ম হলেও তিনি ছিলেন শেকড় বিচ্ছিন্ন। ফলে এই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক স্বাধীনতার চেয়ে মানুষগুলোর অবস্থার পরিবর্তনের উপরই তিনি জোর দিয়েছিলেন।

ছয় দফার পক্ষে ৭ই জুন হরতাল উপলক্ষে সারাদেশে যখন ব্যাপক রাজনৈতিক নিপীড়ন চলছিল তখন মওলানা ভাসানী ১০ই জুন ঢাকার পোস্তগোলায় ন্যাপের এক কর্মী সম্মেলনে বলেন, '৭ই জুনের হরতালে সিআইএর হাত ছিল।' এই হরতালে সরকারি বাহিনির দমন-পীড়নের প্রতিবাদ করার পরিবর্তে হরতালকে বিতর্কিত করার জন্য প্রদত্ত ভাসানীর এই বক্তব্য সারা দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ভাসানী প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত হন। এ তীব্র সমালোচনার মুখে তিনি খুবই বিব্রত হন এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলতে বাধ্য হন যে, তিনি সরকারি দমন-পীড়নের প্রতিবাদ করে বক্তব্য দিয়েছিলেন কিন্তু খবরের কাগজগুলো তা প্রকাশ করেনি।[১৬]

১. ভাসানী কর্তৃক ছয় দফা বিরোধিতার কারণ

মওলানা ভাসানী কর্তৃক ছয় দফার বিরোধিতার অন্যতম কারণ সম্ভবত তাঁর চীনপন্থী অবস্থানের কারণে তাঁর আইয়ুবসমর্থন নীতি। অলি আহাদ তার *জাতীয় রাজনীতি* নামক গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে, ১৯৬৩ সালেই মওলানা ভাসানীর সাথে আইয়ুব খানের এক গোপন বৈঠক হয়েছিল। তার মতে, এর পর থেকেই তিনি সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় থেকেই আইয়ুব খান চীনের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের সুযোগ পান। চীনের সাথে আইয়ুব খানের এই সম্পর্কোন্নয়ন চীনপন্থী বামনেতারা বিশেষ করে চীনপন্থী ন্যাপ নেতারা স্বাগত জানায়। তাছাড়া আইয়ুব খান এ সময় থেকে মওলানা ভাসানীর 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' আদর্শের পক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। এর ফলে মওলানা ভাসানীও আইয়ুব খানের প্রতি নরম হন। আমরা জানি, ১৯৬৩ সালের ২২শে আগস্ট মওলানা ভাসানী আইয়ুব খানের আমন্ত্রণে রাওয়ালপিণ্ডিতে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন ন্যাপ নেতা মশিউর রহমান। সম্ভবত এ বৈঠকেই আইয়ুব-ভাসানী সমঝোতা হয়েছিল। কেননা এরপর থেকেই ভাসানীপন্থী ন্যাপ শুধু পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া ছাড়া কোনো সরকারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মওলানা ভাসানী আইয়ুব খানকে সমর্থন দান করেন। এ সময়ের পর থেকে ১৯৬৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে মওলানা ভাসানীকে খুব বেশি সক্রিয় দেখা যায়নি; যদিও ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে কাজ করেন। অবশ্য 'কপ'[১৭]-এর পক্ষ থেকে আইয়ুবের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় সামরিক ব্যক্তি লে. জেনারেল মোহাম্মদ আজম খানকে প্রার্থী করার প্রস্তাব করা হলে তিনি এর প্রবল বিরোধিতা করে পক্ষান্তরে আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন।

জনাব অলী আহাদের 'ভাসানী-আইয়ুব' সমঝোতা তত্ত্বের সত্যতা রয়েছে বলে মনে হয়। কেননা,

---

[১৬] শেখর দত্ত, *ষাট দশকের গণজাগরণ: ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা প্রভাব*, পৃ. ২৯৫।

[১৭] কপ (COP – Combine Opposition Party).

পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ, এমনকি সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতার উপর যখন আইয়ুব খান EBDO[১৮]এবং PODO[১৯] আইনের মাধ্যমে প্রবল দমন-পীড়ন চালাচ্ছিলেন তখন মওলানা ভাসানীর প্রতি তাঁকে বেশ নমনীয় বলেই মনে হয়েছে। এমনকি ১৯৫৮ সালে আইয়ুব কর্তৃক সামরিক শাসন জারির পূর্ব থেকেই পাকিস্তান সরকারের ভাসানীর প্রতি এই নমনীয়তা প্রকাশ পায়। ১৯৫৮ সালের ১২ই জুলাই মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে স্টকহোমে 'নিরস্ত্রীকরণ ও আর্ন্তজাতিক মৈত্রি' সম্মেলনে অংশ নেন। ১৯৫৯ সালের ৬ই অক্টোবর হতে ১৯৬২ সালের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত মওলানা ভাসানীকে ঢাকার ধানমন্ডির আবাসিক এলাকায় সরকারি খরচে ভাড়া বাড়িতে অন্তরীণ রাখা হয়। তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানগণকে সরকারি খরচে তাঁর সাথে অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়।[২০] আবার ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ সালে মওলানা ভাসানী দুইবার সরকারি খরচে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে চীন সফর করেন।

১৯৬৩ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা আইয়ুববিরোধী প্রবল আন্দোলন শুরু করে তখন তিনি আইয়ুব খান কর্তৃক মনোনীত হয়ে সরকারি দলের নেতা হিসেবে চীন সফর করেন।[২১] এই সফরে তিনি যখন মাও সে তুং-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন মাও সে তুং তাঁকে বলেছিলেন:

> You are our friends and if at the present moment you continue your struggle against the Ayub government, it will only strength of the hand of Russia, America and India. It is against our principles to interfere your work, but we would advice you to proceed slowly and carefully. Give us a chance to deepen our friendship with your government.[২২]

১৯৬৪ সালের ২৭শে জুলাই জাপানের রাজধানী টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে ভাসানী পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে 'আফ্রো-এশিয়ান-আমেরিকান' গণসংহতি সম্মেলনে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিডেল ক্যাস্ট্রোর আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অনেকের মতে, আইয়ুব খানের প্রবল দমন-পীড়নে ১৯৫৮-১৯৬৫ সময়কালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল আর সেকারণে রাজনীতিবিদগণও আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সফল হবেন – এরূপ আস্থা পাচ্ছিল না। শেখ মুজিবের ছয় দফায় এমন স্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছিল এবং আইয়ুব খান এর প্রতিক্রিয়ায় এতটাই খোলাখুলি হুমকি দিচ্ছিলেন যে দেশের বিরোধিদলের উপর আরেকটি ঝড় নেমে আসার আশঙ্কা করছিল সবাই। তাই তারা মুজিবের ছয় দফাকে সমর্থন করতে পারছিল না। মওলানা ভাসানীও এই মনোভাবের বাইরে ছিলেন না।

মওলানা ভাসানী একজন বড় মাপের নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে ঝুঁকি এড়িয়ে গাঁ বাঁচিয়ে রাজনীতি করার প্রবণতা লক্ষণীয়। সারাদেশে যখন ছয় দফার প্রতি প্রবল গণসমর্থন সৃষ্টি হয় তখন

---

[১৮] Elective Bodies (Disqualification) Order.

[১৯] Public Bodies (Disqualification) Order.

[২০] অলী আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫* (ঢাকা: খোজরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭), পৃ. ২৮৮।

[২১] Rangalal Sen, *The Political Elites in Bangladesh* (Dhaka :UPL, 1986), pp. 218-19.

[২২] Tareq Ali, *Pakistan: Military Role or Peoples Power* (New York: William Morrow & Company Inc., 1970), p. 140.

আইয়ুব খান গণগ্রেফতার, মামলা-হামলা ও ব্যাপক নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। এতসব নির্যাতনের পরও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনগণ ৭ই জুনের হরতাল সফল করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে তেজগাঁয় শ্রমিক মনু মিয়া, মুজিবুল্লাহ, আবুল হোসেনসহ এগারোজন শহিদ হয় এবং প্রায় আটশ' লোককে গ্রেফতার করা হয়।[২৩] এরই ধারাবাহিকতায় 'ইত্তেফাক' পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়, নিউ নেশন প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়। এমনকি 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় মওলানা ভাসানী এসব নির্মম সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদ করা তো দূরে থাকুক, নিজেই রাজধানী ছেড়ে বগুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঁচবিবি গ্রামে অবস্থান করেন। ন্যাপ সমর্থক ও ভাসানী গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ অবশ্য তার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, মওলানা ভাসানী এসব হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন কিন্তু সেগুলো পত্রিকায় আসেনি।[২৪]

তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা থেকে বোঝা যায় মওলানা ভাসানী সবসময়ে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কাউকে না জানিয়ে আত্মগোপন করতেন কিংবা নিজেকে গুটিয়ে নিতেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ১৯৫৪ সালে যখন নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করার জন্য নির্বাচনী জোট গঠন ও নমিনেশন ঠিক করার প্রসঙ্গ সামনে চলে আসে তখন আওয়ামী মুসলিম লীগে ব্যাপক গ্রুপিং দেখা দেয়। মওলানা ভাসানী এ সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি এবং শেখ মুজিবুর রহমান সেক্রেটারি। এ সময়ে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে ময়মনসিংহে পার্টির কাউন্সিল সভা ডাকতে চিঠি দেন। তদনুসারে, মুজিব কাউন্সিল ডেকে জেলায় জেলায় চিঠি পাঠান। কাউন্সিলের সময় যতই ঘনিয়ে আসে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যাপক গ্রুপিং এর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এসব শুনে মওলানা ভাসানী কাউন্সিলের তিন-চারদিন পূর্বে খবর দেন যে তিনি সভায় উপস্থিত হতে পারবেন না। তিনি গোপনে বগুড়ার পাঁচবিবিতে তাঁর এক মুরিদের বাসায় আত্মগোপন করেন। শেষে মুজিব ও খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস তাঁকে পাঁচবিবি থেকে ধরে নিয়ে আসেন।[২৫] এ রকম আরও অনেক ঘটনা রয়েছে যা থেকে তাঁর গাঁ বাঁচিয়ে রাজনীতি করার মনোভাব বোঝা যায়।

ছয় দফার প্রতি মওলানা ভাসানীর মনোভাবের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছেন, '... এর পূর্বে মওলানা ভাসানী সাহেবও ছয় দফার বিরুদ্ধে বলেছেন, কারণ দুই পাকিস্তান নাকি আলাদা হয়ে যাবে।'[২৬] মওলানা ভাসানীর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

> মওলানা সাহেবকে আমি জানি, কারণ তিনিই আমার কাছে অনেকবার অনেক প্রস্তাব করেছেন। এমনকি ন্যাপ দলে যোগদান করেও। সেসব আমি বলতে চাই না। ... মওলানা সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানে যেয়ে এক কথা বলেন, আর পূর্ব বাংলায় এসে অন্য কথা বলেন। যে লোকের যে মতবাদ সেই লোকের কাছে সেই ভাবেই কথা বলেন। আমার চেয়ে তাঁকে কেউ বেশি জানে না। তবে রাজনীতি করতে হলে নীতি থাকতে হয়। সত্য কথা বলার সাহস থাকতে হয়। বুকে

---

[২৩] তোফয়েল আহমেদ, "শহীদের রক্তে লেখা ছয়-দফা," *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৭ জুন ২০১৬, পৃ. (চতুরঙ্গ)।

[২৪] সৈয়দ আবুল মকসুদ, "বঙ্গবন্ধু, ছয় দফা ও ৭ জুন," *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ জুন ২০১৬ (সহজিয়া কড়চা)।

[২৫] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃ. ২৪৫-২৪৬।

[২৬] শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, মার্চ ২০১৭), পৃ. ৫৭।

আর মুখে আলাদা না হওয়াই উচিত।[২৭]

শুধুমাত্র আদর্শিক কারণেই যে মওলানা ভাসানী ছয় দফার বিরোধিতা করেছিলেন তা না-ও হতে পারে। এর পেছনে তার ব্যক্তিগত অনুদার মনোভাব ও পরশ্রীকাতরতাও কোনো অংশে কম দায়ী নয়। মওলানা ভাসানী কিরূপ অনুদার মনোভাবের ছিলেন বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* এর একটি ইঙ্গিত দিয়েছেনে। তিনি ১৯৪৯ সালের একটি ঘটনার মাধ্যমে তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পর জেলায় জেলায় এর কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলে এর অংশ হিসেবে মওলানা ভাসানী, শামসুল হক এবং শেখ মুজিব ময়মনসিংহে যান। সে সময়ে ময়মনসিংহের জামালপুর মহকুমার উকিল জনাব হায়দর মল্লিক আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেছেন। এ উপলক্ষে এক জনসভায় অংশ নেওয়ার জন্য তারা তিনজনই জামালপুর গিয়েছেন। জামালপুরের নেতারা ঠিক করেছিলেন যে শামসুল হক সভাপতিত্ব করবেন আর মওলানা ভাসানী হবেন প্রধান বক্তা। সভাশেষে রাতে যখন এক বাড়িতে তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো, মওলানা ভাসানী বেঁকে বসলেন, বললেন যে তিনি খাবেন না। তিনি প্রকাশ্যেই কৈফিয়ত চেয়ে বসলেন যে তিনি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও শামসুল হককে কেন সভার সভাপতি করা হলো। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়,

> রাতে এক বাড়িতে খেতে গেলেন মওলানা সাহেব। রাগ, খাবেন না। তিনি থাকতে কেন শামসুল হক সাহেবের নাম প্রস্তাব করা হল সভাপতিত্ব করার জন্য। এ এক মহা বিপদে পড়ে গেলাম। মওলানা সাহেবকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলোম, লোকে কি বলবে? তিনি কি আর বুঝতে চান? তাকে নাকি অপমান করা হয়েছে! শামসুল হক সাহেবও রাগ হয়ে বলছেন, মওলানা সাহেব সকলের সামনে এ কথা বলছেন কেন? এই দিন আমি বুঝতে পারলাম মওলানা ভাসানীর উদারতার অভাব, তবুও তাঁকে আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতাম। কারণ তিনি জনগণের জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত।[২৮]

বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায় মওলানা ভাসানীর ১৯৬৬ সালের ৬ই এপ্রিলের বিবৃতি থেকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ বিবৃতির মাধ্যমে ভাসানী আওয়ামী লীগকে এককভাবে ছয় দফা দাবি উত্থাপনের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। অর্থাৎ মুজিবের নেতৃত্বে ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তিনি মেনে নিতে পারেননি; এজন্য তিনি পাল্টা ১৪-দফা দাবি উপস্থাপন করেন।

এক্ষেত্রে ঐক্যন্যাপের বর্তমান সভাপতি (ন্যাপের ছয় দফাপন্থী অংশের সাবেক ছাত্রনেতা) পঙ্কজ ভট্টাচার্যের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন –

> মওলানা ভাসানীকে আইয়ুব খান চীনের মাও সে তুং-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে বাঙালিদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সক্ষম হন। ভাসানী মাও সে তুং দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে, মাও সে তুং-এর 'রাজনীতিতে টিকে থাকার তত্ত্ব' অনুসরণ করতে গিয়ে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। তিনি ছিলেন প্রবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আর মাও সে তুং তাকে বুঝাতে সক্ষম হন যে আইয়ুব খানও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিকে থাকতে হলে আইয়ুব খানকে টিকিয়ে রাখতে হবে।[২৯]

---

[২৭] তদেব।

[২৮] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১২৮।

[২৯] সাক্ষাৎকার: পঙ্কজ ভট্টাচার্য, স্থান: ঐক্যন্যাপের অফিস, বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন কমপ্লেক্স, শাহবাগ, ঢাকা; তারিখ: ২৬ মার্চ, ২০১৭।

নিজে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবির বিরোধিতা করার পেছনে ভাসানীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বও কম দায়ী নয়। ভাসানীর দুঃখ-ভারাক্রান্ত বাল্যকাল এবং দারিদ্র্যের সাথে তাঁর ব্যাক্তিজীবনের সংগ্রাম তাঁর অসহিষ্ণু ও স্ববিরোধী আচরণের অন্যতম কারণ। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সিদ্ধান্তসমূহকে যে তার যাপিত জীবনের 'অনিশ্চয়তাবোধ' প্রভাবিত করেছে – বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই।

উপসংহার

মওলানা ভাসানী ছিলেন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে। ছয় দফার মধ্যে এই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপিত হলেও তিনি ছয় দফাকে মনে করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট (সি আই এ) দ্বারা প্রণীত নীল-নকশা। তিনি শেখ মুজিবের উপর আস্থা রাখতে পারেননি। কেননা তিনি জানতেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন সোহরাওয়ার্দীর আদর্শের অনুসারী। সুতরাং সোহরাওয়ার্দী যেমন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের শতকরা আটানব্বই ভাগ অর্জিত হয়েছে; তেমনি তিনি মনে করেছিলেন যে শেখ মুজিবও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যই এই আন্দোলন করছেন; স্বায়ত্তশাসন তাঁর লক্ষ্য নয়। কিন্তু তাঁর এ ধারণা সঠিক ছিল না, কেননা শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী হলেও দুজনের রাজনৈতিক লক্ষ্য এক ছিল না। মুজিবের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা, যা সোহরাওয়ার্দী সমর্থন করেননি। এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "... আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, দেশের মানুষের অধিকার চাই।" আসলে মওলানা ভাসানী আর্ন্তজাতিক রাজনীতির চীনপন্থী ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে দেশীয় রাজনীতিতে আইয়ুব খানের রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন। আর তাই সারাজীবন সততার সাথে গণমানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেও জাতীয় রাজনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মূল স্রোত থেকে ছিটকে পড়েছেন। আর শেখ মুজিব ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক; হয়েছেন জাতির জনক।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও মুজিবনগর সরকার: আইনগত পর্যালোচনা

মো. হাসিবুল আলম প্রধান*

Abstract: The Proclamation of Independence, issued on 10th April, 1971, is a unique constitutional document in the history of our Libration War through which the first Government of the People's Republic of Bangladesh has formally been established by taking oath on 17 April, 1971, at Baidyanathtala, renamed as Mujibnagar, in the district of Meherpur. Somebody considers 'Mujibnagar Government' as government-in-exile or temporary government, but, this government is the first Constitutional Government of Bangladesh. Apart from presenting the constitutional importance of the Proclamation of Independence, the main goal of this article is to present how the 'Mujibnagar Government' as the first Government of liberated Bangladesh and the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the first President of Bangladesh.

১. ভূমিকা

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে সুগঠিত করে সুপরিকল্পিতভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দিনটি বাঙালি জাতির ইতিহাসে শুধু গৌরবেরই নয়, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এদিন শুধুমাত্র বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হয়নি, এদিন শপথ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তার যেমন সাংবিধানিক স্বীকৃতি মেলে, তেমনি বঙ্গবন্ধু যে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি তারও সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলও একটি ঐতিহাসিক দিন। এদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের এক বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকামী বাংলাদশ রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন সরকারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ বেতার ভাষণটি প্রথমে রাত সাড়ে নয়টায় আকাশবাণীর কলকাতার একটি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় এবং পরে আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র এবং কলকাতায় অবস্থিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ১১ই এপ্রিল পুনঃপ্রচার করা হয়। এই সরকারই আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় শপথ নিয়েছিল। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই ঘোষণাপত্রটিই সাংবিধানিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং এতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সকল আদেশ ও সার্কুলার জারি করা হয় এবং

* অধ্যাপক, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। মুজিবনগর সরকার যে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি তার আইনগত ভিত্তি বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে তুলে ধরা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

২. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি ও মুজিবনগর সরকার গঠন

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে ঘুমন্ত শান্তিপ্রিয় বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নারকীয়, বর্বরোচিত ও নৃশংস গণহত্যাযজ্ঞ চালায় এবং এরই প্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা দেবার কারণে পাকিস্তানি সৈন্যদর হাতে গ্রেফতার হন। নিজের অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান করাসহ একটি সরকার গঠন করার বিষয়টি মাথায় রেখে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড নেতৃত্বকে আত্মগোপনে যাওয়ারও নির্দেশনা ২৫শে মার্চ সন্ধ্যাতেই দেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু নিজে আত্মগোপন করেননি, কারণ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা যদি ভারতের মতো জায়গায় আত্মগোপন করতেন তাহলে আগরতলা মামলা থেকে শুরু করে পাকিস্তান সরকার তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করে এসেছে সেটাই আন্তর্জাতিক কূটনীতিক মহলে সত্য বলে প্রমাণিত হতো। বঙ্গবন্ধু আত্মগোপন না করার আর একটি কারণ হলো, তিনি আত্মগোপন করলে তাঁকে খোঁজার নামে ঢাকা শহরকে ভস্মীভূত করা হবে অথবা লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে হবে, এই ধারণাও তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল।[১] পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরিচালিত বর্বরোচিত গণহত্যা বিশ্ববাসীকে জানাতে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সরকার গঠনের কথা মাথায় রেখে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে সাথে নিয়ে ২৭শে মার্চ ভারতের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা থেকে গোপনে রাজবাড়ি, ফরিদপুর, মাগুরা ও ঝিনাইদহ হয়ে ৩০শে মার্চ দুপুরের দিকে তাঁরা চুয়াডাঙ্গায় আসেন এবং তাজউদ্দীন আহমদ সেখানে চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার প্রতিরোধ প্রস্তুতি সম্পর্কে সবকিছু জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে চুয়াডাঙ্গাকে অস্থায়ী রাজধানী করার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।[২] এদিনই তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাঙালি জাতিকে রক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে যথাসম্ভব দ্রুত একটা সরকার গঠন করা দরকার এবং এজন্য প্রতিবেশী গণতান্ত্রিক ভারত সরকারের সহযোগিতা আবশ্যক। এমতাবস্থায় তাজউদ্দীন আহমদ, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী (মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক), মাহবুব উদ্দীন (ঝিনাইদহের এসডিপিও), মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি ডা. আসহাবুল হক প্রমুখ পারস্পরিক আলোচনা করে ভারতের সাহায্য প্রার্থনার সিদ্ধান্তে উপনীত হন।[৩] এ লক্ষ্যে ৩০শে মার্চ বিকেলেই তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী ও মাহবুব উদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে জীবননগর হয়ে কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

৩০শে মার্চ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সীমানা অতিক্রম করে ভারতে গেলে প্রকৃতপক্ষেই তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এই দুজনকে আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যথাযোগ্য সম্মানের সাথে গ্রহণ করে। ঐদিন রাতেই তাজউদ্দীন আহমদ ও

---

[১] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ১০০।

[২] রাজিব আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর দলিল ও ইতিহাস* (ঢাকা : বইপত্র, ২০১৩), পৃ. ১০২।

[৩] কামাল হোসেন, *তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর* (ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ২৬৪।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম প্রথমে কৃষ্ণনগরে পৌঁছান এবং সেখান থেকে কলকাতা যান। এরপর বিশেষ প্রটোকল ব্যবস্থায় গোলক মজুমদার নিজে গাড়ি চালিয়ে তাঁদেরকে দমদম এয়ারপোর্টে নিয়ে যান। সেখানে মধ্যরাত নাগাদ তাঁরা নেহেরু পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বয়ং বিএসএফ প্রধান রুস্তমজীকে বিমান থেকে অবতরণ করতে দেখতে পান। রুস্তমজী এক সময়ে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর নিরাপত্তা প্রধান ছিলেন বিধায় নেহেরু পরিবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।[৪] দমদম এয়ারপোর্টে তাজউদ্দীন ও রুস্তমজীর সাক্ষাৎ হবার পর তাদের নিয়ে গিয়ে 'আসাম ভবনে' রাখা হয়। সেখানে প্রায় তাঁরা সারা রাত ধরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাক্রমে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা এবং সে সম্পর্কিত পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে নেন।[৫] এরপর কেএফ রুস্তমজী দিল্লীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে তাঁকে জানানো হয় এই দুজন নেতাকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার জন্য। অবশেষে ১লা এপ্রিল দিবাগত রাতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গোলক মজুমদারেরর সাথে তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলামকে বিএসএফ-এর ব্যবস্থাপনায় সামরিক রসদবাহী একটি বিমানে করে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়।[৬] দিল্লীতে যাবার পর ভারত সরকার প্রথমে বিভিন্ন সূত্র থেকে নিশ্চিত হন যে, তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। গোলক মজুমদার ও রুস্তমজীর প্রচেষ্টায় তাজউদ্দীন আহমদ ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যারাতে। সাক্ষাতের তারিখের বিষয়ে কোনো কোনো গবেষক তাঁদের বইয়ে বা লেখায় ৩রা এপ্রিল সন্ধ্যারাতের কথা উল্লেখ করলেও ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম-এর লেখা ও বক্তৃতা থেকে জানা যায় তারিখটি ৪ঠা এপ্রিল। তিনি দৈনিক প্রথম আলোতে তাঁর এক লেখায় জানান, ৪ঠা এপ্রিল তাজউদ্দীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এ সাক্ষাৎ যে দুই দফায় হয়েছে তারও উল্লেখ করা হয় এই লেখায়।[৭] তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর এক বক্তৃতাতেও প্রথম সাক্ষাতের তারিখটি ৪ এপ্রিল বলে উল্লেখ করেন।[৮] মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার, পিএস সি (অবঃ)-এর লেখা থেকেও জানা যায় যে, তাজউদ্দীন আহমদ ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে দিল্লীতে এপ্রিলের ৪ঠা ও ৫ই তারিখে ২ বার সাক্ষাৎ হয়।[৯] ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের আগের দিন এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাজউদ্দীন আহমদকে জিজ্ঞাসা করে যে ইতিমধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো সরকার গঠন করা হয়েছে কি না এবং তিনি কোন পদাধিকারী ব্যক্তি হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। এমতাবস্থায় তিনি ত্বরিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,

> ভারত সরকারকে জানাবেন ২৫-২৬শে মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার গঠন করেছেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমান সেই সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং আওয়ামী লীগের হাই কমান্ডের সদস্যরা মন্ত্রীসভার সদস্য। অনকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও

---

[৪] ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: পঞ্চদশ খণ্ড* (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৫), পৃ. ১০১।

[৫] কামাল হোসেন, *তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, পৃ. ২৬৮-২৬৯।

[৬] তদেব, পৃ. ২৭২।

[৭] এম, আমীর-উল ইসলাম, "ইতিহাস গড়া সেই দিন", অন্য আলো বিভাগ, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ এপ্রিল ২০১০।

[৮] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ কর্তৃক আয়োজিত মুজিবনগর সরকার ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শীর্ষক আলোচনা সভা, সন্ধ্যা ৭টা, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬, জুবেরি ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[৯] মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার, পিএসসি (অবঃ), "মুজিবনগর দিবস: ইতিহাসের অন্যতম মাইল ফলক," ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস ২০১২ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৭ এপ্রিল ২০১২।

> দেশের স্বার্থে তাজউদ্দীন আরও সিদ্ধান্ত নেন যে, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে এই সাক্ষাৎ করবেন।[১০]

তবে সরকার গঠনের বিষয়টি ভারতে প্রবেশের পূর্বেই তাজউদ্দীন মন স্থির করেছিলেন যা তাঁর সাক্ষাৎকার থেকেই নিশ্চিত হওয়া যায়। তিনি বলেন,

> ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পথে এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা লাভের যে চেতনার উন্মেষ দেখে গিয়েছিলেন, সেটাই আমাকে আমার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে অনিবার্য সুযোগ দিয়েছিল। জীবননগরের কাছে সীমান্তবর্তী টঙ্গি নামক স্থানে একটি সেতুর নীচে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে সেদিন সাড়ে সাতকোটি বাঙালির স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা হলো একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কাজ শুরু করা।[১১]

৪ঠা এপ্রিলের সাক্ষাতে প্রাথমিক সম্ভাষণ বিনিময়ের পর ইন্দিরা গান্ধী প্রথম প্রশ্ন করেন "How is Sheikh Mujib? Is he all right?" তিন অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে জবাব দেন এ বলে যে, শেখ মুজিব তাঁদেরকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর বিশ্বাস মুজিব কোনো গোপন স্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন। তবে ২৫শে মার্চের রাতের পর থেকে মুজিবের সাথে তাঁদের কোনো যোগাযোগ নেই।[১২] এ সাক্ষাৎকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাজউদ্দীন আহমদ সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – দেশ ত্যাগ করে যারা ভারতে প্রবেশ করেছে তাদেরকে শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ, ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার অনুমতি প্রদান, মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও সামরিক রসদ সরবরাহ ইত্যাদি।[১৩] দ্বিতীয় দিন ৫ই এপ্রিল আবারও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাজউদ্দীনের আলোচনা হয়। এসব আলাচনায় তাজউদ্দীনের প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক আচরণ এবং দূরদর্শিতা ইন্দিরা গান্ধীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় প্রার্থিত বিষয়ে ভারত সরকারের সহানুভূতি সঞ্চারিত হয় এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া যায়।[১৪] দিল্লীতে এ সময়ে অবস্থান করছিলেন ড. রেহমান সোবহান, ড. আনিসুর রহমান, এম.আর. সিদ্দিকী, সিরাজুল হক বাচ্চু মিয়া ও যুবনেতা আব্দুর রউফ প্রমুখ। তাঁদের সকলের সাথে আলাদা আলাদাভাবে তাজউদ্দীন আহমেদ ও ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলামের বৈঠক হয়। যুবনেতা আব্দুর রউফ একটি সরকার গঠনের জন্য তাঁদের নিকট অনুরোধ জানান।[১৫] বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকেও সরকার গঠনের অব্যাহত চাপ আসছিল। অনেক ভেবে চিন্তে দিল্লীতেই তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধু কতৃক গঠিত হাইকমান্ড নিয়ে সরকার গঠনের বিষয়টি চূড়ান্ত করেন যে, সরকারের রাষ্ট্রপতি হবেন বঙ্গবন্ধু এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেশের কথা ভেবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণে তিনি রাজি হন। দেশ স্বাধীনের পর এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, "সেদিন বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে দেশের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনায় যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তা বাংলাদেশ এবং এ দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বার্থেই নিয়েছিলাম।"[১৬] দেশের নামের ব্যাপারে ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' প্রস্তাব করলে তা তাজউদ্দীন আহমেদের পছন্দ হয়।

---

[১০] কামাল হোসেন, *তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, পৃ. ২৭৪।

[১১] 'আগেই সিদ্ধান্ত নেই সরকার গঠনের' শীর্ষক তাজউদ্দীন আহমদের সাক্ষাৎকার, *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২।

[১২] কামাল হোসেন, *তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, পৃ. ২৭৫।

[১৩] তদেব, পৃ. ২৭৫-২৭৬।

[১৪] তদেব, পৃ. ২৭৭।

[১৫] ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: পঞ্চদশ খণ্ড*, পৃ. ১০৫।

[১৬] 'আগেই সিদ্ধান্ত নেই সরকার গঠনের' শীর্ষক তাজউদ্দীন আহমদের সাক্ষাৎকার ।

সরকারি কাগজপত্রে ব্যবহারের জন্য একটি মনোগ্রাম ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম নিজে আঁকেন যেটা ছিলো – চারপাশে গোলাকৃতি লাল এর মাঝখানে সোনালী রং-এর মানচিত্র। তাজউদ্দীন আহমদ এটা শুধু পছন্দই করলেন না, সাথে সাথে তিনি তা অনুমোদনও করে দিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর প্রথম সরকারি অনুমোদন।[১৭] এখানে উল্লেখ্য যে, ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায় দিল্লীতেই তাজউদ্দীন আহমদ, রেহমান সোবহান ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম মিলে সরকার গঠন সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রস্তুত করেন এবং তাজউদ্দীনের কণ্ঠে দিল্লীতে বসেই প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়। এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম সাক্ষাৎকারে বলেন,

> সারাদিন আমি তাজউদ্দীন ভাইএর বক্তৃতা তৈরি করছি। রেহমান সোবহান বক্তৃতার খসড়া রচনায় আমাকে সহায়তা করেন। সেদিনই তাঁর কাছে জানতে পারি যে, ড. কামাল হোসেন গ্রেফতার হয়েছেন। রেহমান সোবহান জানান, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করবেন। তাঁর ইংরেজী খসড়ার একটি অংশ আমার খুব ভাল লেগেছিল। সেটা ছিল "Pakistan is dead and buried under mountain of corpses." বাংলায় এর অনুবাদ করি পর্বত প্রমাণ লাশের নীচে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে। শেষ অনুচ্ছেদে আমি লিখি। 'আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা, ছেলেদের রক্ত ও ঘামে মিশে জন্ম নিচ্ছে নতুন বাংলাদেশের।' এক সময় চোখের জলে বক্তৃতার খসড়ার এক অংশ ভিজে গেল। চোখ মুছে আবার লিখতে শুরু করি। লেখা শেষ হলে সমস্ত বক্তৃতাটা তাজউদ্দীন ভাইকে শোনাই।[১৮]

এভাবেই তাজউদ্দীন আহমদ দিল্লীতে গিয়ে কেবল মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করেননি, তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে একটি সরকার গঠনের প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

তাজউদ্দীন আহমদ কোন পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎপূর্বক সরকার গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এ অবস্থায় কী করণীয় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য ৮ই এপ্রিল কলকাতার লর্ড সিনহা রোডের একটি বাড়িতে বাংলাদেশ থেকে আগত নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন এবং এ বৈঠকে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি মন্ত্রীসভা গঠনের বিরোধিতা করে বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব রেখে বক্তব্য রাখলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে। এ সময়ে তাজউদ্দীন ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম সরকার গঠনের সুদৃঢ় যুক্তি তুলে ধরে বক্তব্য রাখলে জ্যেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে বিশেষত এএইচএম কামারুজ্জামানের হস্তক্ষেপে মিজানুর রহমান চৌধুরী ও শেখ ফজলুল হক মণি ব্যতীত অন্যরা সরকার গঠনের যৌক্তিকতা মেনে নেন।[১৯] ১০ই এপ্রিল নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি, মন্ত্রীসভার সম্ভাব্য সদস্য ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতাদের খোঁজখবর সংগ্রহ এবং সরকার গঠনের ঘোষণার জন্য তাজউদ্দীন আহমদ একটি রাশিয়ান ডকেটো বিমানে করে সীমান্ত এলাকায় উড়ে চলেন। সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমদ ও নগেন্দ্র সিংহ। মালদহ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি, শিলচর ও আগরতলা প্রভৃতি স্থানে বিমান থেকে নেমে বিভিন্ন আওয়ামী লীগ নেতাদের সংগ্রহ ও খোঁজখবর করে তাজউদ্দীন দুপুরে পৌঁছেন বাগডোগরা বিমানবন্দরে। সেখান থেকে জিপে করে তিনি শিলিগুড়ি পৌঁছান। পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিলিগুড়িতে অবস্থিত

---

[১৭] ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: পঞ্চদশ খণ্ড*, পৃ. ১০৮।

[১৮] তদেব, পৃ. ১০৮-১০৯।

[১৯] কামাল হোসেন, *তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, পৃ. ২৮০।

একটি রেডিও স্টেশন থেকে তাজউদ্দীন আহমদের রেকর্ডকৃত ভাষণটি প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়।[২০] এজন্য প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ডকরা বক্তৃতার ক্যাসেট গোলক মজুমদারের কাছে দেওয়া হয়। ভাষণ প্রচারের আগে তাজউদ্দীনের সাথে শেখ মণির একান্ত বৈঠক হয় এবং বৈঠক শেষে তিনি (তাজউদ্দীন আহমদ) ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলামকে ডেকে বলেন এখন সরকার গঠনে মণি রাজি নন। আগরতলা গিয়ে দলীয় এমপি, এমএনএ ও নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক শেষে শেখ মণি সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছেন।[২১] তখন তাজউদ্দীন আহমেদ ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলামকে বলেন যেন গোলক মজুমদারকে জানিয়ে দেওয়া হয় আজ বক্তৃতা প্রচার না করার জন্য। বক্তৃতা প্রচার হবে না একথা ফোনে শুনে গোলক মজুমদার যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, বিলম্ব করা কি ঠিক হবে? এবং এটাও জানিয়ে দিলেন যে, ইতোমধ্যে রেকর্ড করা ক্যাসেট নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে গেছে।[২২] ক্যাসেট পাঠিয়ে দেওয়ার কথা শুনে ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম সিদ্ধান্ত দিলেন, তাহলে প্রচার করে দিন। এ প্রসঙ্গে তিনি সাক্ষাৎকারে বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত এককভাবে নিয়েছিলাম।"[২৩] অবশেষে ঐদিন রাত সাড়ে নয়টায় তাজউদ্দীন আহমদের কণ্ঠে বাংলাদেশ সরকার গঠন সংক্রান্ত ভাষণটি আকাশবাণীর একটি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। এই ভাষণটি পরে আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ১১ই এপ্রিল পুনঃপ্রচার করা হয়।[২৪]

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করার মাধ্যমে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ঘোষণাপূর্বক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করেন এবং বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে একটি বৈধ সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার প্রক্রিয়া শুরু করে। এভাবেই ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার পর ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় যার শপথ গ্রহণ ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে গণপরিষদ সদস্য অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নামকরণ হয় মুজিবনগর। মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বাইরে থেকে পরিচালিত হয়েছিল বলে এ সরকার প্রবাসী মুজিবনগর সরকার হিসেবেও খ্যাত।[২৫] মুজিবনগর সরকারই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার। মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাইকোলজিকাল ওয়ারফেয়ারের প্রধান যাহিদ হোসেন মুজিবনগর সরকারের গঠন ও গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর এক লেখায় লেখেন,

> পাকবাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা এবং দেশব্যাপী ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠনের আর একটি বিশেষ দিক ছিল এই কারণে যে জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা যদি সরকার গঠিত না হতো তাহলে দেশব্যাপী বিচ্ছিন্নভাবে গঠিত

---

[২০] তদেব, পৃ. ২৮১।

[২১] ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ পঞ্চদশ খণ্ড*, পৃ. ১১৩-১১৪।

[২২] তদেব, পৃ. ১১৪।

[২৩] তদেব।

[২৪] কামাল হোসেন, *তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, পৃ. ২৮২।

[২৫] *বাংলাপিডিয়া*, "মুজিবনগর সরকার" ভুক্তি, http://bn.banglapedia.org/index.php?title= প্রেক্ষণঃ ২৮ মে ২০১৭ ।

> মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে দিতো কারা? একটি স্বীকৃত এবং আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য সরকার গঠিত না হলে পাকিস্তানিরা এমনি একটা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী চরমপন্থী প্রভৃতি নামে অভিহিত করে দুনিয়াব্যাপী প্রচার প্রচারণা চালাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করত না। তাতে মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটা হ্রাস পেত।[২৬]

৩. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের গুরুত্ব

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ ঘোষণা মুজিবনগর সরকার পরিচালনার অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে কার্যকর। এমনকি ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সংবিধান প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ঘোষণা দেশের সংবিধান হিসাবে কার্যকর বলে গণ্য করা হয়। অষ্টম সংশোধনী মামলায় [আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ ৪১ ডিএলআর ১৯৮৯ (এডি) ১৬৫] মুজিবনগর সরকার কর্তৃক গৃহীত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের মূল সূচনা (Genesis of the constitution) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।[২৭] তাজউদ্দীন আহমদের মৌলিক কিছু নির্দেশনার ভিত্তিতে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি রচনা করেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম তাঁর এক লেখায় বলেন,

> সবচেয়ে বড় কাজ হলো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করা। আমি আর তাজউদ্দীন ভাই যে ঘরে থাকতাম, সে ঘরের এক কোনায় টেবিল ল্যাম্পের আলোয় লেখার কাজ করি। আমার কাছে কোনো বই নেই, নেই অন্য দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো কপি। তারপরও লিখতে হবে। আমেরিকার ইনডিপেনডেন্স বিল অনেক আগে পড়েছিলাম। ভাষা বা ফর্ম কিছুই মনে নাই। তবে বেশি কিছু মনে করবার চেষ্টা করলাম না। শুধু মনে করলাম, কী কী পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার রয়েছে। এমনি চিন্তা করে ঘোষণাপত্রের একটা খসড়া তৈরি করলাম। স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনা করার পর তা তাজউদ্দীন ভাইকে দেখালাম। তিনি পছন্দ করলেন।[২৮]

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারির মাধ্যমে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ এবং একটি সরকার গঠনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সম্পর্কিত বিবেচনা করে তাজউদ্দীন আহমদ তা কোনো একজন খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদকে দিয়ে দেখিয়ে নিতে বলেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি কলকাতার প্রখ্যাত ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরীকে দেখালে তিনি এটিকে যথার্থ ও অপরিবর্তনীয় বলে উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম তাঁর এক লেখায় বলেন,

> আমি বললাম, সকলে আমরা এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ। এই দলিলের খসড়াটি কোনো একজন বিজ্ঞ আইনজীবীকে দেখাতে পারলে ভালো হতো। সুব্রত রায় চৌধুরীর বাসায় পৌঁছে তাঁকে আমার প্রণীত ঘোষণাপত্র দেখালাম। খসড়াটি দেখে তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, একটা কমা বা সেমিকোলন বদলানোর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, বাংলাদেশের

---

[২৬] যাহিদ হোসেন, "মুজিবনগর সরকার গঠন গুরুত্ব ও তাৎপর্য," চতুরঙ্গ বিভাগ, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৭ এপ্রিল ২০১১।

[২৭] *বাংলাপিডিয়া*, "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" ভুক্তি, http://bn.banglapedia.org/index.php, প্রেক্ষণ: ২৮ মে ২০১৭।

[২৮] এম. আমীর-উল ইসলাম, "ইতিহাস গড়া সেই দিন"।

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে আইনানুগ অধিকার, তা মানবাধিকারের অংশ। এই কথা স্বাধীনতার সনদে ফুটে উঠেছে। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর বই লিখেন। তাঁর রচিত বইটির নাম হচ্ছে 'Genesis of Bangladesh'।[২৯]

আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৭৭৪ সালে আমেরিকাতে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই 'Declaration of Independence' নামক সনদ ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। আমেরিকার স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার পর বাংলাদেশ ব্যতীত আর কোথাও অনুরূপ ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে একটি বৈধ সরকার গঠন করে স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত হবার ঘটনা দেখা যায় না।[৩০] স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেই বলা হয় কোন ক্ষমতাবলে এবং প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন, কোন ক্ষমতাবলে একটি গণপরিষদ গঠন করে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করা হলো তাও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেই উল্লিখিত আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি তারও উল্লেখ রয়েছে এ অনন্য সাংবিধানিক দলিলে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আলোকেই আমরা এই বিষয়গুলি আলোচনা করে দেখতে পারি।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে (অনূদিত) স্পষ্টভাবে বলা আছে –

> যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন, এবং যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন, এবং যেহেতু এই আহুত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়, এবং যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশ মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, এবং যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যদের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজীরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে, এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে

---

[২৯] এম. আমীর-উল ইসলাম, "বাংলাদেশ সরকারের শপথ ফিরে দেখা" সম্পাদকীয় ও মন্তব্য বিভাগ, *দৈনিক সমকাল*, ১৭ এপ্রিল ২০১৪।

[৩০] কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর, পৃ. ২৮৮-২৮৯।

যথাযথভাবে একটি গণপরিষদ গঠন করিলাম এবং পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম।[৩১]

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আরো স্পষ্টভাবে বলা আছে –

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।[৩২]

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আরো বলা হয় –

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।[৩৩]

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আরো বলা হয়–

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।[৩৪]

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনন্য একটি সাংবিধানিক দলিল যা ১৯৭১ সনের ৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে। এই দলিল যেমন মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তেমনি এর মাধ্যমে সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে সরকারের ক্ষমতাও প্রযুক্ত হয়েছে। একটি জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার তা হলো – বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে স্বাধীন হবার পর নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা যুদ্ধে বিজয় লাভ করি এবং ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়। ফলে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে সংবিধান প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হতে আহরিত বা আহরিত হলে বিবেচিত কতৃত্বের অধীনে যেমন আইন প্রণীত হয়েছে তেমনি ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রই এ সময়কালে ছিল আইন প্রণয়ন ও ক্ষমতার উৎস। সংবিধান প্রণীত হওয়ার শুরু থেকেই সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই সংবিধানের অন্য যে কোনো বিধান সত্ত্বেও চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলি ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি হিসেবে বিবেচিত হবে। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রবর্তিত মূল সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি সংক্রান্ত ১৫০ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ ৩(১) অনুযায়ী ধারাবাহিকতা-রক্ষা ও অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয় যে,

---

[৩১] ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারেরর জারীকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ, সপ্তম তফসিল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত অক্টোবর ২০১১, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

[৩২] তদেব, পৃ. ১৫৫।

[৩৩] তদেব, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

[৩৪] তদেব, পৃ. ১৫৬।

> ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত সকল আইন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা যে কোনো আইন হতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত কর্তৃত্বের অধীন অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা বা কৃত সকল কার্য এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং তাহা আইনানুযায়ী যথার্থভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।

অর্থাৎ সংবিধানের শুরু থেকেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ। পরবর্তীতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি (অনূদিত) সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, বিএনপি সরকারের বিভিন্ন সময়ে যে সংবিধান অনুসরণ করা হয়েছে সেখানেও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই বলবৎ ছিল এবং সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদে চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন বিধানাবলিকে সাংবিধানিক অনুমোদন প্রদান করে এই ঘোষণাকে সাংবিধানিক মৌলিকত্ব দেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন-২০১১ এর ৫০ ধারা বলে ১৫০ অনুচ্ছেদটিকে নতুনভাবে প্রতিস্থাপিত করে এবং যেটি এখন পরিবর্তিতরূপে বর্তমান সংবিধানে বহাল রয়েছে। বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(১) এ বলা হয়েছে যে, 'এই সংবিধানের অন্যকোনো বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তনকালে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলি ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি হিসেবে কার্যকর থাকবে।' সংবিধানের ১৫০(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে –

> ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ হইতে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এই সংবিধান প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ, ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হইলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল, যাহা উক্ত সময়ের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি বলিয়া গণ্য হইবে।

সংবিধানের এই সংশোধন অনুযায়ী বর্তমান সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি সংক্রান্ত ১৫০ (১) অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ ৩(১) অনুযায়ী ধারাবাহিকতা-রক্ষা ও অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের উল্লেখ আছে এবং সপ্তম তফসিলে ১৫০(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত) সন্নিবেশিত আছে। সংবিধানের সপ্তম তফসিলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে।

আমাদের পবিত্র সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতার ঘোষক এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাকে অনুমোদন করার পরও বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর পুত্র তারেক রহমানসহ কিছু জ্ঞানপাপী জিয়াউর রহমানকে কখনও স্বাধীনতার ঘোষক আবার কখনও প্রথম রাষ্ট্রপতি দাবি করে সংবিধানের প্রতি চরম অবমাননা ও অবজ্ঞা প্রদান করছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিভ্রান্তির বীজ বপনের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। বিএনপির এ ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে এবং মুক্তিযুদ্ধের শাশ্বত সত্য ইতিহাসকে বিকৃত করতে ২০০৪ সালে বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট সরকার *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস: দলিলপত্র* গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর পরিবর্তে জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ করেছিল। তখন জোট সরকারের এই ইতিহাস বিকৃতির

রুদ্ধে উচ্চতর আদালতে জনস্বার্থে মামলা হলে ২১ জুন ২০০৯ তারিখে বিচারপতি এ.বি.এম. য়রুল হক ও বিচারপতি মমতাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ স্বাধীনতার ষণাপত্রের সাংবিধানিক মৌলিকত্ব তুলে ধরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধীনতার ঘোষক হিসেবে রায় দিয়ে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই রায়ের ধ্যমে ২০০৪ সালে *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস: দলিলপত্র* গ্রন্থের ৩য় খণ্ড আইন ও ংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করে বাতিল করা হয়। রায়ে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ২৬শে মার্চ প্রত্যুষে ঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা আছে। সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ তুর্থ তফসিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন বিধানাবলিকে সাংবিধানিক অনুমোদন প্রদান করায় স্বাধীনতা ষণাপত্র সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

. মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ

৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১০ই এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের থম সরকার সরকার গঠিত যা শপথের দিন থেকে মুজিবনগর সরকার হিসেবে অভিহিত হয়। ১১ প্রিল রাতে আগরতলা সার্কিট হাউসে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ ঠকে বসেন। তিনি সফল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে কলকাতা ও দিল্লীতে যে সকল সিদ্ধান্ত য়েছিলেন সেগুলো অনেক আলোচনা ও শলা-পরামর্শের পর আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রভাবশালী দস্যগণ কতৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম তাঁর এক লেখায় খেন 'স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলায় অনুষ্ঠিত বৈঠককে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের থম বৈঠক বলা যেতে পারে। তাজউদ্দীন ভাই ও আমার প্রচেষ্টায় যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল ঠকে সবগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়।'[৩৫] ১১ই এপ্রিল আগরতলায় কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গণি সমানীকে পেয়ে তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে তিনি তাতে সম্মতি দন। পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে এই সরকারের শপথ অনষ্ঠানের বিষয়টি বেচনায় রেখে ১৪ই এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় তা সম্পন্ন করার একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৩৬] চুয়াডাঙ্গাকে াংলাদেশ সরকারের রাজধানী করার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ১৩ই এপ্রিল পাকিস্তান বাহিনী য়াডাঙ্গায় হামলা চালায়। এতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি বিলম্বিত য়।[৩৭] বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলের চুয়াডাঙ্গাকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী করা এবং এখানে রকারের শপথ গ্রহনের বিষয়টি ইতিহাসের নানা উপাত্ত থেকেও প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীন বাংলা বেতার কন্দ্রের খবরেও চুয়াডাঙ্গাকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী বলে উল্লেখ করা হয়। ১৪ই এপ্রিল য়াদিল্লী থেকে UPI পরিবেশিত খবরে বলা হয় –

> The Proclamation, broadcast by the rebel Free Bengal Radio and monitored here said the capital of Bangladesh (Bengali Nation) government would be Chuadanga, a small town 10 miles from the boarder with India. [৩৮]

---

[৩৫] এম. আমীর-উল ইসলাম, মুজিবনগর সরকার ও কিছু স্মৃতি, চতুরঙ্গ বিভাগ, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসে বিশেষ য়োজন, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৭ এপ্রিল ২০১০।

[৩৬] কামাল হোসেন, *তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, পৃ. ২৮৪।

[৩৭] তদেব, পৃ. ২৮৫।

[৩৮] রাজিব আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর দলিল ও ইতিহাস*, পৃ. ১৩২ ।

চুয়াডাঙ্গাকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী করার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে কুষ্টিয়ার ইতিহাস গবেষক শ. ম. শওকত আলী সাপ্তাহিক বিচিত্রায় লিখেছেন – 'চুয়াডাঙ্গাকে অস্থায়ী রাজধানী করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।'[৩৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, কুষ্টিয়া-তে স্বাধীনতা সংগ্রামে চুয়াডাঙ্গার ভূমিকা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয় – 'চুয়াডাঙ্গাকে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী বলে ঘোষিত হলে শুরু হয় হানাদার বাহিনীর বিমান হামলা।'[৪০] চুয়াডাঙ্গাকে রাজধানী করার সিদ্ধান্তটি গোপন না থাকায় এবং সেখানে হানাদার বাহিনীর বিমান হামলা পরিচালিত হওয়ায় পরবর্তীতে কবে কোথায় হবে তা গোপন রেখে সরকারেরর শপথ গ্রহণের অন্যান্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার দিকে জোর দেওয়া হয়। শপথ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি তৈরি করার সময়ে জানা গেলো সেনাপ্রধান ওসমানীর সামরিক পোশাক নেই। কিন্তু শপথ অনুষ্ঠানের জন্য তার সামরিক পোশাক প্রয়োজন। সেই রাতে কাপড় কিনে, দর্জি ডেকে তাঁর জন্য পোশাক তৈরি করা হলো।[৪১] প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে অবশেষে ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সকাল এগারটায় পূর্বনির্ধারিত স্থান মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা নামক বৃক্ষরাজি ঢাকা ছায়াসুনিবিড় একটি গ্রামে নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জায়গাটির নাম শপথ গ্রহণের আগের দিনও সাংবাদিকদের নিকট অজানা ছিল। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম তাঁর এক লেখায় লেখেন –

> শপথ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের হাজির করার ভার ছিলো আমার ও আব্দুল মান্নানের উপর। ১৬ এপ্রিল আমরা দুজনে কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। এই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দুজন প্রতিনিধি বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হই। সমস্ত প্রেসক্লাবে লোকে লোকারণ্য। ক্লাবের সেক্রেটারি উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদের প্রথম অনুরোধ জানাই, আমাদের উপস্থিতির কথা গোপন রাখতে হবে। সমবেত সাংবাদিকদের পরদিন ১৭ই এপ্রিল কাকডাকা ভোরে এই প্রেসক্লাবে হাজির থাকতে অনুরোধ জানাই। বললাম, তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের একটি বিশেষ বার্তা দেওয়া হবে। সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্য আমাদের গাড়ী তৈরি থাকবে বলেও জানালাম। ভোরে জানানো হয় স্বাধীন বাংলার মাঠিতে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করবেন।[৪২]

মুক্ত আকাশের নীচে চৌকি পেতে করা হয়েছিল শপথ মঞ্চ। মঞ্চের উপর সাজানো ছিলো ছয়খানা চেয়ার। শপথ অনুষ্ঠানের প্রবেশ পথে বাংলা লেখা স্বাগতম।[৪৩] গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের পাপড়ি আলিঙ্গন করে মঞ্চে উঠে আসন গ্রহণ করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এএইচএম কামারুজ্জামান, জনাব এম. মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও কর্নেল এমএজি ওসমানী। গৌরীনগরের বাকের আলীর পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বাইবেল পাঠ করেন পিন্টু বিশ্বাস ও ত্রিপিটক পাঠ করেন ননীগোপাল ভট্টাচার্য।[৪৪] পবিত্র কোরান তেলাওয়াত এবং বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠের পর জাতীয় গণপরিষদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগের চীফ হুইপ অধ্যাপক এম

---

[৩৯] তদেব ।

[৪০] তদেব ।

[৪১] এম. আমীর-উল ইসলাম, "ইতিহাস গড়া সেই দিন"।

[৪২] এম. আমীর-উল ইসলাম, "বাংলাদেশ সরকারের শপথ ফিরে দেখা" ।

[৪৩] মো. মজিবুর রহমান, "মুজিবনগর সরকার, স্বাধীন বাংলাদেশর প্রথম সরকার", উপসম্পাদকীয় বিভাগ, *দৈনিক সংবাদ*, ১৭ এপ্রিল ২০১৪ ।

[৪৪] রাজিব আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর দলিল ও ইতিহাস*, পৃ. ১৬০।

ইউসুফ আলী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার সবুজ বৃক্ষরাজি ঘেরা মুক্ত মাটিতে দেশি-বিদেশি শতাধিক সাংবাদিক ও সমবেত স্বাধীনতাকামী কয়েক হাজার জনতার সামনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এরপর তিনি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শপথবাক্য পাঠ করান। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরকারের মন্ত্রীসভার শপথ পাঠ করান। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তাজউদ্দীন আহমদ এবং মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন জনাব এম. মনসুর আলী (অর্থমন্ত্রী), এএইচএম কামারুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র, ত্রান ও পুনর্বাসন মন্ত্রী) এবং খন্দকার মোশতাক আহমদ (পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী)। মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্নেল এমএজি ওসমানী এবং সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ পদে কর্নেল আব্দুর রবের নাম ঘোষণা করা হয়। মাহবুব উদ্দিন ও তওফিক আলী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে সাথে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।[৪৫] শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার লোক যোগ দেয় যাদের হাজারো কণ্ঠে উচ্চারিত জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ইত্যাদি শ্লোগানে বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।[৪৬] আব্দুল মান্নান এমএনএ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। মুজিবনগর সরকারের গার্ড অব অনার প্রসঙ্গে এক স্মৃতিচারণমূলক লেখায় মাহবুব উদ্দিন বীরবিক্রম লিখেন –

> মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার প্রদান করার কথা ছিল ইপিআরের সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরীর। অজ্ঞাত কারণে তিনি সেখানে উপস্থিত হতে পারেননি। এরই মাঝে এক ফাঁকে বন্ধু তৌফিক এসে বললো "ওসমান ভাই আসার কথা ছিল, উনিতো এলেন না, এবার গার্ড অব অনার কিভাবে দেওয়া যায় চিন্তা কর" আমি তাকে বললাম, তুমি কোন চিন্তা করো না, আমি একজন পুলিশ অফিসার, জীবনে বহুবার গার্ড অব অনার নিয়েছি গার্ড অব অনার দিয়েছি। আমি এখনই ব্যবস্থা করছি।[৪৭]

শপথ গ্রহণের শেষ পর্যায়ে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে শুরু হয় বক্তৃতা পর্ব। প্রথমেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ উপস্থিত দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, সুধী ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রায় ৩০ মিনিটব্যাপী এক আবেগময়ী ভাষণ দেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, নিপীড়ন আর নির্যাতনের ফলে কেন বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন –

> তাঁদের বোঝা উচিত যে, পাকিস্তান আজ মৃত এবং ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের হত্যাকারী- স্বাধীন বাংলাদেশে আজ এটা বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি সন্তান রক্ত দিয়ে এই নতুন শিশু-রাষ্ট্রকে লালিত পালিত করছেন।[৪৮]

বক্তৃতাপর্বে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম তার ভাষণে বলেন –

---

[৪৫] তদেব. পৃ. ১৬০।

[৪৬] ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: পঞ্চদশ খণ্ড*, পৃ. ১২২।

[৪৭] মাহবুব উদ্দিন বীরবিক্রম, মুজিবনগরে সেদিন, চতুরঙ্গ বিভাগ, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৭ এপ্রিল ২০১১।

[৪৮] রাজিব আহমেদ, *তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, পৃ. ১৭৩।

> আজ এই আম্র কাননে একটি নতুন জাতি জন্ম নিল। পৃথিবীর মানচিত্রে আজ নতুন রাষ্ট্রের সূচনা হলো তা চিরদিন থাকবে।[৪৯]

মুক্তিযুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করতে শপথগ্রহণ শেষে তাজউদ্দীন আহমেদ বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করেন মুজিবনগর। তখন থেকে সরকারেরও নামকরণ হয়ে যায় মুজিবনগর সরকার। এই সরকারের অধীনেই সফলভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি বিজয়ের স্বাদ পায়। ১৯৭১ সালেরর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল বাংলাদেশের রাজধানী। এভাবেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে যুক্ত হয়। মুজিবনগর সরকার গঠনে সেদিন তাজউদ্দীনের ভূমিকা বাঙালির ইতিহাসে শুধু প্রশংসিতই হয়নি, একজন নেতা হিসেবে তাঁর বিচক্ষণতার এক অনন্য নজির বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছে। এ প্রসঙ্গে সরদার সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন –

> বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া মুজিবনগর সরকার গঠনের তাজউদ্দীনের এই সিদ্ধান্ত বিচক্ষণতার এক নজির হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসে ভাস্কর। ধীরস্থির, প্রবল ধৈর্য সহ্য দিয়ে একটি পুর্ণাঙ্গ সরকার চালানো, বিশ্ব জনমত সৃষ্টি, বিশেষ দূত প্রেরণ, মোশতাকদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সত্ত্বেও সেই পরীক্ষায় তাজউদ্দীনের স্কোর ছিলো সর্বোচ্চ।[৫০]

৫. উপসংহার

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মুক্তিযুদ্ধের অনন্য সাংবিধানিক দলিল যা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুজিবনগর সরকার পরিচালনায় অন্তর্বর্তী কালীন সংবিধান হিসেবে কার্যকর। একটি বৈধ সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আলোকে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় এই সরকারের শপথ যা ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার নামে খ্যাত। মুজিবনগর সরকারের অসাধারণ দেশপ্রেম, প্রবল কর্মদক্ষতা ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে ব্যাপক সফলতা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করে। এই মুজিবনগর সরকারের অধীনেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত আর দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। এটা চিরসত্য ও প্রতিষ্ঠিত যে মুজিবনগর সরকারই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সরকার এবং বাঙালি জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পড়লে এবং প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারলে যে কেউ সহজে বুঝতে পারবেন কেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির পিতা এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মতো মুক্তিযুদ্ধের একটি অনন্য সাংবিধানিক দলিলকে আমাদের স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। পাশাপাশি মুজিবনগর সরকারের ইতিহাস ও তাৎপর্যের বিষয়টিও সরকারি প্রচারমাধ্যম ও প্রকাশনার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে আরো বেশি করে উপস্থাপিত হওয়া দরকার। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তা হলো বাংলাদেশের প্রথম সরকার হিসেবে স্বীকৃত মুজিবনগরের মতো একটি সাংবিধানিক সরকার নিয়ে এবং আইনগতভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে কোনো ধরনের বিতর্কের অবতারণা না করা।

---

[৪৯] মো. মজিবুর রহমান, "মুজিবনগর সরকার, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার।"

[৫০] সরদার সিরাজুল ইসলাম, "দুর্দিনের প্রধানমন্ত্রী এলেন, জয় করলেন, নীরবে চলে গেলেন," মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন, চতুরঙ্গ বিভাগ, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৭ এপ্রিল ২০১২।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী : ভারতীয় প্রতিক্রিয়া

দিব্যদ্যুতি সরকার*

Abstract: India was main associating country in the Liberation War of Bangladesh. Enormous types of reactions were originated there regarding the Liberation War as well as refugees. The central and provincial government, the political parties and the Indian intelligentsia have their own opinions and views. These opinions and reactions regulate the Indian policy to some extent about Bangladesh war. So it is important to examine different types of reactions being originated in India during 1971 to understand the key regulators of Indian policy on Bangladesh. This article deals with that.

ূমিকা

াংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সহায়তাকারী রাষ্ট্র ছিল ভারত। কিন্তু এই সহায়তা প্রদানের প্রকৃতি ও ক্রিয়া একরৈখিক ছিল না। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকারসমূহ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলাদেশ-যুদ্ধ সম্পর্কে নানা অভিমত ছিল। এই যুদ্ধের বিভিন্ন অনুষঙ্গ ম্পর্কেও ছিল নানা প্রতিক্রিয়া। যেমন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরে সেখানে যেমন তিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পরে সে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন উপাদান যুক্ত ও বিযুক্ত হয়েছিল। আবার মুক্তিযুদ্ধের সূচনা কালের প্রতিক্রিয়া ও পরবর্তী কালের প্রতিক্রিয়াও অভিন্ন ছিল না। ভারত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন পর্যায়ের এইসব প্রতিক্রিয়া থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ব্যাপারে রাষ্ট্রটির অবস্থান এবং সেই অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী সমস্যার ব্যাপারে ভারতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ারতের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া

৫শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে সেনা অভিযান শুরু করলে পূর্ব াকিস্তানের ব্যাপারে ভারতের প্রতিক্রিয়া জানানোর পটভূমি সৃষ্টি হয়। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, বিভিন্ন মিডিয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে সেনা অভিযানের বিস্তারিত খবর ভারত পেয়ে থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতের প্রথম 'অফিসিয়াল বিবৃতি' দেন দেশটির তৎকালীন রাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী সরদার শরণ সিং (১৯০৭–১৯৯৪)। ২৭শে মার্চ পার্লামেন্টে দেওয়া সংক্ষিপ্ত এক বিবৃতিতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে 'উদ্বেগ' প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর এই কূটনৈতিক 'উদ্বেগ' থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকাশ পায় না।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ স্টাডিজ বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতের পক্ষ থেকে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানা যায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর (১৯১৭–১৯৮৪) বক্তব্যে। ২৭শে মার্চ তারিখে পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে নতুন কিছু ঘটে চলেছে', যা 'ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ'। পার্লামেন্টকে তিনি এই বলে নিশ্চয়তা দেন যে, ঘটনার উপর নিবিড় নজর রাখা হয়েছে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং ৩১শে মার্চ তারিখে পার্লামেন্টে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবটিতে 'পূর্ব বাংলার' সাড়ে সাত কোটি মানুষের 'ঐতিহাসিক জাগরণের' বিজয় হবে বলে প্রত্যয় প্রকাশ করা হয়।[১] ২৭ থেকে ৩১শে মার্চ মাত্র এই চার দিনের মধ্যে ভারতীয় বিবৃতিতে অফিসিয়াল চোখে পড়বার মতো যে পরিবর্তন, তা হলো, ২৭শে মার্চ তারিখের বিবৃতিতে ব্যবহৃত 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি ৩১শে মার্চের বিবৃতিতে 'পূর্ব বাংলা' হয়ে যায়। অর্থাৎ অঞ্চলটির সাথে পাকিস্তানের কোনো রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক আর থাকলো না, এমন ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট। পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি পরিত্যাগ করায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের কাছেও এর একরকম মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ছিল। এরপর ভারতের কোনো অফিসিয়াল বিবৃতিতে আর পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি, প্রথমদিকে সর্বত্রই 'পূর্ব বাংলা' এবং ক্রমান্বয়ে তা 'বাংলা দেশ' বা 'বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে ২৭শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে যে আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি পার্লামেন্টারিয়ানদের বাঁধভাঙা আবেগ ও পাকিস্তান বিরোধিতা প্রকাশ পায়। তবে ভারত সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এই আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। বরং শুরু থেকে পূর্ব পাকিস্তান সংকটে সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে ভারত সংযম ও সাবধানতা দেখায়। ২৭শে মার্চ রাজ্যসভায় যে বিতর্ক চলছিল সেখানে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের বক্তব্যের মধ্যে আবেগ ও উৎসাহের আতিশয্য দেখে ইন্দিরা গান্ধী সংসদীয় এই আলোচনার মাঝখানে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এ সময় তিনি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন। পার্লামেন্টারিয়ানদের একপ্রকার সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন:

> ... আমাদের হৃদয় যতোই বিশাল হোক না কেনো, যতো প্রগাঢ়ভাবেই আমরা সেখানকার [পূর্ব পাকিস্তানের] মানুষগুলোর দুঃখ-কষ্টের অংশভাগী হই না কেন, পার্লামেন্টের সদস্যরা যে ভাষায় কথা বলছেন সেই একই ভাষায় সরকারের পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এই কারণে যে, আমরা এই সময়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। একই সাথে এই পরিস্থিতির সেই বিপদজনক দিক সম্পর্কেও আমরা সজাগ যেখানে একটি ভুল পদক্ষেপ, একটি ভুল শব্দ প্রয়োগ—আমরা সবাই যা আশা করছি, তা থেকে—সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। ...আমাদের আন্তর্জাতিক রীতিনীতির মধ্যে থেকেই যা করার করতে হবে।[২]

---

[১] Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism* (Dhaka: UPL, 1994), p. 274.

[২] মূল টেক্সট এরকম: "... however heavy our hearts may be, however deeply we may be sharing the agony of the people there, it is not possible for the Government to speak in the same words as hon. members can do. In fact, it is because we are so deeply conscious of the historic importance of this moment that we are, at the same time, aware of the seriousness of the situation when a wrong step, a wrong word, can have an effect entirely different from the one which we all just intend. ...we have to act within international norms." দেখুন, *Bangla Desh Documents*, vol. 1 (New Delhi: Ministry of External Affairs, India, 1972), p. 670.

সংকট শুরুর মাত্র এক দিনের মাথায় পার্লামেন্টেরিয়ানদের আবেগের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর এই ক্তব্য ছিল একটি দিক নির্দেশনার মতো। এখানে অবিবেচনা ও আবেগপ্রসূত যে কোনো পদক্ষেপ হণ বা ভাষ্য প্রদানের বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ম্ভাব্য অভিঘাত মোকাবেলা করার কৌশল ও দূরদর্শিতার ইঙ্গিত রয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শুরু থেকে ভারতের কয়েকটি প্রাদেশিক বিধান সভায়ও এ ্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ২৯শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে অন্তত তিনটি বিধান সভায় এ ্যাপারে আলোচনা হয়। এর মধ্যে রাজস্থান বিধান সভা পাকিস্তানি সৈন্যদের গণহত্যার জন্য 'গভীর দ্বেগ' প্রকাশ করে। মহারাষ্ট্র বিধান সভায় ঐ দিন বাংলাদেশ বিষয়ে একটি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপিত য় (বিধান সভার স্পিকার অবশ্য প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন)। অন্যদিকে ঐ দিনই উত্তর প্রদেশের ধান সভা সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য কেন্দ্রীয় রকারকে অনুরোধ জানায়।[৩] অথচ, মুক্তিযুদ্ধের এই পর্যায়ে বাংলাদেশে তখন কোনো সরকার গঠিত য়নি; একটি বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়েছে বলে কিছু কৌশলগত প্রচারণা মাত্র ছিল। বাংলাদেশের তিনিধিত্বশীল কোনো মহল থেকে স্বীকৃতি প্রদানের কোনো আনুষ্ঠানিক অনুরোধও জানানো হয়নি। ল্লেখ্য, এই তিনটি রাজ্য ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ থেকে বেশ দূরে অবস্থিত ছিল। জাতিগত, ধর্মীয় া ঐতিহাসিক কোনোভাবেই এগুলো বাংলাদেশের সাথে তেমন সম্পৃক্ত ছিল না। সংকটের একেবারে াথমিক অবস্থায় তাদের এই প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়, অচিরেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি র্বভারতীয় পর্যায়ে ব্যাপক সমর্থন ও সহানুভূতি মিলবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রাদেশিক পর্যায়ে যে সব রাজ্য প্রতিক্রিয়া বা সমর্থন জ্ঞাপন করে, শ্চিমবঙ্গ তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মহল থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবি থম উত্থাপন করেন তৎকালীন প্রাদেশিক খাদ্যমন্ত্রী কে কে মৈত্র। ১৮ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে এক াংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রধান চারটি শর্ত—জনগোষ্ঠী, ূ-খণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব—এর সবগুলোই বাংলাদেশ পূরণ করেছে। তিনি যুক্তি দেখান যে, ারত যদি স্বীকৃতি প্রদানে বিলম্ব করে ফেলে এবং বাংলাদেশে যদি গণহত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত াকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থারও চরম অবনতি ঘটবে।[৪]

রাজ্যগুলোর এই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রথম থকেই তাদের সমর্থন ছিল। পাকিস্তান ভেঙে যাবে বা অন্তত পক্ষে ভেঙে যাওয়ার একটি উপলক্ষ তৈরি য়েছে—এই সাধারণ আকাঙ্ক্ষা ও ধারণা থেকে রাজ্যসমূহ বাংলাদেশের প্রতি তাদের প্রাথমিক সমর্থন প্রকাশ করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালায়, ভারতীয় গণমাধ্যমে তা গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ পাওয়ায় মানবিক একটি অনুভূতিও এই সমর্থন প্রকাশের পিছনে কাজ করেছিল। এছাড়া বাংলাভাষী মানুষ একটি নতুন দেশ গঠন করবে—পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার আবেগও কাজ করে থাকবে। তবে রাজ্যগুলোর এই সমর্থনের বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রথমত, প্রাথমিক পর্যায়ের এই জাতীয় সমর্থন ছিল অনেকটাই আবেগজাত ও তাৎক্ষণিক ধরনের; এর পিছনে না ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল ও সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতির যথাযথ বিশ্লেষণ, না ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে যথার্থভাবে সহায়তা করার ধরন ও এই ভূমিকায় ভারতের

---

[৩] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ১২শ খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ২১৯।

[৪] *দলিলপত্র*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২০।

সক্ষমতার বাস্তব বিশ্লেষণ। অবশ্য, রাজ্যগুলোর এই অবস্থানের ফলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা দানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাঁধা থেকে শুরুতেই অনেকটা মুক্ত থাকে। অপরদিকে রাজ্যস্তরের এই মনোভাবের কারণে সেখানে শরণার্থীদের আশ্রয় পাওয়ার পটভূমি সৃষ্টি হয়।

শরণার্থী প্রবাহ : সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহে প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের মক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার পর শুরু হয় এর দ্বিতীয় পর্যায়। সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহে শরণার্থী প্রবেশের হার বৃদ্ধি পাওয়ার পর থেকে এই পর্যায়ের শুরু হয়। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো এক নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়; আবেগনির্ভর সমর্থন বা নৈতিক সহানুভূতির পর্যায় থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রদানের প্রশ্নটি যখন একেবারে বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। শরণার্থী প্রবাহ শুরু হওয়া বা এর সম্ভাব্য ব্যাপকতা সম্পর্কে রাজ্যগুলোর কোনো পূর্বানুমান বা এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাদের কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। ফলে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয় রাজ্যের সার্বিক অবস্থার অবনতি হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় শ্রম, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন মন্ত্রী আর আর খালিদকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে ১৫ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে ২,৫৮,৭০০ জন শরণার্থী প্রবেশ করে বলে জানা যায়। এর মধ্যে ৮৯,৬০০ জন শরণার্থী শিবিরে এবং ১,৬৯,১০০ জন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি-সহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছিল।[৫] স্বভাবতই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়টি তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এছাড়া, শরণার্থীদের সাথে কোনো পাকিস্তানি গুপ্তচর ভারতে ঢুকে নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। খালিদকারের দেওয়া ভাষ্যে জানা যায় যে, শরণার্থীদের সাথে পাকিস্তানি চর যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছিল।[৬]

শরণার্থীদের ব্যাপক প্রবেশের কারণে ভারত কিছু সামাজিক ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির মধ্যে ছিল। বিশেষত, ভারতীয় নীতিনির্ধারক মহলে এই আশঙ্কা ছিল যে শরণার্থীদের সাথে পাকিস্তানি দুস্কৃতকারীরা ঢুকে পড়তে পারে এবং ভারতে নানারকম নাশকতার চেষ্টা করতে পারে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে আসাম প্রদেশে দুস্কৃতকারী ও পাকিস্তানি সমর্থকদের নাশকতার কিছু আলামতও পাওয়া যায়। ১৮ই জুন ১৯৭১ তারিখে সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া বক্তব্যে আসামের অর্থমন্ত্রী কে পি ত্রিপাঠী জানান যে, আসামে শরণার্থী প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু এলাকায় বাঙালি বিরোধী মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এমনকি এই ধরনের কিছু মানুষ একটি মিছিলে বাঙালি বিরোধী স্লোগানও দিয়েছে। ওই মিছিলে বাঙালি বিরোধী স্লোগানের পাশাপাশি 'ইয়াহিয়া খান জিন্দাবাদ'—এই স্লোগান ওঠায় এটিকে পাকিস্তানি চরদের কাজ বলে সন্দেহ করা হয়।[৭] পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে,

---

[৫] শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ৮৯,৬০০ জন শরণার্থীর রাজ্যভিত্তিক বিন্যাস ছিল এ রকম: পশ্চিমবঙ্গে–৬১,৮০০ জন, আসাম ও মেঘালয়ে ১০,৭০০ জন এবং ত্রিপুরায় ১৭,১০০ জন। অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে অবস্থানকারী ১,৬৯,১০০ জন শরণার্থীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১,৫১,৪০০ জন, আসাম ও মেঘালয়ে ৭,৭০০ জন এবং ত্রিপুরায় ১০,০০০ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল। দেখুন, *দলিলপত্র*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২৪।

[৬] *দলিলপত্র*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২৪।

[৭] *দলিলপত্র*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৯২।

াসামের মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করেন। ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী ন্দিরা গান্ধীর সাথে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, সন্দেহভাজন পাকিস্তানি চর ও ৎকৃতকারীরা আসামে সহিংস কার্যকলাপ চালাচ্ছে; সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করার জন্যও তারা চেষ্টা চালাচ্ছে। আগস্ট মাসে এই দুৎকৃতকারীরা কাছাড় জেলায় একটি ট্রেন ালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বলে তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায়। ইন্দিরা গান্ধীকে তিনি জানান, াসাম সরকার পঞ্চাশ জনেরও বেশি সন্দেহভাজন পাকিস্তানি চরকে আটক করেছে।[৮]

৫ই মে ১৯৭১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভার অধিবেশনে রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান ১৯০৫–১৯৭৮) ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়াই পশ্চিমবঙ্গ রকারের নীতি হবে। যদিও শরণার্থীদের অস্বাভাবিক আগমনের কারণে সেখানে খাদ্য সরবরাহে াটতি ও নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর পরদিন পশ্চিমবঙ্গের সরকার ও রোধী দল বাংলাদেশকে সমর্থনের ব্যাপারে একটি একক প্রস্তাবে সম্মত হয়। ৭ই মে মুখ্যমন্ত্রী জয়কুমার মুখার্জি (১৯০১–১৯৮৬) প্রস্তাবটি বিধান সভায় উত্থাপন করেন। সরকার ও বিরোধী ক্ষের ত্রিশ জনেরও বেশি সদস্য এই প্রস্তাবের উপর বিস্তারিত আলোচনা ও বিতর্ক করেন। উল্লেখ্য, শ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মধ্যে তখন ব্যাপক মতপার্থক্য ছিল। ৫ই মে ধান সভায় দেওয়া জ্যোতি বসুর ভাষণ থেকে এ ব্যাপারে জানা যায়। তিনি বলেন:

> ...বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চয় এটা জানেন যে, আমাদের এখানকার কি মতপার্থক্য আছে। এবং সেটা ভয়ংকর মতপার্থক্য। আমরা যারা বিরোধী দল এখানে আছি কংগ্রেস দলের সঙ্গে এবং তাঁদের যাঁরা সমর্থন করছেন তাঁদের সঙ্গে কোন বিষয়ে আমরা একমত নই। তথাপি এই বিষয়ে যা নিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে তা আমরা সকলেই সমর্থন করি।[৯]

রাজনৈতিক বিরোধ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের এই সম্মিলিত সমর্থন থেকে বাংলাদেশ আন্দোলনের ব্যাপারে এই রাজ্যের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। সরকার ও রোধী দল উভয় দিক থেকে বাংলাদেশের প্রতি এই সমর্থনের কারণে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এই াজ্যে সচিবালয় স্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল।

ভারত সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তেমন কানো চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহ থেকে বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় রকারকে যা অবহিত করা হয়েছে, তার অধিকাংশই শরণার্থী সংক্রান্ত। ৮ই মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গের হাকরণে ভারতের পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি রাজ্যের একটি সম্মিলিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী (১৯০৮–১৯৮২), বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরী ঠাকুর ১৯২৪–১৯৮৮), ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ (১৯০৭–২০০০), মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ইলিয়মসন সংমা (১৯১৯–১৯৯০) এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখার্জি। এই বৈঠকে তারা ম্মিলিতভাবে শরণার্থীদের ব্যাপারে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্তগুলো হলো:

১. শরণার্থী সমস্যাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সমস্যা হিসেবে না দেখে জাতীয় সমস্যা হিসেবে গণ্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হবে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে শরণার্থী পাঠিয়ে

---

[৮] *দলিলপত্র*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৯৫।

[৯] *পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যবিবরণী*, অন্ত., *দলিলপত্র*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২৯।

কয়েকটি রাজ্যের উপর সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক চাপ কমিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন জানানো হবে।

২. শরণার্থীদের ত্রাণ সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানাবেন।

৩. সীমান্ত নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কেন্দ্রের কাছে বর্ধিত বরাদ্দ চাওয়া হবে।

৪. শরণার্থীরা যাতে অবিলম্বে ফিরে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রকে অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে।[১০]

শরণার্থী সমস্যার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্যসমূহ তার অভ্যন্তরীণ শাসনে যথোচিত মনোযোগ দিতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অন্তত দুইটি রাজ্যের সরকার ভেঙে গিয়েছিল। এর একটি হলো পশ্চিমবঙ্গ এবং অপরটি ত্রিপুরা। পশ্চিমবঙ্গে তখন নকশালবাড়ি আন্দোলন তুঙ্গে; এর সাথে শরণার্থী সমস্যা যুক্ত হয়ে এমন অবস্থা তৈরি হয় যে, সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এ সময় খোদ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সরকারের পদত্যাগ দাবি করা হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে অজয় মুখার্জীর সরকার পদত্যাগ করে। রাজ্যপালকে লেখা এক পত্রে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পদত্যাগের কারণ জানিয়ে বলেন যে, "মূলত খুনোখুনি এবং শরণার্থী সমস্যার জন্য তাঁরা পদত্যাগ করেছেন।"[১১] এরপর থেকে রাজ্যটি রাষ্ট্রপতির শাসনাধীনে আনা হয়। একইভাবে শরণার্থী পরিস্থিতি এবং ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংকটের কারণে ১লা নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে ত্রিপুরার শচীন্দ্রলাল সিংহের সরকারও ভেঙে যায়। এরপর থেকে ঐ রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়।[১২] উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যই ছিল ভারতের সবচেয়ে শরণার্থী-বহুল এলাকা।

রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিক্রিয়া

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস পার্টি লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সংকট শুরু হয়েছিল। নির্বাচনে এই বিপুল বিজয়ের কারণে ইন্দিরা গান্ধী স্বভাবতই ছিলেন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং সরকারের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল একচ্ছত্র। বলা বাহুল্য, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের নীতি আর সরকারের নীতি ছিল অভিন্ন। সদ্য নির্বাচনী জয় এবং দলের উপর ইন্দিরা গান্ধীর একচ্ছত্র প্রভাবের কারণে দলের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ প্রশ্নে কোনো উল্লেখযোগ্য মতবিরোধ বা সংকট সৃষ্টি হয়নি। অন্যদিকে নির্বাচনী ভরাডুবির কারণে বিরোধী দলসমূহ ছিল স্বভাবতই হতোদ্যম; পার্লামেন্ট বা এর বাইরে সরকারের বিরোধিতা করার মতো রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও জনভিত্তি তাদের ছিল না। ফলে পার্লমেন্টে তাদের ভূমিকা ছিল রক্ষণাত্মক ধরনের, পার্লামেন্টের বাইরেও তাদের ভূমিকা ছিল মূলত বক্তব্য সর্বস্ব। সংকটের শুরু থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে 'ভারতের দুর্বল প্রতিক্রিয়ার' কারণে বিরোধী কিছু কিছু রাজনৈতিক দল ছিল সমালোচনায় সরব। তাদের যুক্তি ছিল, সরকারের

---

[১০] *দৈনিক আনন্দবাজার*, ৯ মে ১৯৭১।

[১১] *দেশ*, ৩৮ বর্ষ, সংখ্যা ৩৫, ৩ জুলাই ১৯৭১, পৃ. ৯৬৫, ৯৬৮।

[১২] ফজলুল বারী, *একাত্তরের আগরতলা* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৭), পৃ. ৬৫।

উচিত বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন দিয়ে সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করা।[১৩] বলা বাহুল্য, পূর্ব পাকিস্তানে সরাসরি হস্তক্ষেপ বা বাংলাদেশ সরকারকে সরাসরি সমর্থন দেওয়ার প্রশ্নটির সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনেকগুলো সমীকরণ যুক্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করার মতো সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল বহুমুখী আর্থিক, সামরিক ও কূটনৈতিক প্রস্তুতির। ফলে পূর্ব পাকিস্তান সংকটে ঐ সময়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য বিরোধী দলসমূহের যে উচ্চবাচ্য, তা ছিল নিছক রাজনৈতিক বক্তব্য; সংকটকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার যথার্থ কোনো নির্দেশনা তাতে ছিল না। ফলে বিরোধী দলসমূহ পূর্ব পাকিস্তান ইস্যুতে সরকারকে চাপে ফেলতে পারেনি। সরকারও তাদের এসব উত্তেজক বক্তব্যসমূহকে আমলে নেয়নি। অধিকন্তু, সরকার টিকে থাকার জন্য অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের মুখাপেক্ষীও ছিল না। ফলে বিরোধীদের সহজে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারের সমালোচনা করে। ২৫ ও ২৬ মে ভারতের লোকসভায় শরণার্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়, যেখান থেকে এসব রাজনৈতিক দলের শরণার্থী সংক্রান্ত অবস্থান জানা যায়। এই আলোচনায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী), প্রজা সোসালিস্ট পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস (বিরোধী), নির্দলীয় এবং কংগ্রেস (সরকারি)-এর পার্লামেন্টারিয়ানরা অংশ নেন। সংসদীয় এই বিতর্কে শরণার্থী প্রশ্নে ভারতের তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নানামুখী অবস্থান প্রকাশ পায়।

সংসদীয় এই বিতর্ক বা আলোচনার সূত্রপাত করেন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের এ কে সেন। তাঁর বক্তব্যে শরণার্থীদের প্রতি প্রবল আবেগ প্রকাশ পায়। শরণার্থী সমস্যাকে তিনি 'মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি' হিসেবে আখ্যা দিয়ে পার্লামেন্টের কাছে প্রশ্ন রাখেন, "আমরা লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য শরণার্থীদের জন্য আমাদের সহানুভূতি, সমর্থন ও ত্রাণ নিয়ে প্রস্তুত আছি—এটা বলাই কি যথেষ্ট? আমাদের ইতিহাস এবং অতীত ঐতিহ্যের সাথে এ রকম পরোক্ষ ভূমিকা মানানসই নয়।"[১৪] পাকিস্তানের গণহত্যা, শরণার্থী ঠেলে দেওয়া প্রভৃতি তৎপরতা ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক স্থায়িত্বকে দুর্বল করছে বলে মন্তব্য করে তিনি এই সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন। উড়িষ্যা প্রদেশ থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসের জে বি পাটনায়েক অবশ্য স্বীকৃতি প্রদানের এই বিষয়টি সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে তাঁর মত দেন। তিনি বলেন যে, সরকারই পরিস্থিতি মূল্যায়নের 'সবচেয়ে বড় বিচারক'।[১৫] সংকটের আগাগোড়াই ভারতের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের পার্লামেন্টারিয়ানরা মূলত তিনটি বিষয়ের উপর তাদের বক্তব্য কেন্দ্রীভূত করেন। এর প্রথমটি হলো শরণার্থীদের মানবিক তথা ত্রাণ সহায়তা প্রদান। অন্য দুইটি বিষয় হলো শরণার্থীদের পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর চাপ সৃষ্টি। কংগ্রেসের শরণার্থী নীতি ছিল সরকারের শরণার্থী নীতিরই প্রতিধ্বনি।

এ ব্যাপারে সরকারের সবচেয়ে বেশি সমালোচনা আসে বামপন্থী এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে। ২৫ ও ২৬শে মে তারিখের এই সংসদীয় বিতর্কে ত্রিপুরার সিপিএম সাংসদ দশরথ দেব ও পশ্চিমবঙ্গ সিপিআই-এর সাংসদ হীরেন এন মুখার্জী এই আলোচনায় অংশ নেন।

---

[১৩] Richard Sission & Leo E Rose, *War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh* (New Delhi: Vistaar Publications, 1990), p.149.

[১৪] *Lok Sabha Debate*, vol. 2, 25 May 1971, Col. 203.

[১৫] তাঁর নিজের ভাষায়, "...the best judge of the situation." *Lok Sabha Debate*, vol. 2, 25 May 1971, Col. 221.

দশরথ দেব মুক্তিযোদ্ধাদের বস্তুগত সাহায্য প্রদান করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধক্ষম করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি এবং শরণার্থী প্রবাহকে বন্ধ করা—এই দুইটি বিষয়কে সম্পর্কিত করে তিনি বলেন, "বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি ও তাদের বস্তুগত সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে যতোই বিলম্ব করা হবে, ততোই শরণার্থী প্রবাহ বেড়ে যাবে। এতে এই সমস্যার সমাধান না হয়ে বরং তা আরও প্রলম্বিত হতে থাকবে।"[১৬] শরণার্থীর প্রবাহ কমানোর জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করেন। সিপিআই-এর অপর সাংসদ হীরেন এন মুখার্জীর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধাবস্থায় স্বীকৃতি লাভের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন যে, আন্তর্জাতিক আইন স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় হতে পারে না।[১৭] পার্লামেন্টের বাইরেও সিপিএম শরণার্থী সমস্যার কারণে সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করে। ১৫–১৯ জুন ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত দলটির পলিটব্যুরোর সভায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ কর হয়, সেখানে বলা হয় যে, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি ও সমস্ত রকম সাহায্য দিতে ব্যর্থতার কারণে তাদের মুক্তিসংগ্রাম দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং এর ফলে বাংলাদেশ থেকে পঞ্চাশ লাখেরও বেশি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। ভারত সরকারকেই এই অবস্থার জন্য দায়ি করে সভায় প্রস্তাব পাস হয়।[১৮]

সরকারের সমালোচনায় ভারতের বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সিপিআই (এম) এবং সিপিআই (এমএল) ছিল অগ্রণী। সমগ্র ভারতে তাদের শক্তিশালী অবস্থান না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় তাদের জনভিত্তি ও সংগঠন ছিল শক্তিশালী। আবার এই দুটি রাজ্য শরণার্থী অধ্যুষিত হওয়ায় শরণার্থী সংক্রান্ত ইস্যুর সূত্র ধরে তাদের মধ্যে স্থানীয় রাজনীতিতে অবস্থান সংহত করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ী আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ত্রিপুরাতেও এই সশস্ত্র বামপন্থীদের বেশ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল। এই দুইটি রাজ্যেই কংগ্রেস ছিল ক্ষমতাসীন দল, যদিও সরকারের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা বামপন্থী দলসমূহের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে রাজনৈতিকভাবে এই দুটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার ছিল দুর্বল অবস্থানে এবং এই কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যত অক্ষম। শরণার্থী সমস্যা তাদের এই দুর্বলতাকে আরও বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে বামপন্থী দলগুলো এই সুযোগে প্রাদেশিক সরকারকে চাপে রেখে স্থানীয় রাজনীতিতে তাদের প্রভাবকে সংহত করার চেষ্টা করছিল। বামপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী অংশটির একটি নীতি ছিল শ্রেণিশত্রু খতম করা। চীনা ধাঁচের মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও তাদের মধ্যে দেখা দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের অনেক এলাকায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের ধাঁচে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং এই সময়ে তারাও 'শ্রেণিশত্রু খতম' বাড়িয়ে দেয়।[১৯] বাংলাদেশের এই শ্রেণিটিও ছিল চীনা প্রভাবিত; চীনপন্থী কমিউনিস্ট হিসেবেও তারা পরিচিতি

---

[১৬] মূল টেক্সট এ রকম: "The more you delay in recognition the Bangladesh Government, the more you delay giving material aid, the more will be the influx of refugees and you will not be able to solve the problem and this problem will continue to be lingering." Dasaratha Deb (CPIM), *Lok Sabha Debate,* vol. 2, 25 May 1971, col. 221.

[১৭] *Lok Sabha Debate,* vol. 2, 25 May 1971, col. 229.

[১৮] মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল* (ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৪), পৃ. ৫০।

[১৯] মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে সারা বাংলাদেশে নকশালরা শ্রেণিশত্রু খতমের নামে অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটায়। পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে তাদের প্রভাব ছিল বেশি। দেশের অভ্যন্তরের কিছু

পয়েছিল। স্বভাবতই ভারতে তাদের সমমনা 'শ্রেণিশত্রু খতম'-এ বিশ্বাসী বামপন্থীদের সাথে তাদের যাগাযোগ তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের এই শ্রেণিটি ছিল উগ্র ভারত বিরোধী এবং াংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশ নেওয়ার ঘোর বিরোধী। ভারত থেকে প্রয়োজনে মাঝে মাঝে শুধু অস্ত্র সংগ্রহ এবং ভারতে তাদের সমমনাদের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করার ব্যাপারটুকুতেই তারা ভারতের সংশ্লিষ্টতা মেনে নিতে রাজি ছিল।[২০]

ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এই বামপন্থীদের দমন করার চেষ্টা করলেও নানা কারণে তা আশানুরূপ সফলতা পাচ্ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় এবং শরণার্থী প্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে এই সুযোগ উপস্থিত হয়। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহে আইন-শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার যুক্তি দেখিয়ে সেখানে ব্যাপকভাবে সেনা মোতায়েন করার সুযোগ তৈরি হয়। উল্লেখ্য, ঐ সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে সিভিল প্রশাসন কিংবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর দ্বারা নকশাল দমন কার্যক্রম চলছিল। এ ক্ষেত্রে সেনা মোতায়েন করা সম্ভব হলে পরিস্থিতি সরকারের আরো নিয়ন্ত্রণে আসতো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার বামপন্থী দলগুলোর সমর্থনের উপর টিকে ছিল। এজন্য এই বামপন্থীদের বিরোধিতার মুখে সেনা মোতায়েন করা কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সহজ ছিল না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে শরণার্থী প্রবেশের কারণে সরকারের পক্ষে সেনা মোতায়েন করা অনেক সহজ হয়। বামপন্থী দলসমূহের মধ্যে নানা বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও একটা বিষয়ে তাদের মধ্যে ধারণাগত ঐক্য ছিল যে, আইন শৃঙ্খলার এই অবনতিশীল পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার খুব সহজেই সীমান্ত এলাকায় সেনা মোতায়েন করতে পারবে এবং এর ফলে নকশালবাদীদের দমন করা তাদের জন্য সহজ হবে।[২১] সীমান্তে ব্যাপক সেনা মোতায়েন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সরকার ভেঙে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার মাধ্যমে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার অচিরেই বামপন্থীদের এই অনুমানকে সত্য করে তোলে।

এই সেনা মোতায়েনের পক্ষ নেওয়া বা না নেওয়া কিংবা বাংলাদেশ আন্দোলনকে সমর্থন করা না করার সাথে বামপন্থী দলগুলোর স্থানীয় রাজনীতির সমীকরণ যুক্ত ছিল। ১৯৭১ সালের জুন মাসে সিপিএম-এর পলিটব্যুরো মিলিত হয়ে উদ্ভূত সংকটের ব্যাপারে যে রেজুলেশন গ্রহণ করে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক রাজনীতির প্রতিফলন দেখা যায়। এই রেজুলেশনে সিপিএম পূর্ব পাকিস্তান সংকটে ভারতের সরাসরি অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি ছিল, এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের যুদ্ধ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে রূপান্তরিত হবে। এভাবে সরাসরি অংশগ্রহণের পরিবর্তে সিপিএম বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানায় এবং এর সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্বাধীনতাকামীদের (মূলত আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীদের) সামরিক সহায়তার প্রস্তাব করা হয়।[২২] দেখা গেছে যে, বামপন্থী দলসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের সেইসব পদক্ষেপ সমর্থন করেছে, যা তাদের প্রাদেশিক রাজনীতিকে বিপদগ্রস্ত করবে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

এলাকায়ও তাদের প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল। পাবনা ও সিলেট এলাকায় নকশালদের তৎপরতা জানার জন্য দেখুন, আবুল কালাম আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা: পাবনা জেলা* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ৬২–৬৩; মোঃ মিজানুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পের স্মৃতি* (ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ১৬–১৮।

[২০] Richard Sission & Leo E Rose, *War and Secession,* p.180.

[২১] Richard Sission & Leo E Rose, *War and Secession*, p.180.

[২২] *Indian Express*, 10 June 1971.

সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহ থেকে ভারতের অধিকতর অভ্যন্তরে অবস্থিত এলাকায় শরণার্থী প্রতিস্থাপনের মতো কম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে এক সময়ে সিপিআইএম-এর যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক সি রাজেশ্বর রাও আগস্ট মাসে দেওয়া একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, শরণার্থীদের সীমান্ত এলাকা থেকে প্রতিস্থাপনের জন্য সিপিআই প্রাণপণ সংগ্রাম করবে। উড়িষ্যা রাজ্য কর্তৃক শরণার্থী গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোকেও তিনি সমালোচনা করেন।[২৩] শরণার্থী প্রতিস্থাপন আপাত দৃষ্টিতে নিছক শরণার্থী ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত একটি বিষয় মনে হলেও এর সাথে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী বামপন্থী প্রভাবিত রাজ্যসমূহে সেনা মোতায়েন এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তা ব্যবহারের সম্ভাবনা জড়িত ছিল। শরণার্থীদের ব্যাপক সংখ্যায় দূরবর্তী রাজ্যসমূহে প্রতিস্থাপন সম্ভব হলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হতো, স্থানীয় সিভিল প্রশাসন দিয়েই অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব হতো। ফলে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের পক্ষে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির অজুহাতে সেখানে সেনা মোতায়েনের যুক্তি দুর্বল হয়ে যেতো। ফলে শরণার্থী প্রতিস্থাপনের মতো ইস্যুতেও সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদককে তখন 'প্রাণপণ সংগ্রামের' প্রত্যয় ঘোষণা করতে হয়। তাঁর এই বিবৃতির সাথে শরণার্থী জনিত কারণে সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় কেন্দ্রের সেনা মোতায়েনের সরকারি সিদ্ধান্তকে মিলিয়ে দেখলে বামপন্থীদের বিরোধিতার কারণ বোঝা যায়।

শরণার্থীদের ব্যাপারে ভারতের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিক্রিয়া ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে তৎকালীন ভারতের অন্যতম দক্ষিণপন্থী দল জনসংঘের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। সংকটের প্রথম থেকেই এই দলটি ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যথোচিত 'বলিষ্ঠতা' প্রদর্শনের দাবি জানিয়ে আসছিল। ১৮ই জুন ১৯৭১ তারিখে লোকসভায় জনসংঘ নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী (জ. ১৯২৪) সরকারের নীতির সমালোচনা করে বলেন যে, পাকিস্তানের গণহত্যার ফলে ভারতে শরণার্থী প্রবেশ করেছে এবং তা ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন যে, শরণার্থীদের নিয়মিত ভরণ-পোষণের জন্য ভারতের যা খরচ হচ্ছে, তা যুদ্ধের খরচের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ফলে পাকিস্তানকে যুদ্ধের মাধ্যমে পরাস্ত করাই শরণার্থী ফেরত পাঠানোর উত্তম পন্থা।[২৪]

হিন্দু মহাসভা, স্বতন্ত্র দল প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী দলগুলোও বারংবার সরকারের দুর্বল নীতির সমালোচনা করে যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়ে আসছিল। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ভারতের যুদ্ধে জড়ানোর সক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল পরিস্থিতির মাঝে সেই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনার ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে কোনো কৌশলগত পরামর্শ ছাড়াই এই দলগুলোর পক্ষ থেকে যুদ্ধের দাবি জানানো হচ্ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের মার্চের নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী এই দলগুলোর একপ্রকার ভরাডুবি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং সরকারকে একটি অমীমাংসিত যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়ে কংগ্রেসকে রাজনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করাই তাদের লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়।

বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা। বাংলাদেশের গণহত্যার প্রতিবাদে ২৮শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের ষোলো জন লেখক ও বুদ্ধিজীবীর একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে

---

[২৩] মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল*, পৃ. ৪৭।

[২৪] *Lok Sabha Debate,* vol. 2, 18 June 1971, col. 351–52.

াকিস্তানি সেনাবাহিনীর অভিযানের প্রতি ঘৃণা এবং স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ য়। পাশাপাশি বিশ্ববিবেক এবং ভারত সরকারের প্রতি বাংলাদেশ-এর প্রতি সমর্থন প্রকাশের আহ্বান ানানো হয়। আবেগময় ভাষায় রচিত এই বিবৃতিতে তারা বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি যে, স্বাধীন াংলাদেশ'-এর জয় হবেই।'[২৫] বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র দুই দিনের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের দওয়া এই বিবৃতি ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের একটি সূচক। রপর থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করতে াকেন।

এই সমর্থন প্রকাশের কারণে তৎকালীন ভারতের প্রভাবশালী নিরাপত্তা বিশ্লেষক কে সুব্রামানিয়াম ১৯২৯–২০১১) পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি প্রচার পেয়েছিলেন। ৩১শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে কাউন্সিল ব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স-এর একটি সেমিনারে দেওয়া বক্তব্যে তিনি পাকিস্তান সংকটে ভারতের স্তক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দেখান। এই সেমিনারের অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী ভারতের আত্মরক্ষামূলক ীতি গ্রহণ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সুব্রামানিয়াম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্নমত কাশ করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সংকটের ব্যাপারে নিছক আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করা ারত সরকারের জন্য সঠিক পদক্ষেপ হবে না।[২৬] এছাড়া ৫ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে দিল্লির *ন্যাশনাল হরাল্ড* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তান ভেঙে দেওয়া ভারতের নিজস্ব স্বার্থের অনুকূল এবং এমন একটি সুযোগ উপস্থিত হয়েছে; ভবিষ্যতে তা আর কখনই আসবে া।[২৭] ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে দেওয়ার জন্য ভারত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তা প্রমাণ করার জন্য াকিস্তানি বিশ্লেষক ও নীতি নির্ধারকরা প্রায়ই সুব্রামানিয়ামের এই প্রবন্ধটির উদ্ধৃতি দিতেন। পরবর্তী ালে দেওয়া সুব্রামানিয়ামের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, এই মন্তব্য ছিল একান্তই তাঁর নিজস্ব; এই ক্তব্য প্রস্তুত করার সময়ে বা পত্রিকায় তা প্রকাশের ব্যাপারে তিনি ভারতীয় কোনো নীতি নির্ধারকের াথে আলাপ করেননি। সরকারি কোনো পর্যায়ের অনুমোদনও তাতে ছিল না। এমনকি *ন্যাশনাল হরাল্ড* পত্রিকা এই বিষয়ে তাঁর আর কোনো লেখা প্রকাশ করতে অস্বীকার করে। এজন্য, সুব্রামানিয়াম নেকটা বাধ্য হয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের জন্য জনসংঘ-সমর্থক পত্রিকা *মাদারল্যান্ড*-কে বেছে নিয়েছিলেন।

---

[২৫] বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়,সত্যজিৎ রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, দ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, শম্ভু মিত্র, সুশোভন সরকার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র, প্রবোধচন্দ্র সেন, তারাপদ ুখোপাধ্যায়, অম্লান দত্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দেখুন, *দলিলপত্র*, ২শ খণ্ড, পৃ. ২৯৮–৯৯।

[২৬] Richard Sission & Leo E Rose, *War and Secession*, p.149.

[২৭] কে. সুব্রামানিয়াম ছিলেন দিল্লিতে অবস্থিত Indian Institute for Defence Studies and Analyses নামক একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। দ্র. Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism* (Dhaka: UPL, 1994), p. 274. ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকাটির সাথে নেহেরু পরিবারের দীর্ঘকালীন ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্টতা ছিল; নীতিগত দিক দিয়ে পত্রিকাটি ছিল ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের সমর্থক। ভারতীয় ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে সুব্রামানিয়ামের যে মন্তব্যটি পাকিস্তানি সমালোচকদের দ্বারা বহু উদ্ধৃত হয়েছিল, সেটি হলো,"...an opportunity the like of which will never come again." দ্র. Richard Sission & Leo E Rose, *War and Secession*, p.149.

শরণার্থী সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করলে কে সুব্রামানিয়াম পূর্ব পাকিস্তানের কোনো একটি এলাকা দখল করে সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রহরায় একটি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবনা নিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব ইনস্টিটিউটে একটি রুদ্ধদ্বার সেমিনারের আয়োজন করতে চাইলে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাতে অনুমতি দেয়নি; উল্টো তাঁকে তাঁর প্রবন্ধসমূহ প্রত্যাহার করতে বলে। ১৩ই জুলাই তারিখে অবশ্য তাঁর এই ভূখণ্ড দখল করে সরকার গঠনের প্রস্তাবনা লন্ডনের *দ্য টাইমস* পত্রিকা প্রকাশ করে।[২৮] পাকিস্তান এই প্রস্তাবনাকেও ভারতের ষড়যন্ত্রের আরেকটি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে। বস্তুত সুব্রামানিয়ামের প্রস্তাবনার সাথে ভারতের গৃহীত পদক্ষেপের তেমন কোনো সাদৃশ্য ছিল না; বক্তব্য প্রকাশ বা প্রস্তাবনা প্রণয়নের ব্যাপারে ভারত সরকার তাঁকে উদ্বুদ্ধ বা পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ও বিশ্লেষকগণ তাঁকে ভারত সরকারের একরকম মুখপাত্র হিসেবেই প্রচার করেছে।

পূর্ব পাকিস্তান সংকটে ভারতের অংশগ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেও কিছু বুদ্ধিজীবী তাদের বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে অন্যতম ছিলেন ভারতের ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের সভাপতি আর পি কাপুর। বাংলাদেশকে সাহায্য না করার পক্ষে তাঁর যুক্তি ছিল এ রকম:

> পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হওয়ার পক্ষে কোন সহযোগিতা বা উৎসাহ প্রদান ভবিষ্যতে ভারতের সর্বনাশ ডেকে আনবে। কারণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার প্রবণতা গোড়া থেকেই চলে আসছে। ভারত যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে পাকিস্তানও ভবিষ্যতে যে-কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন অঞ্চলকে স্বীকৃতি দিয়ে বসতে পারে।[২৯]

বাঙালি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নিরোদ সি চৌধুরীও (১৮৯৭–১৯৯৯) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তা দেওয়ার বিরোধিতা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো ভারতের শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করা। ভারতের প্রতিবেশী শ্রীলংকা, পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটান আগে থেকেই ভারতকে সন্দেহের চোখে দেখে আসছে—এই মন্তব্য করে তিনি এর সাথে যোগ করেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এদের সঙ্গে বাংলাদেশেরও যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।[৩০]

ভারতের প্রভাবশালী এবং নেতৃস্থানীয় আরও অনেক বুদ্ধিজীবী পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে—সংশ্লিষ্টতার পদ্ধতি বা প্রকৃতি যেমন হোক না কেনো—প্রকাশ্য মতামত প্রকাশ করেছিলেন। এই জাতীয় মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম ছিলেন সি রাজাগোপালআচারি (১৮৭৮–১৯৭২)[৩১], ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন প্রভাবশালী জেনারেল কারিয়াপ্পা (১৯০০–১৯৯৩) এবং ১৯৭১ সালে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধি (জ. ১৯২৪)।[৩২] তাঁদের মতামত ছিল যথেষ্ট

---

[২৮] Richard Sission & Leo E Rose, *War and Secession*, p.150.

[২৯] মোঃ হাবিবুর রহমান, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ২৪শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, জুন ২০০৬, পৃ. ৩৩।

[৩০] নিরোদ সি চৌধুরী শুধু বাঙালি ছিলেন তা নয়, তাঁর জন্ম হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কিশোরগঞ্জ জেলায়। জন্মভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করার কোনো আবেগ তাঁর মধ্যে কাজ করেনি। দ্র. হাবিবুর রহমান, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব", পৃ. ৩৩।

[৩১] সি রাজাগোপালআচারি ছিলেন ভারতের সর্বশেষ এবং একমাত্র ভারতীয় গভর্নর জেনারেল (১৯৪৮–১৯৫০)।

[৩২] Richard Sission & Leo E Rose, *War and Secession*, p.150.

তর্কতামূলক; সুব্রামানিয়ামের মতো আক্রমণাত্মক ধরনের নয়। তাঁরা মনে করতেন পূর্ব পাকিস্তানের ্যাপারে ভারতের এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত হবে না, যা পরবর্তীতে ভারতের অভ্যন্তরে ায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে উৎসাহিত করে।

তবে পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করার সমর্থনে যেসব ভারতীয় কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী, াজনীতিবিদ ও আমলা প্রকাশ্যে তাদের মতামত দিয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। বরং দের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের ধরন নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। তাদের ই শঙ্কার মোটামুটি দুইটি কারণ ছিল। প্রথম কারণটি ছিল, এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হওয়া ম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, বিশেষত মুসলিম দেশসমূহের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া মারাত্মক নেতিবাচক হয়ে ঠতে পারে। বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশের সাথে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক থাকায় তাদের াথে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতির আশঙ্কা ছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো, পূর্ব পাকিস্তানে াঙালিদের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে তা পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা প্রভৃতি াঙালিবহুল প্রদেশকে প্রভাবিত করে পরিণতিতে একটি অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপান্তরিত বে কিনা—সেই আশঙ্কাও ছিল বুদ্ধিজীবীদের এই রক্ষণাত্মক মনোভাবের একটি কারণ। এছাড়া দ্ধিজীবীদের একটি অংশ মনে করতেন, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে াকা পূর্ব পাকিস্তান ভূ-রাজনৈতিকভাবে ভারতের জন্য অনুকূল। কারণ, পাকিস্তানের দুই অংশের াজনৈতিক বিভাজনের কারণে পূর্ব পাকিস্তান বরং ভারতের অনুকূলে থাকবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান াধীন হয়ে গেলে উপমহাদেশে আর একটি ইসলামিক দেশের আবির্ভাব ঘটবে।[৩৩] ভারতের জন্য রিণতিতে তা ভালো নাও হতে পারে।

ভারতের পত্র-পত্রিকার মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে ভারতের করণীয় কী হওয়া উচিত, সে ্যাপারে মোটামুটিভাবে দুই রকম মতামত ছিল। *মাদারল্যান্ড, অরগানাইজার, প্যাট্রিয়ট* প্রভৃতি পত্রিকা াদের সম্পাদকীয়তে অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কটে দ্রুত ভারতের হস্তক্ষেপ করা চিত। কিছু কিছু পত্রিকা অবশ্য ভারতের পূর্ব পাকিস্তান নীতির ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করেছিল। তাদের ক্তি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের হস্তক্ষেপ বা অত্যাধিক সংশ্লিষ্টতা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ারতের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার অধিকাংশ পত্রিকা াংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি সহায়তা করার বিষয়টি বারংবার গুরুত্ব হকারে প্রকাশ করে যাচ্ছিল। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় পত্র-পত্রিকা সরকারের সতর্ক পদক্ষেপে লার নীতিকেই সমর্থন দিয়েছিল।[৩৪]

নসাধারণের প্রতিক্রিয়া

াংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে ভারতীয় জনসাধারণের বিশেষত বাংলাভাষী ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া ল স্বতঃস্ফূর্ত। ২৭শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে কলকাতার বেশকিছু ছাত্র ও যুব সংগঠন বাংলাদেশের প্রতি কাত্মতা প্রকাশ করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। ঐ দিন অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ছাত্র সভায় ভারত সরকারের কাছে সার্বভৌম স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী বাঙ্গলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং নৈতিক ও

---

[৩৩] Richard Sission & Leo E Rose, *War and Secession*, p.150–51.

[৩৪] পশ্চিমবঙ্গের *আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার* প্রভৃতি এবং ত্রিপুরার *দৈনিক সংবাদ* ও *সাপ্তাহিক মাচার* প্রভৃতি পত্রিকার মুক্তিযুদ্ধকালীন সংখ্যা থেকে বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের মনোভাব জানা যায়। ছাড়া দেখুন, Richard Sission & Leo E Rose, *War and Secession*, p.149.

বৈষয়িক সাহায্যদান করার দাবী" জানানো হয়। কয়েকটি ছাত্র সভায় ইয়াহিয়া খানের কুশপুত্তলিকাও দাহ করা হয়।[৩৫] ২৮শে মার্চ কলকাতার দৈনিক যুগান্তরের একটি রিপোর্ট থেকে বাংলাদেশের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সমর্থনের তীব্রতা বোঝা যায়। কলকাতার ময়দানে আয়োজিত একটি জনসভায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ সম্পর্কে পত্রিকাটিতে লেখা হয়:

> এদিনের জমায়েতের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সমস্ত পঃ বঙ্গের মানুষের মন আজ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে যে আবেগে উদ্বেল তাই সভায় প্রতিফলিত। এদিকের সমস্ত মানুষ সারাদিন যে অসীম আগ্রহ নিয়ে ট্র্যানজিস্টারের সামনে বসে আছেন স্বাধীন বাংলার বেতার ঘোষণা শোনার জন্য, যে উন্মাদনায় এপারের সহস্র সহস্র যুবক ছুটে চলেছেন সীমান্তের দিকে সেই উত্তেজনায় সমস্ত সভা সারাক্ষণ থরথর করে কেঁপেছে।[৩৬]

২৮শে মার্চ তারিখেও পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের সমর্থনে নানা কর্মসূচি পালিত হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে কলকাতার পাকিস্তানি দূতাবাস ঘেরাও, ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের ডাকে ছাত্রদের দিনব্যাপী অনশন, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে জনসংঘ-এর সভা ও মশাল মিছিল, বাংলা জাতীয় দলের সভা ও মিছিল অন্যতম।[৩৭] পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও বিভিন্ন মহল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করে। ২৭শে মার্চে দিল্লিতে গণবিক্ষোভ ও কালো পতাকা উত্তোলন, মুম্বাই শহরে পাকিস্তানি সহকারী হাই কমিশনের সামনে গণবিক্ষোভ এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের উদ্যোগে বাংলাদেশ সংহতি সমিতি গঠন এবং ২৮শে মার্চে 'ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘ'-এর নিন্দা ছিল বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন প্রকাশের এ রকমই কয়েকটি উদ্যোগ।[৩৮]

পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের মধ্যে এ সময়ে বাংলাদেশের প্রতি এমনই আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল যে, এদের অনেকেই সীমান্ত অতিক্রম করে কিছু সময়ের জন্য হলেও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রবেশ করতো। কলিন স্মিথ নামক একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর থেকে সড়ক পথে ঢাকা যান। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কৃষ্ণনগর থেকে একদল ভারতীয় বাংলাদেশের পতাকা বহন করে সীমান্তের দিকে যাচ্ছেন। তিনি তাদের সাথে আলাপ করেন এবং জানতে পারেন যে, তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাচ্ছে। তিনি আরও জানতে পারেন যে, তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য নিছক বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করা। স্মিথ এই উৎসাহী ভারতীয়দের সাথে সীমান্তের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং খেয়াল করেন যে, ঘণ্টাখানেক থেকে এরা আবার ভারতে ফিরে গেলো।[৩৯] বস্তুত সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত বা বাংলাদেশে প্রবেশ করা উভয় এলাকার বাঙালিদের জন্য একটি আবেগ ও আনন্দের উপলক্ষ। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই আবেগ যে শুধু সাধারণ মানুষকে সীমান্ত অতিক্রম করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে প্রলুব্ধ করেছিল তা নয়; অনেক বিখ্যাত মানুষও এই আবেগ সংবরণ করতে পারেননি। সেপ্টেম্বর মাসে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪–২০১২) এবং

---

[৩৫] ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র পরিষদ, ডিএসও, পিএসইউ, এফআরএস প্রভৃতি ছাত্র সংগঠন এই ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। দেখুন, *দলিলপত্র*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

[৩৬] *দৈনিক যুগান্তর (কলকাতা)*, ২৮ মার্চ ১৯৭১।

[৩৭] *দৈনিক যুগান্তর (কলকাতা)*, ২৯ মার্চ ১৯৭১।

[৩৮] *দলিলপত্র*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩০১–২।

[৩৯] *The Observer (London)*, 18 April 1971.

ডিসেম্বরে ভোমরা সীমান্ত দিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯১৯–২০০৩) মতো মানুষও বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন।[৪০] বলা বাহুল্য, ভারতীয়দের এই সীমান্ত অতিক্রম পাকিস্তানের কাছে সর্বদাই ছিল ভারতীয় আগ্রাসনের নামান্তর।

ভারতের ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠনও বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কিংবা শরণার্থীদের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১৬ই এপ্রিল কলকাতায় শিখ সম্প্রদায় পাকিস্তানি নৃশংসতার নিন্দা জানায়। ১৭ই এপ্রিল দিল্লিতে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আহ্বান জানান।[৪১] ৬ই মে পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নিধন বন্ধের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে আহ্বান জানানো হয়।[৪২] ১শে মে কলকাতার আর্চ বিশপ রেভারেন্ট এল টি পিকেসি বলেন যে, শরণার্থীদের ফেরত যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের প্রকৃত সমাধান।[৪৩]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বে ভারতের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে মার্চের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল সাধারণ নির্বাচনে ব্যস্ত ছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-সহ অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা নিজ নির্বাচনী এলাকা তথা সামগ্রিক নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে বিশেষভাবে নজরে রাখার মতো সময় বা পরিস্থিতি তাদের ছিল না। এমনকি ভারতের বিদেশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় পর্যন্ত ২৫শে মার্চের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যাপারে তেমন কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আগ্রহ দেখায়নি। সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক মহল কিংবা বুদ্ধিজীবীরাও এ ব্যাপারে কোনো গভীর পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করেননি।[৪৪] তবে ২৫শে মার্চের পর থেকে ভারতীয় নীতি নির্ধারকরা বাংলাদেশ ইস্যুতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। মার্চের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর বিশাল বিজয় এই সক্রিয় হয়ে ওঠায় শক্তি যোগায়। অন্যদিকে সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাভাষী রাজ্যসমূহে ভাষাগত জাতীয়তাবাদ হয়ে ওঠে বাংলাদেশকে সমর্থনের অন্যতম নিয়ামক।

উপসংহার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বেশকিছু ঘটনা ভারতে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এসব ঘটনাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা এবং শরণার্থী পরিস্থিতি অন্যতম। স্বাধীনতা ঘোষণার পরবর্তী সপ্তাহ খানেক ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। এপ্রিল মাসের শুরু থেকে এর সাথে যুক্ত হয় শরণার্থী ইস্যু। বাস্তবত, শরণার্থী অনুপ্রবেশের মুহূর্ত থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারও গঠিত হয়েছিল রাজনৈতিক শরণার্থীদের দ্বারা।

---

[৪০] সোহরাব হাসান (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), পৃ. ১৮২, ২২৩।

[৪১] *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ১৭ ও ১৯ এপ্রিল ১৯৭১।

[৪২] *দলিলপত্র*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৭।

[৪৩] *দলিলপত্র*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

[৪৪] রিচার্ড সিসন ও লিও ই রোজ ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই তথ্য জানতে পারেন। দেখুন, Richard Sission & Leo E Rose, *War and Secession*, p.135.

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী সমস্যার ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়ার ভিতর পার্থক্য ছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের ব্যাপারে সেখানে একধরণের ইতিবাচক ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছিল। একই ধরণের ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছিল শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান ও তাঁদের নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন নিয়েও। ভারতীয় নীতি নির্ধারকরা বাংলাদেশের ব্যাপারে যে নীতি ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, সর্বভারতীয় পর্যায়ের ইতিবাচক জন-প্রতিক্রিয়ার কারণে তা সহজ হয়েছিল। পরবর্তীতে ভারতীয় নীতি নির্ধারকরা বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও শরণার্থী ইস্যু এই দুটি বিষয়কে এমন একটি কৌশলগত ফ্রেমের মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা বাংলাদেশের যুদ্ধে ভারতের সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ সম্ভব করে তুলেছিল।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট: শৈল্পিক ও ইতিহাসভিত্তিক মূল্যায়ন

মোঃ বনি আদম*

Abstract: Bangladesh's Liberation War of 1971 is the highest water mark in the long-standing independence movement and struggle of the Bengali nation. Infinite sacrifice and heroism is manifested in this 9-month long LiberationWar. In fact, the Liberation War was the people's war as there was active participation from all walks of life irrespective of caste, creed, profession, region, gender and race. A multifaceted picture was observed in the Liberation War of Bangladesh. In order to familiarize the war to the international community, and in communicating its gospel worldwide the Mujibnagar Government launched 8 postage stamps which made sure the existence of Bangladesh to the outer world. These stamps were not only merely postage stamps but they also attached a great significance to Bangladesh history. Against this backdrop, this article aims at investigating history and evaluating historical and artistic importance of these postage stamps.

মিকা

কটিকিট ডাকযোগাযোগের একটি অপরিহার্য অংশ। ডাকমাশুলের বিকল্প হিসেবে ১৮৪০ সালের ৬ই া ইংল্যান্ডে বিশ্বের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।[১] বাংলাদেশে ডাকটিকিটের প্রচলন হয় ১৯৭১ লের মুক্তিযুদ্ধের সময়। ডাকটিকিটের ডিজাইন করেন লন্ডনপ্রবাসী ভারতীয় বাঙালি শিল্পী বিমান ল্লিক। তাঁর ডিজাইনে ছাপা আটটি ডাকটিকিট স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট – যে টিকিটগুলি শ্বব্যাপী জানান দেয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে। এগুলি নেহাত ডাকটিকিট নয়, এর সাথে ড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসের নানা ঘটনা, নানা অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের আবশ্যিকতা, প্রেক্ষাপট, দ্ধের বিভীষিকা, নেতৃত্ব সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে ডাকটিকিটগুলির মধ্য দিয়ে। ালোচ্য প্রবন্ধে ডাকটিকিট গুলির শৈল্পিক মূল্যায়নের পাশাপাশি ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয় করা য়েছে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদালয়, রাজশাহী।

[১] Siddique Mahmudur Rahman and Shirin, "Postage Stamps During the Liberation ar of Bangladesh," *Bangladesh Historical Studies,* vols. xv-xvi, 1994, p. 113.

ডাকটিকিট নির্মাণের প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়েই মূলত শুরু হয় বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। সময়ের প্রয়োজনেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার।[২] মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের প্রথম সরকার যা পরিচালিত হয় ভারতের কলকাতা থেকে। যুদ্ধদিনের নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যথাযথ কার্যক্রম পরিচালনা করে এ সরকার। যুদ্ধের বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধের তথ্য আদান প্রদানের লক্ষ্যে ডাক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করে। মুক্তিযুদ্ধের ভাব ও ভাবনাকে বিশ্বব্যাপী প্রকাশের জন্য ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও ডাকবিভাগ খোলা হয়। 'বাংলাদেশের প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয় চুয়াডাঙ্গায়। প্রথম পোস্টমাস্টার জেনারেল নিযুক্ত হন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। তাঁকে সহযোগিতার দায়িত্ব লাভ করেন রাজশাহীর তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক আবদুল আজিজ, ডাকবিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইদ্রিস আলী, আশরাফ আলী চৌধুরী এবং চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।'[৩] এ. টি. এম আনোয়ারুল কাদির-এর লেখা থেকে উক্ত দলের সহযোগী হিসেবে নিতুন কুণ্ডু ও ভারতের প্রতিনিধি এল. এন. মিশ্রেরও নাম পাওয়া যায়।[৪]

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে চিঠি আদান প্রদানের কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিফৌজ ও স্কাউটের সদস্যরা। মুজিবনগর সরকার এক সময়ে বিশ্বজনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে ডাকটিকিট প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, তৎকালীন ব্রিটিশ পোস্টমাস্টার জেনারেল ও এমপি জন স্টোন হাউজ ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শের লক্ষ্যে 'ওয়ার অন ওয়ান্ট'-এর পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার মুজিবনগর আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্য মন্ত্রীদের সাথে তাঁর আলোচনার মাধ্যমে ডাকটিকিট প্রকাশের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৫] ডাকটিকিট প্রকাশ সম্পর্কে জন স্টোন হাউজ বলেন, 'মুক্তাঞ্চলে ব্যবহার করার জন্য বাংলাদেশের ডাকটিকিট প্রচলন করা হলে মুক্তাঞ্চল থেকে প্রেরিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব বাস্তব সত্য হিসেবে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।'[৬] ডাকটিকিট প্রকাশের বিষয়ে জন স্টোন হাউজ সরাসরি মুজিবনগর সরকারের দায়িত্বে ও নির্দেশে কাজ করেন। ২৫.৫ মিমি X ৩৮.৫ মিমি আকৃতির বাংলাদেশের এই ডাকটিকিটগুলি ছাপানো হয় লন্ডনের ফরম্যাট ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রিন্টার্স লিমিটেড থেকে লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে।[৭]

২৬শে জুলাই হাউজ অব কমন্স-এর হারকর্ট রুমে স্বাধীন বাংলাদেশের ৮টি ডাকটিকিটের প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সকল দলের নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং প্রায় ৪০ জন

---

[২] মুজিবনগর সরকার গঠনের পটভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, মঈদুল হাসান, *মূলধারা'৭১* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৩), পৃ. ৫-১৬; মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ১৩০-১৩৭।

[৩] নন্দলাল শর্মা, *ডাকঘরের কথা* (ঢাকা: মুক্তধারা, ২০০৪), পৃ. ৪৬।

[৪] এ. টি. এম আনোয়ারুল কাদির, "প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ডাকটিকিট," *প্রথম আলো*, ২৬ শে মার্চ ২০১২।

[৫] আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃ. ৯৪ ।

[৬] এ. টি. এম আনোয়ারুল কাদির, "প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ডাকটিকিট।"

[৭] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র, তৃতীয় খণ্ড* (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৯২৩।

াংবাদিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রদূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রথম প্রকাশিত টি ডাকটিকিট প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্য আব্দুল মান্নানও এই কাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে ডাকটিকিটগুলির গুরুত্ব প্রসঙ্গে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন, 'ডাকটিকিটগুলির জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ বাংলাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য দক্ষেপ বলে গণ্য করা হবে।'[৮]

এ অনুষ্ঠানের পর দিন ২৭শে জুলাই লন্ডনের *দি টাইমস*, *দি গার্ডিয়ান*, *দি ডেইলি টেলিগ্রাফ*, *ডইলি মিরর* ও *দি মর্নিং স্টার* প্রভৃতি পত্রিকায় ডাকটিকিট প্রকাশের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ২৬শে লাই প্রকাশনা অনুষ্ঠান হলেও ১৯৭১ সালের ২৯শে জুলাই মুজিবনগর পোস্ট অফিসে মওদুদ াহমদ, লন্ডনে হাউজ অব কমন্স-এ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনে ম. হোসেন আলী একযোগে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রথম ৮টি ডাকটিকিট প্রকাশ রেন।[৯] এই ডাকটিকিটগুলি প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের পরিচিতি, ংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা। এর পাশাপাশি শিল্পী বিমান মল্লিকও পরিচিতি পান বিশ্বব্যাপী।

ল্পী বিমান মল্লিক

ন্ডনপ্রবাসী শিল্পী বিমান মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ওড়ায়। স্কুল-কলেজের শিক্ষা কলকাতায়। গ্রাফিক ডিজাইনে পড়াশুনা করেন লন্ডনে। তিনি ১৯৬৪ ালে লন্ডনের 'সেন্টমার্টিন স্কুল অব আর্ট' থেকে গ্রাফিক ডিজাইনের ওপর ডিগ্রি লাভ করেন। ডিগ্রি ম্পন্ন করার পর তিনি সুইজারল্যান্ডে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করেন। ১৯৬৯ সালে ব্রিটিশ ডাকবিভাগ থকে মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিটের ডিজাইন করে তিনি র্ণপদক লাভ করেন।[১০] আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই ডিজাইনারের প্রতিভার স্বাক্ষর লক্ষ করা যায় ার ডিজাইনকৃত বাংলাদেশের প্রথম ৮টি ডাকটিকিটেও। যে ডাকটিকিটগুলির জন্য তিনি কোনো ারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ।

শিল্পী বিমান মল্লিক ডাকটিকিটগুলি ডিজাইন করার পূর্বে, ডিজাইন প্রসঙ্গে বেশ কিছু প্রস্তাব খাপন করেন যা নিম্নরূপ:

> ক. দৈনন্দিন ডাক-ব্যবস্থার প্রয়োজনে বিভিন্ন মূল্যের আটটি ডাকটিকিট প্রচলন করা হবে, খ. ডাকটিকিটগুলোর মূল্য এক পাউন্ড রাখা হলে উৎসাহী ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের পক্ষে তা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হবে, গ. প্রথম দিনের খামের ওপর ৮টি ডাকটিকিটের সেট মানানসই হবে, ঘ. বলিষ্ঠ গ্রাফিক-চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাহিনী ও বিদ্যমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে হবে, ঙ. ডাকটিকিটের ওপর অঙ্কিত প্রতিকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ প্রগতিশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, চ. ডাকটিকিট গুলি আকর্ষণীয় এবং বাংলাদেশের সংগ্রামের মর্মবাণী প্রচারের বাহক হিসেবে তুলনামূলকভাবে বড় আকারের ও রঙিন হতে হবে।[১১]

---

[৮] আব্দুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯১), পৃ. ৯৫।

[৯] নন্দলাল শর্মা, *ডাকঘরের কথা*, পৃ. ৪৬; বিমান মল্লিক, "বাংলাদেশের ডাকটিকিট সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর থ্য", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২২ শে এপ্রিল, ২০১১; আবদুল মতিন, *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি: যুক্তরাজ্য* (ঢাকা: হিত্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ১৮২

[১০] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৯২২।

[১১] আবদুল মতিন, *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি: যুক্তরাজ্য* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ১৮১।

উপর্যুক্ত প্রস্তাব গ্রহণসাপেক্ষে বিমান মল্লিক ডাকটিকিটের নকশা প্রণয়ন করেন। ডাকটিকিটগুলিতে রঙের ব্যবহারে বিমান মল্লিকের যে চিন্তা কাজ করেছে তা বাস্তবসম্মত। 'জীর্ণশীর্ণ, ঘুমন্ত রং নয় Bold ও Vivid রঙের ব্যবহারে জাগ্রত স্ট্যাম্প ডিজাইন করতে হবে, যেন স্ট্যাম্পটি দেখলে মনে হবে একটি জাতি জেগে উঠেছে, এই জাতি এগিয়ে যেতে চাইছে।'[১২] বিমান মল্লিকের এই কথার সমন্বয় লক্ষ করা যায় তাঁর ডিজাইনকৃত ৮টি ডাকটিকিটে – যা বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট।

বাংলাদেশের প্রথম ৮টি ডাকটিকিট: মূল্যায়ন

১. বাংলাদেশের মানচিত্র

১০ পয়সা মূল্যমানের এই ডাকটিকিটে নীল, গাঢ় লাল ও বেগুনি রং ব্যবহার করা হয়েছে। এ ডাকটিকিটে মানচিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ববাসীর মনে প্রশ্ন জাগা খুব স্বাভাবিক যে, বাংলাদেশ নামক দেশটি কোথায়? সে প্রশ্নের উত্তর এই ডাকটিকিট।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে, তা হলো, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান নানা কাল পরিক্রমার মধ্য দিয়ে এসেছে। প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক রূপরেখা নির্ণয় করা খুবই জটিল বিষয়। প্রাচীন বাংলা ছিল বহু জনপদে বিভক্ত এবং নানা নামে অভিহিত। প্রতিটি জনপদ ছিল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশ পুণ্ড্র, গৌড়, বরেন্দ্রী, রাঢ়, সুহ্ম, বজ্র (অথবা ব্রহ্ম), তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল।[১৩] এসব জনপদের সীমারেখা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে রূপান্তরিত হতো।[১৪]

তবে মুসলিম শাসনামলে প্রাচীন বাংলার সমগ্র জনপদ 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়। ইউরোপীদের মাধ্যমে বাংলা পরিচিতি লাভ করে 'বেঙ্গলা' বা 'বেঙ্গল' নামে।[১৫] ব্রিটিশ শাসনামলে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে। কিন্তু ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' সংঘটিত হলে এর ভৌগোলিক পরিসীমা বিভক্ত হয়ে যায়। বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের আসামসহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলো নিয়ে গঠিত হয় 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় বেঙ্গল প্রদেশ। আবার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের মধ্য দিয়ে আসাম, বিহার, উড়িষ্যাকে আলাদা প্রদেশ করে শুধু পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) নিয়ে গঠিত হয় বেঙ্গল প্রদেশ – যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[১৬] ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। বাংলা ভাগ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পূর্ববাংলা অঙ্গীভূত হয় পাকিস্তানের সাথে। ১৯৫৬ সালে পূর্ববাংলার নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানের সাথে

---

[১২] বিমান মল্লিকের সাক্ষাৎকার, জিটিভি প্রযোজিত ডকুমেন্টরি, "আত্মপ্রকাশ স্ট্যাম্পস ৭১," http://www.londoni.co/index.php/history-of-bangladesh?id=292, accessed 9 september 2015

[১৩] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব) (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১২৩।

[১৪] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনযুগ)* (কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৯২), পৃ. ১।

[১৫] আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২), পৃ. ১৫।

[১৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ: জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ২৯।

লড়াই-সংগ্রাম করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে বর্তমান রূপ লাভ করে।

বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তরে ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে বার্মা (বর্তমানে মিয়ানমার) এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। আলোচ্য ডাকটিকিটে এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা

গাঢ় সবুজ, হলুদ ও টকটকে লাল রঙে আঁকা ২০ পয়সা মূল্যমানের এ ডাকটিকিটে বড়ো করে লেখা হয়েছে 'Massacre at Dacca University on 25th-26th March'। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত 'অপারেশন সার্চ লাইট' এবং ওই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে এতে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত বাঙালি জাতির জীবনে এক কালরাত। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ রাতে। মেশিনগান আর কামানের ভারী গোলায় ধ্বংস করে চলে ঢাকা শহর। তাদের ধ্বংসলীলা চালানোর অন্যতম প্রধান লক্ষ্যস্থলের মধ্যে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ গঠনের প্রাণকেন্দ্র, জ্ঞানের আধার। অধিকারসচেতন বাঙালি জাতির সকল আন্দোলন সংগ্রামেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাঙালির স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎসভূমি এ বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিবেচনা থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যেই বর্বরোচিত হামলা চালায়।

সিডনি শনবার্গ ২৫ মার্চে রাতের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

> ... জানালা থেকে আমিও দেখি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসা গোলা এবং এর ফলে রাতের আকাশকে আলোকিত করা আগুনের লেলিহান শিখা। আমাদের নীচের রাস্তায় কিছু ছাত্র মিছিল করে এগিয়ে আসছিল। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে স্বাধীনতার স্লোগান দিচ্ছিল; জিপের ওপর বসানো মেশিনগানের গুলি তাদের কচুকাটা করে ফেললো। এ ভাবেই বয়ে চলল ঘটনা...[১৭]

২৫শে মার্চে সবচেয়ে বেশি হত্যাযজ্ঞ চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে। এ হত্যাযজ্ঞ অমানবিকতা বা পাশবিকতার চরমমাত্রা স্পর্শ করে।[১৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত এমন হত্যাযজ্ঞের বিষয়টিই ডাকটিকিটে রূপ দিয়েছেন বিমান মল্লিক। এখানে গাঢ় সবুজ রঙে শ্যামল বাংলাদেশকে উপস্থাপন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতীক হলুদ বর্ণে ঢাকা ইউনির্ভাসিটির অক্ষরগুলির ওপর গাঢ় লাল রঙে রক্তাক্ত ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে বুঝানো হয়েছে।[১৯] বিমান মল্লিক মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিপীড়নের কথা তাঁর "ডাকটিকিটে রক্ত" শীর্ষক কবিতার মধ্যেও তুলে ধরেছেন এভাবে:

---

[১৭] সিডনি শনবার্গ, *ডেটলাইন বাংলাদেশ: নাইন্টিন সেভেন্টিওয়ান*, সংকলন, সম্পাদনা ও অনুবাদ মফিদুল হক (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০), পৃ. "ভূমিকা"।

[১৮] রফিকুল ইসলাম, "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়," রঙ্গলাল সেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: ঢাকা ও কলকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের অবদান* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃ. ৬১-৮২।

[১৯] ধীমান দাশগুপ্ত, *রঙ* (কলকাতা: বাণীশিল্প, ২০০৬), পৃ. ৪১।

দেশের বুকে মারল গুলি
অত্যাচারী Bully
লেখক কবি ধরল কলম
আমার হাতে তুলি।
কাজটা ছিল শক্ত
সাবধানে ছড়িয়ে দিলেম
ডাকটিকিটে রক্ত।
দেশের বুকে মারল গুলি
অত্যাচারী Bully
প্রতিবাদে ধন্য হল
আমার হাতের তুলি।[২০]

এ ডাকটিকিটের মধ্য দিয়ে একদিকে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরোচিত হামলাকে তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে এর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বাঙালিদের ত্যাগের মহিমা।

৩. সাড়ে সাত কোটি বাঙালি

৫০ পয়সা মূল্যমানের এই ডাকটিকিটটি কমলা, খয়েরি ও ধূসর রঙে আঁকা। টিকিটটিতে লেখা রয়েছে, Nation of 75 million people। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের জনসংখ্যা ছিল ৭৫ মিলিয়ন বা সাড়ে সাত কোটি। আলোচ্য ডাকটিকিটে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। ৫৫ হাজার বর্গমাইল ভৌগোলিক সীমার একটি দেশের জনসংখ্য ৭৫ মিলিয়ন। একটি পরাধীন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে যদি দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয় তাহলে সে ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালি যাদের ছিল এক প্রাণ, এক সত্তা, একটাই আকাঙ্ক্ষা – স্বাধীনতা।

শুধু জনসংখ্যার আধিক্য নয়, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রাণের আকুতি – স্বাধীনতার বিষয়টিকেই তুলে ধরা হয়েছে এই টিকিটের মধ্য দিয়ে।

৪ স্বাধীনতার পতাকা

১ রুপি মূল্যমানের এই ডাকটিকিটের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উপস্থাপন করা হয়েছে। ইংরেজিতে লেখা রয়েছে: Flag of Independence। প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের একটি জাতীয় পতাকা থাকে, বাংলাদেশেরও রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৭১ সালের মার্চে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত এ পতাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম উত্তোলন করা হয়। গাঢ় সবুজ, হলুদ ও লাল রঙে আঁকা এ টিকিটে সবুজ দ্বারা শ্যামল বাংলার প্রকৃতিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাঝে টকটকে লাল রং দ্বারা সূর্য–শক্তি যা প্রাণপ্রাচুর্যের আধার, আর মাঝখানে হলুদ রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র। এখানে লাল রং দ্বারা বাঙালির সংগ্রামশীলতা তথা ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটার বিষয়টিও উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

[২০] বিমান মল্লিকের কবিতা: http://www.londoni.co/index.php/history-of bangladesh?id=292, accessed 9 september 2015

শিল্পী ডাকটিকিটে বাংলাদেশের পতাকা এঁকেছেন বিশ্বময় স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের কথা জানান দেওয়ার অভিপ্রায়ে।

. ১৯৭০ সালের নির্বাচন

রুপি মূল্য মানের সাদা, হালকা ও গাঢ় নীলের এই ডাকটিকিটে আঁকা হয়েছে গণতন্ত্রের প্রতীক – কটি ব্যালট বাক্স। টিকিটটিতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে Election 1970: Results-167 seats ut of 169 for Bangladesh, ব্যালট বাক্সের ওপর লেখা রয়েছে 98%। এখানে ১৯৭০ সালের র্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের গণরায়ের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তান ব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত য়। পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং পূর্ব পাকিস্তান াদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৮৯টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। ফলে াওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।[২১] এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে মূলত বাঙালি াতীয়তাবাদী চেতনার বিজয় ঘটে। নির্বাচনী ফলাফলের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন ও াসনতন্ত্র রচনার যুক্তিসংগত অধিকার অর্জন করে। আলোচ্য ডাকটিকিটে এ বিষয়টিই ফুটিয়ে তোলা য়েছে ডিজাইনের ভাষায়।

. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

ল, হালকা ও গাঢ় সবুজে আঁকা ৩ রুপি মূল্যমানের আলোচ্য টিকিটে ফুটে উঠেছে শিকল ভাঙার ছবি মুক্তির প্রতিচিহ্ন। পাকিস্তানের দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিষয়টির স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এই ডাকটিকিটে। টিকিটটিতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে: Proclamation of ndependent Government 10th April 1971।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন ও স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার ধ্য দিয়ে বিশ্বমানচিত্রে নতুন একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত য়েছে, কেন, কোন ক্ষমতাবলে এবং কোন পরিস্থিতিতে স্বাধীন সার্বোভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা য়েছে। পরবর্তীকালে ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় বাংলাদেশ সরকারের অভিষেক নুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়, যা কার্যকর করা হয় ৭১-এর ২৬শে র্চ থেকে। তাজউদ্দীন বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করেন মুজিবনগর। মুজিবনগর ছিল অস্থায়ী জধানী। যদিও সরকারের প্রকৃত কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় কলকাতায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এই রকার 'মুজিবনগর সরকার' বলেই আখ্যায়িত হতো। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর হমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ।[২২] গণপ্রজাতন্ত্রী

---

[২১] মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, জগলুল আলম অনূদিত (ঢাকা: দি উনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড), পৃ. ১৬৪-১৬৫।

[২২] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পৃ. ১০৩-১০৫; রফিকুল লাম, বীর উত্তম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১০), পৃ. ১৭১; হোসেন তওফিক ইমাম, াংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকার," সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের ক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ২৬৬।

বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস যাঁর বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে তিনি তাজউদ্দীন আহমেদ।

মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের প্রথম সরকার, যে সরকারের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এই ডাকটিকিট বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এ দিনটির তাৎপর্য বহন করে।

৭. শেখ মুজিবুর রহমান

সোনালি, হাফটোন কালো, কমলা ও হালকা খয়েরি রঙে শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হয়েছে ৫ রুপি মূল্যমানের আলোচ্য ডাকটিকিটে। ইংরেজিতে লিখা রয়েছে Sheikh Mujibur Rahman। ১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, প্রাণপুরুষ যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে বিষয়টিই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাঙালিদের নেতৃত্বদানের সর্বময় ক্ষমতা বঙ্গবন্ধু হঠাৎ করে লাভ করেননি। এ ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে, প্রতিটি বাঙালির প্রাণের আকুতি নিজের সত্তায় ধারণ করে, তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নিজের বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রকাশ করে, তাদের প্রতি অকৃত্রিম দরদ আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে – 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হয়ে। বঙ্গবন্ধুর পূর্বে অনেক বাঙালি নেতার আবির্ভাব ঘটেছে এই বাংলায়। তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন অভিজাত পরিবারের। শহুরে পরিবেশের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে তাঁদের অধিকাংশের সংশ্লেষ ছিল খুব কম। তাঁদের অনেকেরই সংগ্রামী জীবন থেমে গেছে নানা আপোসকামিতায়, ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি এদের অনেকেই। কিন্তু শেখ মুজিব উঠে এসেছিলেন এক মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, বাংলার সর্বস্তরের মানুষের সাথে ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। 'তিনি ছিলেন জনগণের কাছাকাছি মানুষ; মাটির কাছাকাছি জননেতা।'[২৩] 'বস্তুত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই বাংলার আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভাবনার সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক হিসেবে।'[২৪]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই বাংলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান – সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ এক অভিন্ন চেতনায় একত্র হয়ে বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়, আর সে চেতনা হলো – বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার নব উন্মেষ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে শেখ মুজিবের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। তিনিই বাঙালিদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে উত্থাপন করেন ৬-দফা – যা বাঙালি জাতির 'মুক্তি সনদ' হিসেবে আখ্যায়িত। শুধু ৬-দফার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার লক্ষ্যে অগ্রবর্তী হওয়া নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম এ অঞ্চলকে পূর্ব পাকিস্তান-এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবসের আলোচনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমান 'বাংলাদেশ' নামকরণ প্রসঙ্গে বলেন,

---

[২৩] সালাহ্উদ্দিন আহমদ, "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ," *বাংলাদেশ: অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ৪১।

[২৪] তদেব, "স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার," *বাংলাদেশ: অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ*, পৃ. ৬৯।

> এক সময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে ... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই ... আমি ঘোষণা করিতেছি-আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু 'বাংলাদেশ'।[২৫]

বঙ্গবন্ধুর বুদ্ধিদীপ্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পৌঁছে যায় স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। ১৯৭১ ালের ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে পৌঁছে দেন স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে। এদিন ঙ্গবন্ধু রমনার রেসকোর্স বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দেন। লক্ষ লক্ষ ানুষের সমাবেশ ঘটে,.সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যেন জনসমুদ্র সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বাঙালি াতির ২৩ বছরের শোষণের কথা উল্লেখ করেন এবং প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও দ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন এমনভাবে যে, পরোক্ষভাবে এটাকে স্বাধীনতার ঘোষণাও বলা যায়। তিনি শস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে জাতিকে শৃঙ্খল মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং বলেন "এবারের সংগ্রাম ামাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তিনি এমনভাবে ভাষণ দেন যেন াধীনতা ঘোষণাজনিত কারণে বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ না ওঠে এবং স্বাধীনতা ঘাষণারও কিছু বাদ না থাকে। কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। বঙ্গবন্ধু সেই দুরূহ কাজটি অত্যন্ত চক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পন্ন করেন।[২৬] এ প্রসঙ্গে ঢাকাস্থ তৎকালীন মার্কিন কূটনীতিক আর্চার ক ব্লাড-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'Mujib's speech on Sunday March 7 was ore notable for what he did not say than for what he actually said.'[২৭]

রাজনীতি বা কূটনীতি বিশ্লেষকদের মতে, শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঘোষণা ছিল প্রচণ্ড চক্ষণতাপূর্ণ ও বাস্তবমুখী। সমগ্র বাঙালি জাতি যেন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর প্রাণস্পর্শী ও াবেগময় ভাষণের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ বাঙালিদের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তালে। তিনি যুদ্ধের মানসিকতায় প্রস্তুত বাঙালিদের সর্বশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন ১৯৭১ সালের ৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার াষণার মাধ্যমে – যা ওয়ারলেসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর হমানের হাতেই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ হয়ে ওঠে যেন সমার্থক শব্দ। লোচ্য ডাকটিকিটের মধ্য দিয়ে এই চিরন্তন সত্যকেই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

. বাংলাদেশকে সমর্থন দিন

৩ রুপি মূল্যের এই ডাকটিকিটে নীল, গোলাপি ও সোনালি রং ব্যবহার করা হয়েছে। গোলাপি রঙের ঝে সোনালি রঙে আঁকা হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র – যা সোনার মতোই মূল্যবান। ইংরেজিতে খা রয়েছে Support Bangladesh। স্বাধীনতা ঘোষণাকারী বা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত প্রতিটি

---

[২৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৯।

[২৬] মো. আবুল কাশেম, "স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবদান প্রসঙ্গে দু একটি বিষয়ের কিঞ্চিত বতারণা," এ. এইচ.এম. মাসুদ দুলাল (সম্পা.), *মাতৃভূমি* (জাতির জনকের জন্মদিনে বিশেষ প্রকাশনা, ংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ, ২০০৪), পৃ. ৯৪।

[২৭] Archer K Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American iplomat* (Dhaka: The University Press Limited, 2006), p. 172.

দেশেরই প্রয়োজন পড়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন। বাংলাদেশেরও প্রয়োজন ছিল সে সমর্থনের। এই ডাকটিকিটের মধ্য দিয়ে সে সমর্থন কামনার বিষয়টি স্পষ্ট। মানচিত্র খচিত বাংলাদেশ নামক দেশটির প্রতিই যে সমর্থনের আহ্বান তা এখানে খুব সহজেই বুঝা যায়। এই ডাকটিকিট প্রকাশের প্রায় ৫ মাসের মাথায় ভারত প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। এরপর ভুটান এবং ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক পরিসরে নানা রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি তার কাঙ্ক্ষিত বিজয় লাভ করে, সৃষ্টি হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালি জাতিরাষ্ট্র – বাংলাদেশ।

উপসংহার

১৯৭১ সালে ছাপা আটটি ডাকটিকিটে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় – দেশের ও মুদ্রার নামের ক্ষেত্রে। ডাকটিকিটগুলিতে দেশের নাম আলাদা শব্দে বাংলায় 'বাংলা দেশ' এবং ইংরেজিতে "Bangla Desh" লেখা হয়েছে। টিকিটে মুদ্রার নাম লেখা হয়েছে রুপি। কারণ যাই হোক না কেন, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রথম সরকার কর্তৃক ছাপা আটটি ডাকটিকিট বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের পরিচিতি তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ টিকিটগুলি রাজনৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন নিশ্চিত করে। টিকিটগুলি ধারণ করে আছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে আর ডাকটিকিটগুলির গুরুত্ব এখানেই।

চিত্র: ১. বাংলাদেশের প্রথম ৮টি ডাকটিকিট

সংগ্রহ: Mahammad Lutful Haq (ed.), *Postage Stamps on Liberation of Bangladesh,* Dhaka: Nymphea Publication, 2013.

চিত্র: ২. উদ্বোধনী খাম

সংগ্রহ: https://sites.google.com/site/mullickbiman/home/bangla-desh-1971, accessed 9 september 2015.

Tuesday July 27 1971
No. 58,235 Price 5p
6p in Eire)

THE TIMES

Bangla Desh, the self-declared independent East Pakistan republic, issued its own stamps on Thursday (29th July 1971). Enlargements are displayed above by the designer Mr Biman Mullick(left), an Indian; Mr Justice Chowdhury, another Indian, who is Bangla Desh's representative in London; and right, Mr John Stonehouse MP, former (British) Postmaster-general.

(The Times (London) Tuesday July 27, 1971

Please Note: For some unknown reason The Times called Mr Justice Chowdhury "an Indian".

Bangla Stamps Times A4 Hor.CDR

চিত্র: ৩.ডাকটিকিট প্রদর্শনরত শিল্পী বিমান মল্লিক, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং ব্রিটিশ পোস্টমাস্টার জেনারেল ও এমপি স্টোনহাউজ।

সংগ্রহ: https://sites.google.com/site/mullickbiman/home/bangla-desh-1971, accessed 9 September 2015

রণাঙ্গনে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক পরিচালিত একটি ডাকঘর। (১৯৭১)

চিত্র: ৪. মুজিবনগর সরকার পরিচালিত প্রথম ডাকঘর, ১৯৭১

সংগ্রহ: আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী: বাংলাদেশ* ১৯৭১, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৭।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

শামসুর রাহমানের কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদ

শুকদেব চন্দ্র মজুমদার*

Abstract: Non-communalism with which poet Shamsur Rahman was acquainted from his childhood days by virtue of his father's characteristics has been considered an 'uncommon achievement' in his life by the poet. And all through his life this achievement got a huge breadth and depth in the way of connection with several teachers intellectually uplifted and believing in humanism, collection of Tagore's poems, songs and his affirmative attitude towards life beauty aesthetics etc, especially the love for humanity derived from Jesus' life, the finery of flowers, sweethearts, youngsters, the infinite lover 'poetry' and the strong hatred to all sorts of sectarianism and barbarity. The present article deals with all the things depending mainly on two aspects: non-communalism and humanism.

ভূমিকা

আধুনিক কবিদের কাব্যচিন্তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো আন্তর্জাতিকতা। সে সূত্রে তাঁদের কবিতায় স্বভাবতই অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদের প্রকাশ ঘটে। অবশ্য এমন প্রকাশের পেছনে আরও কিছু বোধ-বিশ্বাস কাজ করে; উদাহরণস্বরূপ মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, সাম্যবাদমূলক ভাবনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সুগভীর সৌন্দর্যচেতনা, সত্যান্বেষণ, উদার মঙ্গলচিন্তা, সংবেদনশীলতা, মানবিক আবেগ ও প্রেমের প্রতি আস্থা, চিরন্তন মানবমূল্যে বিশ্বাস ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথাগত ধর্মপালন ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক ধরনের ঔদাসীন্য বা নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ, বা প্রবল ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব তাঁদের অসাম্প্রদায়িক হওয়ার পেছনে অনেকটা ভূমিকা পালন করে থাকে। অথবা তাঁরা ধর্মের খোলসটি নয়, তার অন্তর্গত এমন কিছু বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করে ক্ষেত্র বিশেষে অসাম্প্রদায়িকতায় উদ্বুদ্ধ হন যার মধ্যে একটি সর্বমানবিক প্রশ্রয়ের জায়গা রয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও বাংলার নবজাগরণ – এসব সে জায়গাটিকে আরও আধুনিক, স্ফুট করে তোলে। নবজাগৃতির কবি মধুসূদন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি নজরুল – এভাবে এক-একজন তাঁরা পরিচিত হন ঐসব কারণেই। মোটের ওপর 'মানবমূল্যে বিশ্বাস' ছিলো তাঁদের কাব্যাদর্শের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) ঐ তিনজনের আদর্শ দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত ছিলেন; সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আদর্শ দ্বারা – তাঁর কবিতায় নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের যে পরিমাণ উপস্থিতি রয়েছে তাতে এ কথা বলা সমীচীন বলেই মনে হয়। অতঃপর

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল।

জীবনানন্দ দাশসহ তিরিশোত্তর কবিদের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে সচেতন গ্রহণ, কমবেশি মার্ক্সীয় দর্শন বা সাম্যবাদী চিন্তাধারা, প্রথাগত সংস্কার নীতিধর্ম বা ধর্ম ইত্যাদিতে আস্থার অভাব বা সংশয় – এসব বৈশিষ্ট্য শামসুর রাহমানের কবিমনে এমন একটি স্থায়ী জায়গা তৈরি করে, যেখানে প্রথাগত অর্থে যাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে তার অবস্থিতির সুযোগ হয়নি বললেই চলে। তাঁর জন্মের আগেই প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুক্তবুদ্ধি চর্চার 'শিখা'-কেন্দ্রিক স্বল্পায়ু আন্দোলন ইতিহাসের ইতিবাচকতা ও দেশ-বিদেশের এ জাতীয় আরও কিছু সংগঠন ব্যক্তিত্বের ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শ দ্বারা জীবদ্দশার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি এ ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন বলে মনে করা যেতে পারে। তবে জীবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ শৈশব-কৈশোরে পিতার অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা ও কিছু কর্মতৎপরতা এবং পরে স্কুল জীবনে কয়েকজন অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী শিক্ষকের সাহচর্য ও শিক্ষা তাঁর মানস গঠনের প্রাথমিক স্তরে বেশ ভূমিকা রেখেছিলো – অন্তত তাঁর স্মৃতিচারণমূলক কথন থেকে এ কথা বলতে হয়। শেষ পর্যন্ত যে মৌলভিত্তির ওপর তাঁর মানসগঠন দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে বলে বোঝা যায়, তা হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদ; এর প্রতিপক্ষ হিসেবে সমাজ প্রতিবেশে যা কিছু ছিলো তখন, যা এখনো লক্ষ করা যায়, শামসুর রাহমান তার প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে ব্যক্ত করেছেন নানা কবিতায় নানা অভিব্যক্তি আবেগ-যুক্তি ঔচিত্যবোধ ব্যঞ্জনায়, যা অবশ্যই ঐ মৌল ভিত্তিজাত প্রভাবজনিত। সে ভিত্তি ও প্রভাবের উন্মেষ বিকাশ ও প্রকাশের ঐতিহাসিক-কাব্যিক প্রেক্ষাপট ও স্বরূপই বর্তমান প্রবন্ধে অন্বেষিত ও বিশ্লেষিত।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদের প্রথম পাঠ

শামসুর রাহমানের অসাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠার শৈশব-কৈশোরক প্রেক্ষাপট বিচার করলে বিশেষত দুটি বিষয়কে তাঁর পরবর্তীকালের ব্যক্তি ও কবিমনাস গড়ে ওঠার পেছনের প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক হিসেবে শনাক্ত করা যায়। একটি বিষয় হলো তাঁর পৈতৃক-পারিবারিক প্রভাব, অন্যটি হলো তাঁর প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বিশেষ কয়েকজন শিক্ষকের সান্নিধ্য-শিক্ষার প্রভাব। অবশ্য এ শনাক্তকরন প্রক্রিয়ায় কবির স্মৃতিচারণ বা আত্মচরিতমূলক কথোপকথনই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর কথায় তাঁর পিতার অসাম্প্রদায়িকতার কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর অসাম্প্রদায়িকতার গুণটিকে তিনি নিজের জীবনের 'অসামান্য অর্জন' বলে অভিহিত করেছেন।[১] অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক হওয়ার প্রাথমিক শিক্ষা তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকেই পান। এ বিষয়ক কবির বয়ান:

> অসাম্প্রদায়িক হবার শিক্ষা পেয়েছি আব্বার কাছে। তিনি কখনও হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে আমাদের সামনে বড় করে তুলে ধরেননি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সবাই যে একই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত এটা তিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন। মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারাটাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান বিবেচ্য।...'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' – চণ্ডীদাসের এই বাণীর সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন কি-না বলতে পারব না,...হয়তো তাঁকে এই শিক্ষা দিয়েছিল।[২]

মানবতাবাদের এ শিক্ষা কবির মনে প্রোথিত হতে শুরু করেছিলো সে শৈশব-কৈশোর কালেই – এমনই তাই মনে করা যায়। এ কারণেই কবির সমকালীন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাঁকে বারবার পীড়িত করেছে, তাঁর অসাম্প্রদায়িক 'জীবনচর্যা' তাঁকে কখনো এ বোধে উপনীত হতে দেয়নি যে, আবু

---

[১] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা* (দ্বিতীয় মুদ্রণ; ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২২।

[২] তদেব, পৃ. ২১-২২।

াহের ও সূর্যকিশোরের মধ্যে তাদের চেহারা ছাড়া আর কোনো পার্থক্য রয়েছে। এ চেতনাই হয়তো বজাগৃতির কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও জীবে প্রেম ও মানবধর্মে বিশ্বাসী স্বামী বিবেকানন্দের ৃতিধন্য পোগজ স্কুলে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই সরস্বতী পূজায় সূর্যকিশোরের সাথে য়ে গিয়েছিলো। 'একদা পোগজ ইশকুল প্রাঙ্গণে বেজে উঠেছিল মধুসূদন ও বিবেকানন্দের মতো ক্তির কণ্ঠস্বর, এ কথা ভাবতেও ভালো লাগে' – এ ধরনের কথা যে ঐ একই চেতনাজাত তা পলব্ধিযোগ্য। শামসুর রাহমানের এ জাতীয় কথার একটু বিস্তৃত উদাহরণ নীচে উল্লিখিত হলো:

> এখন মাঝে মধ্যে মনে হয়, যদি এই উপমহাদেশে কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা না হতো, হিন্দু-মুসলমান সবাই নিজেদের আন্তরিকতার, ভালোবাসার দীপ্তিতে ভাস্বর রাখতে পারত সবসময়, কস্মিনকালেও হিংস্রতাকে প্রশ্রয় না দিত, শুভবাদী ও অসাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের দিক-নির্দেশ মেনে চলত তাহলে কী ভালোই না হতো। এই উপমহাদেশে রক্তবন্যা বইত না, দেশ তিন খণ্ডে খণ্ডিত হতো না। অসংখ্য সংসার ছারখার হতো না। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, আখেরে যা হওয়ার তাই হলো।[৩]

পরিণত বয়সের এ পরিতাপ শামসুর রাহমানের মানস গঠনের যে পরিচয় তুলে ধরে, তার লিন্যপ্রাপ্তি ঘটে না, বরং এক ধরনের ঔজ্জ্বল্যই বাড়ে যখন তিনি অসংকোচে বলেন – 'ছেলেবেলায় ই সাম্প্রদায়িক চেতনা সামান্য হলেও খেলা করত।' অনতিকাল পরেই কয়েকজন আলোকিত নুষের আলোর আভা তা বিদূরিত করতে থাকে। চিন্তাহরণ সোম, আবদুল আউয়াল, মুহম্মদ নসুরউদ্দীন, আবু রুশদ, এ কে এম আহসান, বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় গুহ কুরতা, খান সারওয়ার মুরশিদ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ শিক্ষক ছিলেন তাঁর কাছে সে আলোর আভা চ্ছুরণকারী আলোকিত মানুষজন। পিতা-মাতার অসাম্প্রদায়িকতার কথা পুনর্বার ব্যক্ত করে তিনি এ ম্পর্কে বলেন: "তাঁদের দু'জনের প্রভাবে এবং ছেলেবেলায় ইশকুল শিক্ষক চিন্তাহরণ সোমের ংস্পর্শে আমি অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক চেতনার অধিকারী হয়ে উঠি। এই প্রসঙ্গে আমার হশিক্ষক আবদুল আউয়ালের কথা না বললে আমার চিন্তাধারার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা তো করা হবেই, হশিক্ষকের প্রতি ঘোরতর অন্যায় এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হবে।"[৪] তাঁর এ স্মরণ প্রক্রিয়ায় াম্যবাদী কবি প্রজেশ কুমার রায়, যিনি ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হন, কবি-প্রাবন্ধিক াহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ, 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য আবদুল কাদিরসহ আরো নেকের নাম এসেছে, যা তাঁর 'কালের ধুলোয় লেখা'র বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। অনেক প্রগতিশীল বি সাংবাদিক শিল্পী শিক্ষক বুদ্ধিজীবীর কথা রয়েছে। তাঁর প্রিয় অনেক সহপাঠী সহযাত্রী বন্ধু-বান্ধবের মও রয়েছে। সবার সাহচর্য যে কমবেশি প্রভাব ফেলেছে শামসুর রাহমানের কবিজীবনে, তার একটি য় দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ সম্পর্কে অনেকটা অবগত হওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে থাকা 'গ্রন্থে াছেন শহীদুল্লাহ,' 'শহীদ জননীকে নিবেদিত পঙ্‌ক্তিমালা,' 'হাসান হাফিজুর রহমানকে মনে রেখে,' য়দ হকের উদ্দেশে,' 'শওকত ওসমান যখন হাসপাতালে,' 'নরেন বিশ্বাসকে মনে রেখে,' 'সিকান্দার াবু জাফর স্মরণে,' 'শ্রদ্ধেয়া সুফিয়া কামালের জন্যে পঙ্‌ক্তিমালা,' 'ওয়াহিদুল হকের জন্যে,' াহরিয়ার কবিরের জন্যে পঙ্‌ক্তিমালা,' 'আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, তোমাকে,' 'গুণী বন্ধু ানিসুজ্জামানের উদ্দেশে' ইত্যাদি কবিতার নাম থেকেই। তাঁর কবিমানসের অসাম্প্রদায়িক নবতাবাদী মানচিত্রটির তৈরির পেছনে ও তা অক্ষত রাখার আমৃত্যু রণে এসব মানুষের যে কমবেশি

---

[৩] তদেব, পৃ. ৮৯।

[৪] তদেব, পৃ. ১৭৫-১৭৬।

অবদান বা অনুপ্রেরণা রয়েছে তা অনুমান করা যায়; এবং বোঝা যায়, এমন স্মরণ প্রক্রিয়া, প্রশস্তিবচন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে, তাঁর মনের অসাম্প্রদায়িক-মানবিক বাতাবরণটি।

মানবতাবাদী চেতনায় রবীন্দ্রপ্রভাব

মানবতাবাদী চেতনা শামসুর রাহমানের কবিসত্তার একটি আদি মৌল ও অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এ বৈশিষ্ট্যের গোড়াপত্তনের মূলে না থাকলেও পরবর্তীকালে তিনিই মনে হয় এ ক্ষেত্রে প্রধান চালিকা শক্তি ছিলেন, যার স্বরূপটিকে পাশ্চাত্যের নাস্তিক হিউম্যানিজমের আস্তিক সংস্করণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে।[৫] তাঁর কাব্য-অভিযাত্রার এক পর্যায় থেকে মধ্যপথ অবধি সন্তর্পণে তাঁরই প্রভাব ছিলো কমবেশি – এ কথাও বলা যায় অন্তত 'মধ্যপথে কেড়েছেন মন/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন, সম্মিলিত তিরিশের কবি' – তাঁর 'আত্মজৈবনিক' নামের কবিতাটির এ জাতীয় বাক্যযোজনার এক ধরনের অর্থ করে। এমন উদাহরণ উপস্থাপন একটি সাধারণ উপায়মাত্র তাঁর রবীন্দ্রানুগত্য বিচারের, যার বিশেষ অনুসন্ধানে যতোটুকু বোঝা যায়, তাতে বলা যায়, প্রায় বাল্য থেকে বার্ধক্য বা মৃত্যু অবধি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ছিলেন আত্মস্থ করার একটি প্রধান বিষয়। কাব্যাদর্শের বিশেষ কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্যথা হলেও তাঁর কাছে তিনি ছিলেন মহৎ আবেগ অনুপ্রেরণা আদর্শের উৎস।[৬] তাঁর স্মৃতিচারণমূলক একটি কাব্যভাষ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়:

> চয়নিকার সঙ্গে যখন আমার চক্ষু মিলন হয়েছিল,
> তখন রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে
> শুধু একটা নাম। সে নামের আড়ালে কী মহান বিস্ময়
> দীপ্যমান, তা জানার জন্যে আমাকে পাড়ি দিতে হয়েছে
> দীর্ঘপথ। আমার নিজস্ব রবীন্দ্রনাথকে
> আমি আবিষ্কার করেছি ক্রমান্বয়ে
> অভিযানের দুর্বার নেশায়।[৭]

একই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, কবিতার সঙ্গে তিনি যখন ঘনিষ্ঠ জীবনযাপন শুরু করেন তখন উপহার হিসেবে পাওয়া 'সঞ্চয়িতা'র মধ্যে তিনি অনন্ত বা অসীমের প্রেমে দরবেশের মতো সমাধিস্থ হতেন। 'সূর্যাবর্ত'সহ পরবর্তীকালের আরও অনেক রবীন্দ্রপ্রশস্তিমূলক কবিতায় তার প্রভাব-পরিচয় রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য এখানে, ১৯৬১ সালে পাকিস্তান আমলের প্রতিকূল পরিবেশে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কবিতাটি তিনি আবৃত্তি করেছিলেন। ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ সালে রেডিও পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ হলে সীমিত সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর সাথে তিনিও প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ প্রেক্ষাপটটুকুর উল্লেখ এ কারণে যে, শুভবাদী বা মানবতাবাদী সত্তার সাথে শামসুর রাহমানের বাঙালি জাতীয়তাবাদী, প্রগতিবাদী ও প্রতিবাদী চেতনার যে একটি সংশ্লেষ ছিলো তার একটি ঐতিহাসিক সত্যতার তথ্য রয়েছে এতে।

মানুষে-মানুষে ভালোবাসার সম্পর্কের অবনতি ও অভাব থেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামাসহ সামাজিক রাজনৈতিক রাষ্ট্রিক অনেক সমস্যা দেখা দিতে থাকে, চেতনা ও কর্মকাণ্ডগত অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত

---

[৫] স্বরোচিষ সরকার, "কাজী আবদুল ওদুদের ধর্মনিরপেক্ষতা," *বিশ শতকের মুক্তচিন্তা* (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৮), পৃ. ৪১।

[৬] শামসুর রাহমান, "আত্মজৈবনিক," 'বিধ্বস্ত নীলিমা,' *কবিতাসমগ্র ১* (দ্বিতীয় মুদ্রণ; ঢাকা: অনন্যা ২০০৮), পৃ. ১৭৮।

[৭] শামসুর রাহমান, "কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি," 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি,' *কবিতাসমগ্র ১* (দ্বিতীয় মুদ্রণ; ঢাকা: অনন্যা, ২০০৮), পৃ. ৫৪৯-৫৫০।

রিবর্তন সাধিত হতে থাকে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে সে পরিবর্তন তিনি কমবেশি দেখেছেন, এবং ন্তিত ও মর্মাহত হয়েছেন, তা থেকে উত্তরণের জন্যে তিনি, বলা চলে, আকুল হয়েছেন। উত্তরণের ন্যে রবীন্দ্রচর্চা অনেকখানি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে শামসুর রাহমান মনে করেছেন, বং নানাভাবে তা ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এক স্থানে নজরুলের গজলসহ রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান' মানুষের ভালোবাসায় সঞ্জীবনী সুর আনতে পারে বলে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ রেছেন; যেমনভাবে করেছেন তিনি তা:

> মনে পড়ে, নজরুলী গজলের মোহন ছায়ায়,
> রবীন্দ্রনাথের
> অলৌকিক গীতবিতানের সীমাহীন মানবিক মমতায়
> আমাদের ভালোবাসা পেয়েছিল সঞ্জীবনী সুর
> মারী ও মড়কে দাঙ্গা হাঙ্গামায়, ক্রুর খুনখারাবির কালে।[৮]

সীমাহীন মানবিক মমতা'র কারণে 'বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে' রবীন্দ্রনাথকে মেলানোর এই যে প্রচেষ্টা া কেবল বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের উদ্ভবগত ইতিহাস দ্বারা সিদ্ধ নয়, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির াবহমানতা দ্বারাও সিদ্ধ ও শোধিত – যা অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য লালিত। সে ঐতিহ্য থেকে মকালীন মানুষজনের অনেক স্খলন পতন শামসুর রাহমানকে পীড়া দিয়েছে, এবং বিপরীতে তাদের বোধোদয়কল্পে 'নাক্ষত্রিক স্পন্দনে ভাসা রবীন্দ্রানুগ স্বপ্ন-হাঁসময় চৈতন্যের নীলকে' তিনি উন্মোচন রেছেন সর্বদা। যে শামসুর রাহমানের চোখের জলকে মুছিয়ে দেন স্বয়ং ররীন্দ্রনাথ, যাঁর আঁধার ঘরে য়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ চিরন্তন ঘ্রাণ, যাঁর কাছে পূর্বপুরুষের আশীর্বাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের গান, র অন্তর জুড়ে রবীন্দ্রনাথের অমর্ত্য পদধ্বনি, সে শামসুর রাহমানের কাব্যজগৎ বাংলাদেশের মানুষের সাম্প্রদায়িক-মানবিক মনোজগৎ সৃষ্টিতে সর্বতোভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।[৯]

শুভের বিরুদ্ধে শপথ ও সংগ্রামে অসাম্প্রদায়িকতা-মানবতা

ক স্মৃতিচারণসূত্রে শামসুর রাহমান নিজেকে পঞ্চাশের দশকের কবি হিসেবে চিহ্নিত করে নিজের বিজীবনের সূত্রপাতকালীন চেতনা ও প্রেরণাগত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'নিজেদের মতো রে লিখব, প্রগতিশীল, শুভবাদী চেতনা ধারণ করব – এমন সদিচ্ছাই আমাদের দিয়ে কবিতা লিখিয়ে য়েছে।'[১০] কাব্যভাষ্যেও প্রায় সমজাতীয় কথাই তিনি বলেছেন এক স্থানে; ভাষ্যটি এরকম:

> ধর্মীয় উন্মাদনার ঢাকের প্রবল আওয়াজ কখনো
> আমাদের টানেনি, সাম্প্রদায়িকতার
> দন্ত-নখর ভাঙার শপথ আমরা নিয়েছিলাম
> যাত্রালগ্নেই, জঙ্গি পুরুত আর মোল্লাদের হিংস্র চিৎকার
> আর প্রাণ সংহারের হুমকি উপেক্ষা করে

---

[৮] শামসুর রাহমান, "ফিরে আসি তোমার কাছেই," 'এক ফোঁটা কেমন অনল,' *কবিতাসমগ্র* ৩ (ঢাকা: নন্যা, ২০০৭), পৃ. ৪১১।

[৯] শামসুর রাহমান, "অরূপ নক্ষত্রলোকে," 'গন্তব্য নাই বা থাকুক,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ০০৭), পৃ. ৬১৯।

[১০] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা* (দ্বিতীয় মুদ্রণ; ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২০০।

আমরা ভালোবেসেছি লালন ফকির এবং রবীন্দ্রনাথের গান।[১১]

সাম্প্রদায়িকতার দন্ত-নখর ভাঙার যে শপথ তিনি কবিজীবনের গোড়ার দিকেই নিয়েছিলেন, তার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ তাঁর লালন ফকির আর রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি ভালোবাসা। এ প্রেক্ষিতেই তাঁর শুভবাদী দিগন্তের দিকে চাওয়ার প্রকৃতিটি গড়ে ওঠে। 'শুভবাদী দিগন্তের দিকে' বা 'শুভ চেতনার সূর্যালোকে' যাওয়া ও যেতে অনুপ্রাণিত করা তাঁর কবিমানসের একটি বিশেষ দিক। শুভবুদ্ধি যে আজকাল চারদিক থেকে ভীষণ আক্রান্ত, প্রতিক্রিয়াশীলতায় সন্ত্রাসে সারা জনপদ সন্ত্রস্ত, তা তাঁর মতো খুব কম কবি বা লেখকই অনুভব করতে পেরেছেন এ দেশে – বিশেষ করে প্রকাশ করতে পেরেছেন। অশুভ অধিকৃত মানুষের মনকে ক্রমাগত শুভের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার অন্ত ছিলো না। এমন মনে হয়, এর জন্যে মাঝেমধ্যে তিনি কবিতার মানের দিকেও তাকাতেন না। একটি মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন শুভবাদী মানবিক সমাজ রাষ্ট্র কামনার ঐকান্তিকতা কোন পর্যায়ে পৌঁছোলে এমনটি হওয়া সম্ভব তা বুঝে নেয়া কষ্টকর নয়। আর যখন তা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন তা কতোখানি আফসোস ক্ষোভ বা হতাশা বয়ে নিয়ে আসে তাও বুঝে ওঠা অসম্ভব কিছু নয়। এ প্রেক্ষিতে শামসুর রাহমানের হতাশা ও আশার স্বরূপগত একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে:

...এই প্রিয়
সোঁদা মাটি কামড়ে থাকতে হবে আরও কিছুকাল। মনে হয়,
সত্তর বছর স্বদেশেই নির্বাসনে আছি। অমাবস্যা
কেটে গিয়ে মানবিক পূর্ণিমায় দিকগুলি নেয়ে
উঠবে কখন, তার প্রতীক্ষায় শুভবাদী দিগন্তের দিকে
গভীর তাকিয়ে থাকি হাতে নিয়ে কবিতার মালা।[১২]

হতাশায় নিমগ্ন হলেও কখনো তিনি যে আশাহীন হয়ে পড়েননি, উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি থেকেই তা বোঝা যায়। তার পাশাপাশি কতোখানি ক্ষোভ যে তিনি লালন করতেন তাও একই সাথে অনুমান করা যায়। ঈপ্সিত মানবিক পূর্ণিমার বদলে চারদিক থেকে ধেয়ে আসা হিংস্র অন্ধকারকে, যাকে তিনি মাঝেমধ্যে 'বুনো তিমির' বা 'তালেবানী অন্ধকার' বলেছেন, দূর করার জন্যে তাঁর ক্ষোভ ও উচ্চারণ যে যথেষ্ট নয় তা তিনি অনুধাবন করেছেন। সমকালীন পরিস্থিতিতে আবেগে ভাষায় ও সামাজিক সংবেদনশীলতায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি পরিমাণ ক্ষোভ ও সংগ্রামশীলতার প্রয়োজন ছিলো বলেই তিনি বিদ্রোহী কবি নজরুলকে স্মরণ করেছেন। কুশাসন ভণ্ডামি পশ্চাদ্‌গামীদের আস্ফালন ইত্যাদিকে তিনি তিমিরের সাথে তুলনা করে তিমিরবিনাশী প্রগতির দীপ্ত সুরের প্রয়োজনীয়তার কথা আবেগভরে বলেছেন। কেননা তাঁর ভাষায় 'ব্যর্থতার কাদায়' ডুবে যাচ্ছে এ জাতীয় সব সাধারণ আয়োজন। ধীমানরা মূর্খদের বাচালতায় সবাক হতে পারছেন না তেমন। শুভবাদী সবার সবকিছুর যেন দ্রুত প্রস্থানের বা পরাজিত হওয়ার কাল এখন; কবিতায় কথাগুলো এমন:

শুভবাদী পুষ্পগুলি ঝরে যায় অতিশয় দ্রুত,
জানি আজ জাঁহাবাজ দানোদের পায়ের টোকায়
বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত কত বিদ্যাপীঠ , বোবা

---

[১১] শামসুর রাহমান, "সৈয়দ হকের উদ্দেশে," 'হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা ২০০৭), পৃ. ১৩২।

[১২] শামসুর রাহমান, "শুববাদী দিগন্তের দিকে," 'স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৩৬৬।

কান্নায় ত্রিলোক কম্পমান![১৩]

এমন সময়ের মধ্যেও তিনি শুভবাদী পুষ্প বিকাশের জন্যে আজীবন কলম চালিয়েছেন; এ কাজে তিনি ছিলেন নিরলস, অনেক সময় ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েও হতোদ্যম হননি। এমনকি 'ডাইনোসর উঠে এলেও' 'সর্বনাশের তোয়াক্কা না করেই' তিনি তাঁর পুষ্পবিকাশের কাজ করে যাবেন বলে শপথ করেছেন।[১৪] মানুষের মনের মধ্যে শুভবাদী সত্তার আবাসন হোক, মুক্ত মন ও মুক্ত জীবনের জন্যে যথোপযুক্ত একটি জায়গা হয়ে উঠুক তাবৎ সমাজ পরিবেশ – এ ছিলো তাঁর আন্তরিক কামনা। তেমন জায়গা একদিন না একদিন এ সমাজ পরিবেশ পৃথিবী হবেই – এমন বিশ্বাসও কখনো প্রকাশ পেয়েছে তাঁর। অনেক স্থানেই আশাহত কবি, তবে শেষ পর্যন্ত মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার প্রতি আশা বা বিশ্বাস না রেখে পারেননি তিনি; অনেক আশাহীনতা ক্ষুদ্রতার মধ্যেও তিনি বৃহতের উদ্ভাস না দেখে পারেননি।[১৫] একজন আশাবাদী মুক্ত মানবিক মনের অধিকারী মানুষই এমন করে ভাবতে পারেন এবং বলতে পারেন: 'নিশ্চিত জেনেছি,/বন্ধ্যা মাটিতেও মুক্ত মন ফোটায় অজস্র ফুল।'[১৬] মুক্ত মন হৃদয়ে সাগরদোলার ছন্দ আনে বা একজন মুক্তমনের অধিকারী মানুষই সাগরদোলার ছন্দ চাইতে পারেন, যেমন পেরেছেন কবি শামসুর রাহমান অশুভের সাথে আপোসবিহীন দ্বন্দ্ব চেয়ে, যে চাওয়ায় তাঁর শুভের পক্ষে থাকার আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়তার এবং অশুভের বিপক্ষে থাকার সাহসী মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর চাওয়াটি এমন: 'হৃদয়ে আমার সাগর দোলার ছন্দ চাই/অশুভের সাথে আপোসবিহীন দ্বন্দ্ব চাই।'[১৭]

শুভচেতনার সূর্যালোকে যাবে মানুষজন, মানবিক পূর্ণিমায় নেয়ে উঠবে চারদিক – এ আশায় প্রতীক্ষায় থাকা শুভবাদী দিগন্তের দিকে গভীর তাকিয়ে থাকা শামসুর রাহমান 'কবিতার মালা' গেঁথেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করার কথা ভাবেননি, বা তাতে স্বস্তিও পাননি।[১৮] তিনি তাঁর উদ্দেশ্যানুগ মিছিলে যোগ দিয়েছেন, অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন। 'নিজেকেই প্রশ্ন' নামক একটি কবিতায় তা তিনি ব্যক্ত করেছেন; বক্তব্যটি এমন: 'চুপচাপ/ঘরে বসে বই পড়া এবং কবিতা লেখা নিয়ে/ডুবে থাকাটাই/বস্তুত আমার কাজ, একথা জপিয়েছেন তারা। তবু আমি/সেসব কথার ভ্রমরকে দূরে ঠেলে অশুভের প্রতিবাদে হাত তুলে আকাশের দিকে/প্রোজ্জ্বল মিছিলে দৃঢ় হাঁটি অদ্যাপিও।'[১৯] আর একটি

---

[১৩] শামসুর রাহমান, "ইচ্ছেটাও মৃত," 'ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৫৮১।

[১৪] শামসুর রাহমান, "ডাইনোসর উঠে এলেও," 'নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৪১৯।

[১৫] এক স্থানে তিনি বলেছেন: 'বুঝি তাই মানবের সম্ভাবনা সুপ্রচুর সর্বকালে, শুধু চাই স্পর্শ সাধনার।' ("শুধু চাই স্পর্শ সাধনার," 'গোরস্তানে কোকিলের করুণ আহ্বান,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৭৭৩।)

[১৬] শামসুর রাহমান, "বন্ধ্যা মাটিতেও মুক্ত মন," 'নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৪১৪।

[১৭] শামসুর রাহমান, "শ্লোগান," 'আমার কোনো তাড়া নেই,' *কবিতাসমগ্র ১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৬১৫।

[১৮] শামসুর রাহমান, "শুভ চেতনার সূর্যালোকে যাও," 'টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ২৯৬।

[১৯] শামসুর রাহমান, "নিজেকেই প্রশ্ন," 'নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৩৮২।

কবিতায় স্পষ্টত তাঁর অনুপ্রেরণামূলক কথা রয়েছে, যার অবিকল গদ্যরূপ এমন – যদি কারো ঝোড়ো তাণ্ডব সন্ত্রাস দুর্নীতি ভণ্ডামি কুসংস্কার সাম্প্রদায়িক আগুন মানবিক ক্লেদ উগ্র মৌলবাদীদের উন্মত্ততার হিংস্রতা ধ্বংস করে তাহলে রবীন্দ্রনাথ না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রুদ্র গলায় আমি বন্দনার গীতিমাল্য পরিয়ে দেবো।[২০] এ ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে ঘোর অমাবস্যাতেও অস্তিত্বে অজস্র ক্ষত নিয়ে নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে অদম্য পথ হেঁটেছেন তিনি, যার দ্বারা তাঁর ব্যক্তি ও কবিসত্তার শুভবাদী দিকটির দার্ঢ্য সম্পর্কে বিশেষ ধারণা লাভ করা যায়, যার বিশেষ অঙ্গীভূত বিষয় – অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদ।[২১]

নেকড়ের মুখে পড়া আফ্রোদিতিকে অর্থাৎ পশু বা অশুভ শক্তির হাতে পড়া সৌন্দর্য ও প্রেমকে বা মানবতাকে রক্ষা করার তাঁর চেষ্টার ধারাবাহিকতায় তিনি নিজেও নেকড়ের মুখে পড়েছেন, তার কামড় খেয়েও তিনি স্বপ্ন দেখেছেন – রঙিন সুতোয় 'আশা-জাগর অগ্রগতির' ছবি এঁকেছেন।[২২] 'পারলে তোমরা একঘরে করতে/গোলাপ, চামেলী আর কৃষ্ণচূড়াকে।/পারলে তোমরা পাহাড়-চূড়া, নদীর ঢেউ/পাখির বাসা, জোনাকি আর/দু'টি হৃদয়ের মিলনের রঙিন সাঁকোর বিরুদ্ধে/লটকে দিতে হিসহিসে ফতোয়া' বলে যাদের প্রতি তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তাদের বিপরীত প্রকৃতির মানুষের প্রতিই তিনি আজীবন আগ্রহ দেখিয়েছেন।[২৩] শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, দান্তে, গ্যাটে, আরগঁ, লোরকা, মধুসূদন, নজরুল, জীবনানন্দ, এমনকি চণ্ডীদাস লালন প্রমুখের মতো জীবনকে দেখার আগ্রহকে তিনি সবল ও সচল রেখেছেন। এ জন্যেই সমকালে অনেকের মাঝে এক সময় সুরসাধক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওয়াহিদুল হকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে, এবং যা বলেন তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশংসা করে, তার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেরই আন্তর চিত্রটির একটি স্কেচ তৈরি করেন।[২৪] অসাম্প্রদায়িকতা প্রগতি বিশ্বমানবের কল্যাণ ইত্যাদি শামসুর রাহমানেরও কাম্য ছিলো; আর সত্য শিব ও সুন্দরের ধ্যান করাও তাঁর ছিলো স্বভাবগত। যাঁর আরাধ্য অ্যাপোলোর বাণী, যাঁর মগজের কোষে পোড়ে মোহন ধূপ, 'ঝর্না আমার আঙুলে' – বলে যিনি অঝোর ধারায় কলম চালান, সৌন্দর্যের গুণ গেয়ে দিন কাটাতে যাঁর ভালো লাগে, যিনি সৌন্দর্যের গহনে ডুবুরি হন, নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে যিনি পথ চলেন, যিনি গড়তে চান মর্ত্য আর অমর্ত্যের মধ্যে অলৌকিক সেতু, যিনি ভাবেন মানুষের মহামিলনেই মুক্তি, তাঁর পক্ষে ঐ ধ্যান স্বভাবগতই বটে।[২৫] তিনিই 'মানবতা প্রায়শই বধ্যভূমিতে চলেছে' বলে হাহাকার করতে পারেন, 'কবন্ধের যুগ' হলো শুরু প্রণতি জানাতে হবে মূঢ়তাকে' শুনে দুঃখ করতে পারেন, 'তোমার চৌদিকে গজরাচ্ছে/বটে হিংস্র অন্ধকার, তবু নিজেকে আলোর ধ্যানে,/সত্য-সুন্দরের সাধনায় মগ্ন রাখো নিত্য,

---

[২০] শামসুর রাহমান, "বৈশাখ বিষয়ক কয়েকটি পঙ্‌ক্তি," 'নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৩৮৬।

[২১] শামসুর রাহমান, "নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে পথ হাঁটি," 'নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৪১০।

[২২] শামসুর রাহমান, "স্বপ্ন গাঁথি," 'নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৪১১।

[২৩] শামসুর রাহমান, "ফুঁসে ওঠে ফতোয়া," 'উজার বাগানে,' *কবিতাসমগ্র ৩* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৫৮৬।

[২৪] শামসুর রাহমান, "ওয়াহিদুল হকের জন্যে," 'শুনি হৃদয়ের ধ্বনি,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৪২৭।

[২৫] শামসুর রাহমান, "অ্যাপোলোর জন্যে," 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে,' *কবিতাসমগ্র ১* (দ্বিতীয় মুদ্রণ; ঢাকা: অনন্যা, ২০০৮), পৃ. ৪২।

হও/নীলকণ্ঠ, ভালোবাসো, যাকে গাঢ় ভালোবাসা যায়' বলে আদেশ বা উপদেশ দিতে পারেন। 'শয়তানে ইজারা নিয়েছে' যে জমিন তার ওপরে বসেও তাই তিনি বলতে পারেন: 'আমার সামনে আততায়ী, পেছনে আততায়ী,/ডান-বাম দু'দিকই অরক্ষিত আমার।/ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র আমার নেই।'[২৬] সে অস্ত্র দিয়েই তিনি প্রতিপক্ষের হুঙ্কারকে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন 'স্তব্ধ করে দেবো প্রতিপক্ষের হুঙ্কার' বলে।[২৭]

সে অস্ত্র, যাকে তিনি 'মৌলিক ধনুক' বলেছেন, তা অর্জনের জন্যেও একটি অন্তর্গত যুদ্ধ প্রয়োজন। সে যুদ্ধে সামিল করার জন্যে সবাইকে, 'নীলিম-মনস্ক ঈগল' কবির সারা জীবন ধরে অনেক আয়োজন ছিলো। সে আয়োজনে সত্য সুন্দর কল্যাণ মঙ্গল আর স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার অনুভব ও বর্ণনায় তিনি ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। আমৃত্যু তিনি যেমন মানুষের ভালোবাসা পেতে চেয়েছেন, তেমনি দেওয়ার চেষ্টাও করে গেছেন। মানুষের নিঃশাস-প্রশ্বাসের মতোই ভালোবাসা বা প্রেমের কোনো গোত্র বা পদবি নেই, মানবতারও নেই। কাজেই এর অর্জন বা চর্চাই অসাম্প্রদায়িকতা বা মানবতার পথকে তৈরি করে, প্রসারিত ও মসৃণ করে। প্রেম, মানবতা বা এ জাতীয় যা-কিছুই হোক না কেন, তার মূলে একটি কোমল অনুভূতি সৌন্দর্যবোধ বা সুন্দরের চিন্তা কাজ করে। সুন্দরের বন্দনার মধ্য দিয়ে তিনি আবার সত্য আর কল্যাণের বন্দনা করেছেন। কল্যাণের বন্দনাই শুধু করেননি, কল্যাণ করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞও হয়েছেন। তিনি অন্ধকার হননের গান গেয়েছেন, 'রাজসিক ভঙ্গিমায়' চন্দ্রোদয়কে সম্ভব করেছেন বলে কখনো তিনি অনুভব করেছেন, এবং বলেছেন: 'অশুভের ডঙ্কা যত জোরেই বাজুক,/কল্যাণের বাঁশি আমি বাজাবো নিশ্চিত সুন্দরের তালে তালে।'[২৮] মানুষের কল্যাণচিন্তার আর এক নাম মানবতা; 'লোহার শেকলপরা ব্যথিত সে মানবতার' অসম্মান হীন অবস্থা দেখে 'কেন যে উন্মাদ হয়ে যাইনি' বলে তিনি তাঁর মনোগত গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সুন্দর ও কল্যাণের ধ্যানে মগ্ন থেকে এভাবেই মানবতাকে তিনি বুঝেছেন; মানবতা যে কেবল মনোগত বিষয় নয়, শুভবাদী সুন্দর মানবিক একটি সমাজ গঠনে তার যে বেশ বাস্তব প্রয়োগ-প্রতিফলনেরও প্রয়োজন রয়েছে তার কথাও তিনি উপলব্ধি করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পাবলো নেরুদা ও লোর্কার কবিতার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, পুরাণ পুরুষ প্রমেথিউসের ঔদার্য ও সাহসিকতায় তিনি মুগ্ধ ছিলেন, এ কালের অর্ফিউস হওয়ার জন্যে তিনি আজীবন সাধনা করেছেন, এবং ব্যথিত মানবাত্মার ক্রন্দন শুনে শুনে নিজের ভেতরে তিনি যেসাসকে অনুভব করেছেন। অনুভব করেছেন তাঁর কাম্য ইকারুসের বিপজ্জনক উচ্চতার 'অমরত্বের শিহরণ'। কিন্তু অপরাজিত শুভবাদের কবি শামসুর রাহমানের মধ্যে যন্ত্রণাবোধ ছিলো নানা স্তরে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক গভীর অমঙ্গলবোধ যার কারণ ভয়ঙ্কর মানুষ, ভয়ঙ্কর সমাজ, ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র এবং যার ফলে তিনি হয়ে উঠেছেন এক ভয়ঙ্কর আবির্ভাব বা অ্যাপোক্যালিপ্সের কবি।'[২৯]

---

[২৬] শামসুর রাহমান, "তুমি আমার সুরে," 'নায়কের ছায়া,' *কবিতাসমগ্র* ৩ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ২৬১।

[২৭] শামসুর রাহমান, "অন্যরকম যুদ্ধ," 'নায়কের ছায়া,' *কবিতাসমগ্র* ৩ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ২৩৭।

[২৮] শামসুর রাহমান, "কল্যাণের বাঁশি," 'হৃৎপদ্মে জ্যোৎস্না দোলে,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৫০০।

[২৯] খান সারওয়ার মুরশিদ, "শামসুর রাহমান রচনাবলি : ভূমিকা," অন্তর্গত *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে শামসুর রাহমান,* ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন সম্পা. (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ৫০-৫১।

শিল্প-সৌন্দর্য ভাবনায় মানবিক ব্যাপ্তি ও আন্তর্জাতিকতা

শিল্প, সাহিত্য, সৌন্দর্য এবং যাবতীয় নান্দনিকতা, প্রেম-ভালোবাসা মানবিক সম্পর্ক বা মানবতা – এসবের প্রতি নানা মাত্রায় নানাভাবে কবি শামসুর রাহমানের ব্যক্তিগত আকর্ষণ-অনুভব-শ্রদ্ধা-মূল্যায়ন-ব্যাখ্যা-দর্শন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নানা কবিতায় ও আলোচনায়। সবকিছুর ওপরে এসবের যে মানুষের জীবনে কতো প্রয়োজন তা আজীবন সাহিত্যসাধনা দ্বারা তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। নিজের জীবনে তিনি এসবের পরম মূল্যে বিশ্বাসী ছিলেন – তাঁর কাব্যভাষ্য শুধু নয়, অন্যান্য লেখা ও সাক্ষাৎকার মাফিকও এ কথা বলতে হয়। শিল্প সাহিত্য সৌন্দর্য প্রেম মানবিকতা ইত্যাদির যে সাধারণ ভাষা আছে, দেশকালাতীত মাত্রা আছে, একটি সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বা আন্তর্জাতিকতা রয়েছে, অর্থাৎ এসব যে কূপমণ্ডূকতা সীমাবদ্ধতা প্রথা সংস্কার সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির দ্বারা সম্পূর্ণ খণ্ডিত হওয়ার বস্তু নয় – সে বিষয়টির প্রতি তিনি সর্বদা সজাগ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা এমন মনোবৃত্তিকেন্দ্রিকই হয়ে থাকে। অসাম্প্রদায়িকতা মানবতা – এসবের বোধ তৈরি হয় এরকম মনোবৃত্তি থেকেই। উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ – এসব যে সমস্যা সৃষ্টি করে সমাজ রাষ্ট্রে, এমনকি গণতান্ত্রিক কোনো রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানেও তার সম্ভাবনা অনেকগুণে কমে যায় ঐ মনোবৃত্তি বা বোধ অর্জনের চেষ্টায় ও তা অর্জনে। শামসুর রাহমান এ দিকগুলোর প্রতি সর্বদা সমুন্নত দৃষ্টি রেখেছেন, এবং অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

'সৌন্দর্যকে তর্জমা করার অভিলাষ' শামসুর রাহমানের 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' থেকেই নয়, বরং তারও আগে তাঁর কবিজীবনের সূচনাকাল থেকেই। তার ফলশ্রুতিতে প্রথম কাব্যেই তিনি 'রুপালি স্নান' কবিতায় পিপাসায় কেবল 'আঁজলা-ভরানো পানীয়ের খোঁজ' তিনি চাননি, পাশাপাশি প্রকৃতির কোনো 'গভীর পাঁচালি' চোখ ভরে দেখতে চেয়েছেন। নারীর প্রেম, শিশুর হাসি, ইয়ার বন্ধু, শান্তিপ্রিয় মানবসমাজ – জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে এসব তিনি চেয়েছেন; দুপুরের চকচকে ধারালো রোদ্দুর, চরাচর স্নিগ্ধ করা শ্রাবণের মেঘ, জলধারা, মুক্তাঙ্গনের পুষ্পবিকাশ, পাখির উড়াল ইত্যাদিতে তিনি পুলক অনুভব করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে, এতেও তিনি বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই আশ্চর্য হয়ে এ নিয়ে হাজার বছরের সভ্যতার কাছে তিনি 'কী তাঁর গুনাহ' বলে প্রশ্ন তুলেছেন। পূর্ণিমা, প্রেমের গান, নৃত্যকলা, মুক্তপক্ষ মনন – এসবকে যারা বেআইনি মনে করে, এমনকি কবিদের পর্যন্ত যারা মিথ্যেবাদী আখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে তাদের দঙ্গলে সমাজ ভরে যাচ্ছে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আবার সূর্যোদয়ে গালিচা বেছানোর মধ্য দিয়ে সে আশঙ্কাকে অনেকটা দূর করাও যায় বলে আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন। একই প্রক্রিয়ায় স্বৈরাচার, ধর্মান্ধতা, অন্যায়-অবিচার, কূপমণ্ডূকতাও দূর করা যায় বলে তিনি মনে করেছেন। সূর্যোদয় মানে তো মুক্ত মন মনন, সৌন্দর্য সত্য সুরুচি মঙ্গল ও মানবিকতাময় মুক্তজীবনের জন্যে মুক্ত পরিবেশ গড়ার সার্বিক শুভারম্ভ ও তার স্বতঃপ্রবহমানতা। সব মিলিয়ে, কবির ভাষায় বলা যায়, শুভ চেতনার সূর্যালোকে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই এর জন্যে। সূর্যালোকে যাওয়ার আহ্বানটি কবির এমন:

> যদি চাও সুবাতাস বয়ে যাক এখানে সর্বদা
> মেধা ও মননে না লাগুক গ্রহণ কখনও,
> তাহ'লে নিরেট অন্ধত্বের হাতছানি
> হেলায় উপেক্ষা করে মুক্তবুদ্ধি আর শুভ চেতনার সূর্যালোকে যাও।[৩০]

---

[৩০] শামসুর রাহমান, "শুভ চেতনার সূর্যালোকে যাও," 'টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ২৯৬।

শিল্প সাহিত্য কবিতা প্রেমকে তিনি জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে সর্বদা মনে করেছেন। এক স্থানে বলেছেন তিনি: 'জেনেছি জগতে শিল্প আর জ্ঞানময় প্রেম বিনা নিরর্থক সবকিছু।' শিল্পেই মনের মুক্তি – নান্দনিক চেতনায় কখনো তিনি এও ভাবতেন। মানবাত্মার সর্বোচ্চ শিল্পীত রূপ মনে করতেন তিনি কবিতাকে। নারীর প্রতি প্রেম ও কাব্যের প্রতি প্রেমকে তিনি প্রায় একাকার মনে করতেন। তিনি কবিতাকে অশেষ রহস্যময়ী নারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নিজেকে তিনি 'কবিতা মাতাল তরুণ' হিসেবে ভাবতেন, এবং একটি কবিতায় তার স্বপক্ষে তিনি বলেছেন, কবিতা নামের নিরূপমার পেছনে সারা জীবন তিনি আপ্রাণ ছুটেছেন; এবং 'অরূপ রতন' কবিতায় তিনি এ মন্তব্য প্রদান করেছেন যে, তিনি শুধু এক শব্দ শিকারি প্রেমিক। মিল্টনের মতো শব্দের নন্দন বনে তিনি অবিনাশী জ্যোতি অনুসন্ধান করেছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল থামতে না বলা পর্যন্ত কোনো পরিস্থিতিতেই সে অনুসন্ধান তিনি থামাবেন না – এমন দৃঢ় উচ্চারণও তিনি করেছেন। কবিতার মাঝেই তিনি অরূপ রতন খুঁজেছেন। কবিতাই তাঁর একমাত্র গন্তব্য। প্রসঙ্গত খান সারওয়ার মুরশিদের একটি বক্তব্য:

> তিনি মেজাজ ও ভাষায় আধুনিক, প্রত্যয় এবং অনুভূতিতে রোমান্টিক, বিষয়বস্তুতে চিরকালীন এবং তাই ধ্রুপদী। তাঁর পরকাল নেই, কোনো অতীন্দ্রিয় জগৎ নেই, আছে এক অপূরণীয় সৌন্দর্যপিপাসা, এক উর্ধ্বমুখী টান 'নক্ষত্রলোক', 'মেঘপুঞ্জ' এবং 'নীলিমা'র দিকে। এ কি ইতিহাসের বাইরে, সময়ের বাইরে, এক কামনার জগৎ যেখানে যাওয়ার একমাত্র পথ কবিতা যা একটি কঠিন মানবিক কর্ম?[৩১]

এ কর্মে কোনো কূপমণ্ডুকতা বা বিশেষ কোনো সংস্কার ছিলো না তাঁর। পুরাণ ইতিহাস-ঐতিহ্য, এমনকি ধর্ম, সব ক্ষেত্রেই তেমন পরোয়া না করেই প্রবেশ করতেন। তিনি যখন বলেন – 'তোমার শরীর শবেবরাতের দীপের মতন/জ্বলে, চোখে অনন্তের আলো-ছায়া, আমিও নিশ্চুপ/বসে থাকি; দুর্লভ এ নান্দনিক লগ্ন ক্রান্তিকালে' – তখন বোঝা যায় ধর্ম সংস্কার ইত্যাদির বিপরীতে মানবসত্তার সৌন্দর্য কমনীয়তা নান্দনিকতা বা চিরন্তন মাধুর্যের দিকটিকে কোন সমুচ্চ স্থানে তিনি আসন দিয়েছেন।[৩২] এ ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিশ্ব ঐতিহ্য তাঁর আপন হয়ে উঠেছে, 'সবকিছুই সাবলীল ফোটে আমার কলমের আঁচড়ে' এমন কবিতার লাইনে তার সচেতন প্রকাশও রয়েছে।[৩৩]

পুরাণ ইতিহাস ঐতিহ্য অনুসন্ধানে ও তার ব্যবহারে এ ব্যাপ্তি তাঁর কবিমানসের ব্যাপ্তি নির্দেশকও বটে। বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাসসহ সারা বিশ্বের নানা ঐতিহাসিক তথ্য উপাদানও তাঁর কবিতায় প্রায়শ এসেছে। বিশেষ করে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের ইতিহাস তাঁর কবিতায় এমনভাবে এসেছে যার মধ্যে কেবল একটি বিশেষ উজ্জ্বলতাই দৃষ্টিগোচর হয় না, অনুভূত হয় আন্তরিকতা আবেগ ও শ্রদ্ধা। এখানেই তাঁর কবিমানসের অসাম্প্রদায়িক-মানবিক সত্তার অনেকটা শক্তির উৎস নিহিত। কারণ বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের উদ্ভব প্রেক্ষাপটের মধ্যে এমন কিছু ঐক্য সংগ্রাম ও সহাবস্থানমূলক ইতিহাস বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এ জাতীয় সত্তা মানস বা মনোবৃত্তি গঠনের সহায়ক। যদিও সমকালে অনেকাংশে তার উল্টোটি অবলোকন করেই হয়েছেন তিনি অনেক দুঃখিত – যার বহিঃপ্রকাশ এখন এ দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পরিচায়ক।

---

[৩১] তদেব, পৃ. ৫৮।

[৩২] শামসুর রাহমান, "কবিতাপাঠ," 'এক ফোঁটা কেমন অনল,' *কবিতাসমগ্র* ৩ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৪০৪।

[৩৩] শামসুর রাহমান, "এখনো খুঁজছি," 'নায়কের ছায়া,' *কবিতাসমগ্র* ৩ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ২৩৮-২৩৯।

এমন দুঃখবোধ যদি কোনো নাগরিকের সত্যিকারের হয়ে থাকে তাবে তাঁর আন্তর অবকাঠামোতে সাম্প্রদায়িকতার কোনো গাঠনিক প্রতিনিধিত্ব রয়েছে বলে বা থাকতে পারে বলে মনে করা যায় না। দুঃখিনী বর্ণমালার জন্যে তিনি দুঃখ করেছেন; জোর দিয়ে বলেছেন: 'বর্ণমালার রঙধনু মেখে আঙ্গিক গড়া কখনো ছাড়বো না।' গর্বভরে তিনি বলেছেন: 'যে দেশে ঝংকৃত হয়েছে/লালন ফকিরের একতারা, বেজেছে হাসন রাজার ঢোল,/যে দেশের বাতাসে ভাসে রাধারমণের গান,/আমি সে দেশের মানুষ।'[৩৪] সে দেশের প্রিয় পরিবেশ ছেড়ে ছুড়ে অন্য কোনোখানে তিনি যেতে চান না। কিন্তু মনোগত জ্ঞানগত অর্থে মানবসমাজের একজন সদস্য হিসেবে তিনি আপন দেশের বাইরে যেতে চান, এবং যানও। তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন: 'যে-দেশে কবির বাণী গভীর ধ্বনিত হয় প্রেমে,/শ্রমে নিত্য প্রাণে, সেই দেশই স্বদেশ আমার।'[৩৫] 'কবির বাণী' তো শুভবাদী চেতনা, মুক্তচিন্তা, মানব হৃদয়ের আবেগঘন অবাধ সুন্দর প্রকাশ; সে প্রকাশের পরিবেশ বিরাজ করে যে দেশে, সে দেশ তো যে কোনো কবির বা মুক্ত মানবিক মনের মানুষেরই স্বদেশ হওয়ার যোগ্য। সে রকম দেশ সন্ধানের সূত্র ধরেই যে সব দেশে ঐসব চেতনা বা সৌন্দর্য প্রকাশের অভাব রয়েছে বা জীবনযাপনগত নানা রকমের অস্থিরতা অসুবিধা রয়েছে, মানবতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে, সেসব দেশের জন্যেও তাঁর মানবিক সংবেদনশীলতা প্রকাশিত হয়েছে – ম্যানিলা, লেবানন, ভিয়েতনাম, বসনিয়া, সোমালিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, ফিলিস্তিন, ইরাক ইত্যাদি দেশের প্রসঙ্গে যা ধরা পড়ে। নিজ দেশ সম্প্রদায় ভালোমন্দ চিন্তার বাইরেও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নিজের এমন বিস্তার ঘটানো সব আধুনিক কবি বা কবির পক্ষে সম্ভব হয় না। তার সাথে সাহিত্যিক প্রকরণগত ও বিষয়বস্তুগত বিস্তার একই সাথে পাওয়া আরও দুষ্কর হয়ে ওঠে। সে বিস্তারের রাস্তায় পথিক কবি শামসুর রাহমান কবিজীবনের প্রায় শুরুতে একদিন সম্পাদকের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁর 'রুপালি স্নান' নামক বিখ্যাত কবিতাটির 'ঈশ্বর' শব্দটি পরিহার করেননি কাব্যস্বার্থে; তেমনি জীবন সম্পর্কে অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় মনন চিন্তায় অর্জিত নিজস্ব দর্শন দৃষ্টিভঙ্গিও প্রথাগত কোনো ধ্যানধারণা বা সংস্কারের চাপে ত্যাগ করেননি। তিনি মোটের ওপর, 'মোহন চুল্লীতে' পুড়ে পরিশুদ্ধ হওয়া ভাবনার পরম ভাষায় রূপান্তরিত যে রূপ কবিতা, তার যাবতীয় সত্তার সন্ধানে আমৃত্যু রত থাকা থেকে কখনো বিচ্যুত হননি; সে সূত্রে শুভবাদী বা অসাম্প্রদায়িক-মানবিক সত্তাও তাঁর থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি।

মর্মে মানবধর্ম

শৈশবে কোনটি ধর্মগ্রন্থ আর কোনটি সাহিত্যগ্রন্থ তার তফাত বিশেষ না বুঝলেও দুলদুলের কাহিনি বা দোকানের রক্তাক্ত দুলদুলের ছবি শামসুর রাহমানকে বেশ আকৃষ্ট করেছিলো। ছবির 'কে গোবিন্দ এবং কে রবীন্দ্র' না বুঝতে পারলেও পরবর্তীকালে তিনি 'কবি সার্বভৌম'কে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন।[৩৬] বুদ্ধগয়ার বুদ্ধ দ্বারা তিনি তেমন ভাবিত না হলেও তপোক্লিষ্ট শীর্ণ সিদ্ধার্থ দ্বারা বেশ ভাবিত হয়েছিলেন। Sermon on the Mount-এর যেসাস দ্বারা তিনি তেমন প্রভাবিত না হলেও প্রেম ও ত্যাগে উজ্জ্বল

---

[৩৪] শামসুর রাহমান, "প্রণতি জানাই," 'শুনি হৃদয়ের ধ্বনি,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৪২৬।

[৩৫] শামসুর রাহমান, "আত্মচরিত," 'এক ফোঁটা কেমন অনল,' *কবিতাসমগ্র* ৩ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৩৮৭।

[৩৬] শামসুর রাহমান, "প্রণতি জানাই," 'শুনি হৃদয়ের ধ্বনি,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৪২৬।

ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত ক্রুশবিদ্ধ যেসাস দ্বারা তিনি সারা জীবনে এতো বেশি প্রভাবিত-প্রাণিত হয়েছিলেন যে তাঁর কাব্য-অভিযাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাইবেলীয় এ চরিত্রটির উপস্থিতি সরব। তিনি তাঁর ব্যথিত কবিসত্তার প্রায় প্রতীকে পরিণত করেছেন চরিত্রটিকে। বঞ্চিত নিপীড়িত মানবাত্মার কথা বলতে গিয়ে প্রায়শই তিনি চরিত্রটির নানা মাত্রিক প্রয়োগ করেছেন; 'ক্রুশবিদ্ধ' শব্দটিও তিনি বহুবার ব্যবহার করেছেন। মানুষের সুকোমল প্রবৃত্তি বা হৃদয়বৃত্তি যে সব ব্যক্তি বস্তু ও বিষয় দ্বারা জাগ্রত অনুপ্রাণিত ও রক্ষিত হয় সেসবের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের গানকে তিনি 'পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ' বলেছেন। গান চলচ্চিত্র চিত্রকলা নারীসৌন্দর্য প্রেম – এসব কিছু তাঁর প্রিয় বিষয় ছিলো, কিন্তু সেগুলোকে অবশ্যই হতে হতো শিল্প-সুষমামণ্ডিত। অর্থাৎ নান্দনিকতাই ছিলো তাঁর কাছে শেষ কথা। যে কবিতা তাঁর কাছে ছিলো সবচেয়ে প্রিয় বিষয়, তার নান্দনিকতা বিধানে তিনি ছিলেন একাগ্র ও সংস্কারমুক্ত। এটি মূলত কবিতার ভাষা বা প্রকরণগত নান্দনিকতাই নয়, মানুষের মনে নান্দনিকতা বিধানের একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টা, যার মধ্যে চিত্তের আনন্দবিধানসহ তার নানামাত্রিক প্রসার ঘটানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা বিধৃত। প্রসঙ্গত বলা যায়, সে প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে যাওয়ার তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত।[৩৭] এ মানবিক আনন্দবিধানের প্রচেষ্টা, তাঁর মানসিক অবকাঠামোতে কখনো প্রথাগত ধর্মভাবনার এমন কোনো পুরু প্রলেপ পড়তে দেয়নি, যা সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হতে পারে। অথচ অন্যের মনোজগতে তার উপস্থিতি নিয়ে তাঁর কোনো আপত্তি রয়েছে, এমন কথা কোথাও তিনি বলেননি। পিতা-মাতার ধর্মপালনকে তিনি শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। আবার শ্রদ্ধার সাথেই তিনি স্মরণ করেছেন তাঁদের অসাম্প্রদায়িক আচার-আচরণকে। সে সূত্রেই তিনি শৈশব কৈশোর ও যৌবনের পথম পাদে যে বোধ-বিশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিলেন তার ওপর ভিত্তি করেই তিনি 'সাম্প্রদায়িকতা আমার দু'চোখের শূল' বা এ ধরনের অনেক কথা বলেছেন বললে হয়তো অনেকটা বাড়িয়ে বলা হতে পারে, কারণ এ বিষয়টি এতো সমাজ রাজনীতি রাষ্ট্র ইতিহাস ঐতিহ্য ধর্ম মন জগৎ ও জীবনযাপনগত ছোটোবড়ো বিষয়ের সঙ্গে জড়িত যে বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনদর্শনগত একটি গভীর স্থির সমৃদ্ধ বোধ অনুভূতি ও জ্ঞান লাভ না করলে খুব হলফ করে কেউ বলতে পারেন না যে তিনি অসাম্প্রদায়িক, এবং ভাবতে পারেন না যে তাঁর অসাম্প্রদায়িকতা অবিচল থাকবে আজীবন। অর্থাৎ বলার কথা হলো এই যে, তিনি তাঁর পরিণত জীবনের শুভবাদী সঞ্চয় দিয়েও তাঁর অসাম্প্রদায়িক সত্তার পুষ্টিসাধন করেছেন। যেহেতু শামসুর রাহমান ব্যাপক জীবনবাদী কবি, তাই জীবনকেই নানাভাবে সুন্দর করার সাধনা ছিলো তাঁর। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর সাধনা হলো ধুলোকে সোনা বানানোর সাধনা। আর যাদের সাধনা তার উল্টো তাদের তিনি কখনো 'লিলিপুট' বলেছেন, কখনো 'অর্ধমানব এবং অর্ধপশু' ইত্যাদি বলেছেন। তাদের দঙ্গলে সত্য সুন্দর সাম্যের স্বপ্ন দলিত হতে দেখে তিনি অত্যন্ত আহত হয়েছেন। তবু কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের পথ সুগম করার আজীবন চেষ্টা করেছেন, করেছেন তাবৎ সৌন্দর্যের স্তব – যখন অন্যান্যদের অনেকেই করেছে ম্যামনের স্তব। কন্দর্পের কণ্ঠস্বর নিয়ে গেয়ে গেছেন তিনি অসাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষতা মানবতার গান। আর সন্ত্রাস স্বৈরাচারসহ মৌলবাদ ধর্মান্ধতা এবং তাবৎ ধ্বান্তের প্রতি নিক্ষেপ করে গেছেন সর্বদা ঘৃণা ও ক্ষোভের বাণ।

শামসুর রাহমান আধুনিক কবি ছিলেন, তা হওয়ার আগে অবশ্যই তাঁকে আধুনিক মানুষ হতে হয়েছে; আর তার একটি প্রধান কথা হলো মানবতন্ত্র-নির্ভরতা। ছেলেবেলায় স্কুল শিক্ষক চিন্তাহরণ

---

[৩৭] রবীন্দ্রনাথের আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে যাওয়ার তাঁর ইচ্ছের প্রকাশ ঘটেছে 'দিগন্তের অন্তরালে,' 'রবীন্দ্রনাথ সমীপে খোলা চিঠি' ইত্যাদি কবিতায়।

সোমের সংস্পর্শে তিনি সে চেতনার অধিকারী হয়ে উঠেছেন – এমনটিই তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়। তাহের আর সূর্যকিশোরের মধ্যে চেহারাগত পার্থক্য ছাড়া আর কোনও পার্থক্য খুঁজে পাননি তিনি তখন থেকেই। মানবতন্ত্রের মূলকথা এখানেই। মানবকল্যাণ চিন্তা ও মানবসৌন্দর্যের যাবতীয় প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা একজন মানবতাবাদী মানুষের, বিশেষ করে একজন কবির ধর্ম। 'A poet has no religion'- এ পর্যন্তও কবি শামসুর রাহমান ১৯৯৩ সালে দেওয়া তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন।[৩৮] তাঁর ক্ষেত্রে জাতি সম্প্রদায় বা অন্য কোনো ভেদ বিচার্য নয়। এ আলোকেই শামসুর রাহমানের ধর্মচিন্তার ধরন সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এ ধারণার একটি প্রধান দিক এমন – ধর্ম মানুষের জন্যে, ধর্মের জন্যে মানুষ নয়। শামসুর রাহমান বলেন:

> আমি মনে করি ধর্মতো মানুষের জন্যই – ধর্মের জন্য মানুষ নয়। এবং মানুষকে সংকীর্ণতামুক্ত হতে হবে। গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হতে হবে। কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে হবে এবং সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য মানুষকে কাজ করতে হবে। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান – এটাকে আমি বড় করে দেখবো না। মানবজাতি যে একটা বিরাট জাতি, সে-জাতির আমিও একজন সদস্য এ-হিসেবেই আমি নিজেকে মূল্যবান মনে করি এবং অন্যদেরও সে রকমই মূল্যবান মনে করি। সব মানুষের মধ্যে একটা সমতা আসা উচিৎ।...এটাই আমার মূলমন্ত্র।[৩৯]

মানবজাতির অংশ হিসেবে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এই যে প্রবণতা, এখান থেকেই তাঁর মর্মের একটি সারমর্ম গ্রহণ করা যায়। 'মানুষ ধর্ম' বা মানবধর্ম হলো তাঁর ধর্ম। এ ধর্ম মানুষের পরকাল নির্ভরতাকে ভিত্তি করে নয়, মানুষের হৃদয়জাত গভীর সংবেদনশীলতাকে ভিত্তি করে মানুষকে ভালো মানুষ হতে বলে বা পারস্পরিক সম্পর্কের এমন কিছু বিধিসূত্র নির্দেশ করে যার দ্বারা মানবসমাজের মনোজাগতিক শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিত হয়। কেননা মানুষের স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস তো কম নয়। কতো না ধর্ম সংস্কার মতাদর্শ উত্থিত হলো এ পৃথিবীতে মানুষের শান্তি বিধানে, কিন্তু মানুষের বিভেদের বেড়াজাল রয়েছে এখনো প্রায় অবিকৃত। এমন প্রেক্ষিত বাতাবরণে মানবচেতনায় শ্রদ্ধাবান হওয়াই শ্রেয়। মানবচেতনার প্রবল বিকাশ ও স্বাধীনতায় মানুষের যে উপকার হয়, এ বিষয়ে শামসুর রাহমান দ্বিধান্বিত ছিলেন না। ইতিহাসের কিছু বিশেষ বিষয়ের গতিপ্রকৃতির প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টিনিক্ষেপ করে অনেকটা দুঃখ পেয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত মানুষের একান্ত আপন মানবিক সম্ভাবনায় বিশ্বাসী হয়ে এক স্থানে বলেছেন:

> ...কত মতাদর্শ বিভ্রান্তির ঝড়ে
> সুপ্রাচীন হাবেলির মতো ধুলায় লুটায়। কিন্তু আমি
> মানবতন্ত্রের পায়ে অকম্পিত সাধনার নৈবেদ্য সাজাই।[৪০]

---

[৩৮] William Radice, "Obituary Shamsur Rahman: Visionary Poet of Bangladesh's Freedom Struggle, without Vanity or Affection," অন্তর্গত *অন্য আলোয় শামসুর রাহমান*, প্রত্যয় জসীম সম্পা. (ঢাকা: জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ২০১১), পৃ. ২৯৬।

[৩৯] আবুল আহসান চৌধুরী (সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী), "অন্তরঙ্গ শামসুর রাহমান (সাক্ষাৎকার)," অন্তর্গত *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে শামসুর রাহমান*, ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন সম্পা. (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯), পৃ. ৩০৩।

[৪০] শামসুর রাহমান, "নৈবেদ্য সাজাই," 'মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই,' *কবিতাসমগ্র* ৩ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৬৬৩।

মানবতন্ত্রের পায়ে বা মানবহৃদয়ে অকম্পিত সাধনার নৈবেদ্য সাজানোর এ আত্মপ্রকাশমূলক তথ্য থেকে শামসুর রাহমানের ব্যক্তি ও কবিসত্তা, কাব্যসাধনার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগতির এক শীর্ষ বা বিশেষ ধাপে উপনীত হওয়া যায়। তাঁর কাব্যসাধনার গন্তব্য এমন একটি এলাকায় 'যেখানে পূর্ণিমা-চাঁদ চুমো খাবে আসমান, নদী, মাটি আর মানুষকে।' নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে পথ হাঁটেন, পুষ্পবিকাশের বা ধুলোকে সোনা বানানোর সাধনা করেন যে মানুষটি তাঁর গন্তব্যতো এমনই হওয়া উচিৎ। অনাচার অবিচার কূপমণ্ডূকতা স্বৈরাচার ধর্মান্ধতা – এসবের বিরুদ্ধে কথা বলার ও দাঁড়ানোর সাহস সদিচ্ছা ও অন্যদেরকে সেভাবে প্রস্তুত করার একাগ্র ইচ্ছে এমন গন্তব্যের পথনির্দেশক নিশ্চয়।

শামসুর রাহমান তাঁর পথ ও গন্তব্যের অন্তরায় সবকিছুর বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সামরিক-বেসামরিক স্বৈরাচারী বা বকধার্মিক শাসকসহ 'কুসংস্কার-পসারী' ধর্মান্ধ মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে প্রায়শ দায়ী করেছেন। এমন দায়ী করার পেছনে তাঁর নাস্তিকতা আবিষ্কারের সুযোগ হয়তো রয়েছে কারো কারো কাছে। কেউ কেউ সুধীন্দ্রীয় নাস্তিকতা আবিষ্কার করেছেন তাঁর মধ্যে; তিনি নিজেই এক স্থানে নিজেকে নাস্তিক বলেছেন। এ কথা কতোখানি মানবীয় আস্তিক্যবোধ জাত, তা না বুঝলে তাঁর আন্তর ধর্মকে চেনা যাবে না। তিনি অদৃশ্য কোনো শক্তির প্রতি অন্ধ ভক্তিতে নয়, মানব মনের গীতসুধারসে ভাসতে চেয়েছেন ও ভাসাতে চেষ্টা করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় তিনি বলেছেন: 'অকপট নাস্তিকের সুরক্ষিত হৃদয় চকিতে/নিয়েছ ভাসিয়ে কত অমলিন গীতসুধারসে।'[৪১] মুক্তমনের চর্চার এমন মুক্তোর আলো বিচ্ছুরণকারী চেষ্টা ও উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে অল্পই আছে। ছায়াচ্ছন্ন খানকা শরীফ ছেড়ে রোদেলা রাস্তায় উঠে আসা এক যুবকের মনের মুক্তির কথা রয়েছে যে কবিতায় তার মধ্যে আরও রয়েছে:

> ...গোধূলি বুলায় হাত ওর
> অশান্ত মাথায়, হাওয়া চুলে বিলি কাটে, ভেসে আসে
> ফুলের সুঘ্রাণ, যুবকের মন মুক্তির সন্ধান পেয়ে যায়
> কবিতায়, নারীর হৃদয়ে আর মানুষের আনন্দমেলায়।[৪২]

অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষ আর মানুষের আনন্দময় সম্পর্ক সাহচর্য – এসবের মধ্যে যে সৌন্দর্য, শান্তি ও আত্মিক বিকাশের অবকাশ রয়েছে তা মানুষকে মুক্তি দেয়। মানুষের সৃষ্টি নয়, এমন ধারণায়, কোনো কিছুর ওপর যতো বড়ো মহত্ত্বই আরোপ করা হোক না কেন, তার চর্চার স্থল কিন্তু মানুষের হৃদয় মনন, কাজেই সে স্থলটি যদি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যায় মুক্ত চিন্তা ও হৃদয়বৃত্তির অভাবে তা হলে সে মহান জিনিসটিরই মাহাত্ম্য কমে যায় – পরোক্ষে এমন একটি কথার নির্যাসও লাভ করা যায় কবিতাটি থেকে। অথচ একজন কবির যে একটি বিশেষ সামাজিক-মানবিক দায়বদ্ধতা থাকে তার দরুনই তিনি আবার কখনো কারো স্বাভাবিক ধর্মপালন বা ধর্মাচার নিয়ে কোনো কটাক্ষ বা ঐ জাতীয় কোনো কিছু করেননি। তিনি যখন তাঁর স্ত্রীর ধর্মপালন নিয়ে লেখেন: 'জায়নামাজে বসে তিনি আমার/মঙ্গল কামনা করেন প্রত্যহ দু'হাত তুলে,/তখন ওর কাপড়-ঢাকা মাথা/নীলিমাকে স্পর্শ করার স্পর্ধা রাখে' – তখন ধর্মপালন বিষয়ে তাঁর কটাক্ষের বিপরীত কোটিরই একটি দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করা অসম্ভব হয় না।[৪৩]

---

[৪১] শামসুর রাহমান, 'রৌদ্র করোটিতে,' *কবিতাসমগ্র* ১ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ২৫৬।

[৪২] শামসুর রাহমান, "একজন যুবকের কথা," 'সৌন্দর্য আমার ঘরে,' *কবিতাসমগ্র* ২ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ৩২৬।

[৪৩] শামসুর রাহমান, "ম্যাগাজিনে আমার স্ত্রীর সাক্ষাৎকার পড়ে," 'খণ্ডিত গৌরব,' *কবিতাসমগ্র* ২ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৬), পৃ. ৫৮৩।

অবশ্য এখানে শুধু ধর্মীয় ইতিবাচকতা নয়, মানবিক ইতিবাচকতার দিকটিও লক্ষণীয়; এবং এ দিকটির প্রতি বিশেষ আগ্রহী ও দায়বদ্ধ থাকার ফলেই, মনে করা যায়, মুক্তমন, চিন্তা, মানবিক বোধের জগতে সর্বত্র অবাধ প্রবেশ যাতে মানুষের ঘটে, অন্ধতা বা অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকে কোনো নেতিবাচক উপসর্গের আবির্ভাব না ঘটে – সে ইচ্ছে বা কামনা তাঁর জাগ্রত বা বলবৎ থেকেছে; ফলে কলমের আঁচড়ে চিত্তের ও চিন্তাজগতের প্রসার ঘটাতে চেয়েছেন তিনি আধুনিক কালের একজন আধুনিক মানবিক কবি হিসেবে – প্রথাগত ধর্ম দর্শনসুলভ তেমন কোনো কথা না বলে। ধর্মান্ধতা, ধর্ম নিয়ে ভড়ং, রাজনীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সরাসরি তিনি অনেক কথা বলেছেন, যার মধ্যে তাঁর ক্ষোভ ঘৃণার যে উত্তপ্ত প্রকাশ রয়েছে তা থেকে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের আরও এক আঙ্গিকের স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়, সাথে সাথে তাঁর মানবধর্মের লক্ষণাদি সম্পর্কেও আরও অনেকটা অবগত হওয়া যায়। সে অবগতির পথে ভূমিকা রাখে এমন কবিতাগুলোর মধ্যে 'বেজে ওঠে আলোর ঝংকার' বিশেষ একটি।[৪৪]

সিদ্ধার্থ, জেসাস, চণ্ডীদাস প্রমুখের নাম ও প্রসঙ্গের অনেক প্রশ্রয় রয়েছে তাঁর কাব্যে, কিন্তু তা প্রথাগত ধর্মের কারণে নয়, তাঁর মনের স্বরূপ ও মানবিক বোধের নানা রূপের উন্মোচন ও তার মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যে। তার মধ্য দিয়ে যে জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তা মানবতন্ত্রমুখী – সত্য সুন্দর মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা ও তার অর্জনের চেষ্টা বা চর্চাই তার মূল কথা। এ কথার অন্তত একটি সাক্ষ্য এমন: 'গৃহকোণে জ্ঞানান্বেষী সাধকরে মতো/সুন্দর ও কল্যাণের ধ্যানে মগ্ন ছিলাম সর্বদা।'[৪৫] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বাউল-সুফিদের সহজ-সরল জীবনদর্শন ও জীবনাচরণ সম্পর্কে তাঁর মনে এক ধরনের ইতিবাচকতা ছিলো বলে মনে হয়। এমন মনে হওয়াকে বেশ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর 'আমার অন্তরে বাউলের গোপীযন্ত্র/বাজিয়ে চলেছে মনের মানুষের আগমনী সুর' – এ জাতীয় পঙ্‌ক্তি।[৪৬] বাউলতত্ত্বের মনের মানুষের খোঁজ কবি কতোখানি করতেন বা আদৌ করতেন কিনা সে বিষয়ে খুব স্পষ্টত বলা না গেলেও, অন্তত পার্থিব প্রকৃষ্ট মানুষের খোঁজ যে তিনি করতেন এবং আজীবনই যে করে গেছেন তা তাঁর কাব্যজগতে সহজপ্রাপ্য। সে প্রেক্ষাপটেই মনে করা যায় তিনি লালন, জালালউদ্দিন রুমি প্রমুখের নাম নিয়েছেন তাঁর কবিতায়; একটি কবিতায় পাওয়া যায়:

> খানকায় জানি অমূল গোলাপ জ্বলে,
> বাউলতত্ত্ব অজানা, এমন নয়;
> রুমির ঐশী প্রেমের কিরণ-ঢেউ
> কখনো আমারও মন-পিদ্দিমে বয়।[৪৭]

আবার একই কবিতায় নিখাদ কবুল করেই তিনি বলেছেন, মধ্যরাতে মসজিদে এবাদতি মহাক্ষণে যে জিকির চলে তাতে তাঁর চিরসংশয়ী মন মজে না। তবে মানবধর্মে যে তাঁর মন মজেছে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যার পক্ষে সরাসরি শতেক উদাহরণ দেয়া যায়। মূলত তাঁর কাব্য-অভিযাত্রাই

---

[৪৪] শামসুর রাহমান, "বেজে ওঠে আলোর ঝংকার," 'ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ১৫৮।

[৪৫] শামসুর রাহমান, "ডাঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড," 'টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকে,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ২৯৭।

[৪৬] শামসুর রাহমান, "জানালার কাছে," 'এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা,' *কবিতাসমগ্র* ৩ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৬১৭।

[৪৭] শামসুর রাহমান, "ধ্যানের প্রহর," 'ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই,' *কবিতাসমগ্র* ৩ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৩৭৯।

ছিলো মানবমুখী, মানবতায় বিশ্বাস ছিলো তাঁর কবিমানসের বড়ো লক্ষণ। মানুষে-মানুষে ভালোবাসার এক অনুপম পরিবেশ বিরাজ করবে এ পৃথিবীতে – এ তিনি আমৃত্যু চেয়েছেন এবং তার পক্ষে কবি হিসেবে যতোখানি করা সম্ভব তা করার কার্পণ্য করেননি। ভালোবাসার শক্তির প্রতি তাঁর ছিলো অগাধ বিশ্বাস, বিশেষ করে তাঁর নিজের ভালোবাসার শক্তির প্রতিতো বটেই, যা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর এ ভাষ্যে: আমার মধ্যে/ভালোবাসার সেই দ্যুতি ঝিকিয়ে উঠেছে যা, মানবতার অনুপম/ঐশ্বর্যের সন্ধান দেয়, ঝর্নাতলার নুড়িকে নক্ষত্রে/রূপান্তরিত করার ক্ষমতা ধরে।'[৪৮] প্রেম-ভালোবাসার প্রতি এ অগাধ বিশ্বাস শ্রদ্ধা তাঁকে বৈশ্বিক ভালোবাসার বা মানবতার একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। সে পর্যায়েরই একজন কবির পক্ষেই মানানসই এ কথা: 'আমি মানব সন্তান।'[৪৯] 'পান্থজন' কবিতার পঞ্চম পথিকের মুখে উচ্চারিত এ কথা কবিরই আত্মগত উচ্চারণ। এ অনুভব উপলব্ধিই তাঁর যাবতীয় মঙ্গল কল্যাণচিন্তা বা শুভবাদিতার উদ্ভবস্থল। জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক এ উপলব্ধি বা বোধ তাঁকে সাহসীও করে তুলেছে। তাই জীবনগত অনেক সমস্যা ঝুঁকির মধ্যে বসেও তিনি ফুল পাখি সৌরভের কথা শোনেন, যা বলেন তিনি এভাবে: 'দুই আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে/আমি কান পাতি গোলাপ আর চন্দনের ব্রতকথায়।'[৫০]

সাম্প্রদায়িক ঘটনায় ক্ষোভ ও মানবিক উচ্চারণ

গোলাপ আর চন্দনের ব্রতকথা শোনায় কান যাঁর অভ্যস্ত, সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি মানবসমাজের একটি উদ্ভট অনভিপ্রেত অরুচিকর চর্চা বলে সাব্যস্ত করবেন – এটাই স্বাভাবিক। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠা একটি সুকঠিন ব্যাপার; তেমন হয়ে ওঠার চেষ্টা এবং কমবেশি সফলতার মধ্যেই মানুষের প্রগতিশীলতার পরিচয়। কিন্তু এ পরিচয়ের সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতার ছোবল হেনে মানুষ যখন তার স্বাভাবিক পরিচয়কে বিকৃত ও খণ্ডিত করে বা নিজেকে পশুতে পরিণত করে তখনই মানুষ সমাজ ও সভ্যতার বড়ো ক্ষতি হয়। এটি একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রহনন করে। সম্ভবত একটি শুভবাদী সমাজের শ্লীলতাহনি সে আগে করে, তারপরেও সে সমাজের কিছু বিশুদ্ধ অংশ টিকে থাকে পুরো সমাজের সামনে আলোকিত দিঙ্‌নির্দেশনা স্বরূপ। সে বিশুদ্ধ অংশেরই একজন ছিলেন কবি শামসুর রাহমান, যাঁকে কবি মহাদেব সাহা 'বিবেকের কণ্ঠস্বর' বলে অভিহিত করেছেন।[৫১] তাঁর মতো শক্তিশালী ও মেধাবী কবির আবির্ভাব না ঘটলে 'তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী কবিতার ধারাকে সরকারি মহল এবং প্রতিক্রিয়াশীল প্রবীণ কবি-সাহিত্যিকদের মিলিত হামলার মুখে টিকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হতো।'[৫২] সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নামে বাংলাদেশে যাদের চিহ্নিত করা হয় তাদের প্রতি তাঁর ছিলো সর্বদা সজাগ সহানুভূতিশীল মনোভাব। অন্য সম্প্রদায়ের হিসেবে

---

[৪৮] শামসুর রাহমান, "বদলাতে থাকে," 'ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ১৬৩।

[৪৯] শামসুর রাহমান, "পান্থজন," 'এক ফোঁটা কেমন অনল,' *কবিতাসমগ্র* ৩ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৩৯৭।

[৫০] শামসুর রাহমান, "অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই," 'অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই,' *কবিতাসমগ্র* ৩ (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ২৭৯।

[৫১] মহাদেব সাহা, "স্বপ্ন-বাস্তবের এক বিভোর পথিক," অন্তর্গত *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে শামসুর রাহমান*, ভূঁইয়া ইকবাল ও রেজাউল করিম সুমন সম্পা. (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯), পৃ. ২৫৪।

[৫২] আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, "আমি আগস্ট মাসটাকে বড় বেশি ভয় করি," অন্তর্গত *অন্য আলোয় শামসুর রাহমান*, প্রত্যয় জসীম সম্পা. (ঢাকা: জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ২০১১), পৃ. ১৬।

নিজেকে অনেক সময়ে তিনি দোষী মনে করেছেন, অনেক সময় মনে করেছেন ব্যর্থ। অবশ্য তিনি তাঁর কাব্যভাষ্য থেকে শুরু করে পুরো জীবনভাষ্যে যতোখানি পরিচয় দিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর, তাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে করা যায় না। তাঁর 'একজন শ্যামলের উক্তি,' 'সুধাংশু যাবে না,' 'সূর্যকিশোরের উদ্দেশে,' 'দুই বন্ধুর কথা,' 'তোমরা পালিয়ে যাবে?,' 'কবন্ধ তাণ্ডব,' 'এই আর্ত বর্তমান,' 'মিহিরের উদ্দেশে,' 'বেঁচে থাকতে চাই' ইত্যাদি কবিতায় তাঁর জীবদ্দশার প্রায় পুরো সময় ধরে ঘটে যাওয়া বাইরের ও অন্তরালের নানা সাম্প্রদায়িক ঘটনার ও তার শিকার জনগোষ্ঠীর জীবনযন্ত্রণার যে কিছু খণ্ডচিত্র ধরা পড়েছে তার মধ্য দিয়েই সাম্প্রদায়িকতা ও তার নেতিবাচক ফলাফলের অখণ্ড চিত্রটির অনেকটাই বুঝে নেওয়া যায়। কারণ হলো, বিষয়বস্তুর কাব্যিক বয়ানের সাথে তাঁর সততা আন্তরিকতা, ব্যক্তিগত ক্ষোভ দুঃখ আবেগ ও দায়িত্ববোধের বিশেষ সংশ্লেষ।

এ দেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান, এমনকি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সবাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বলে স্বীকৃত। শ্যামল, হরিনাথ সরকার, মিহির, শেফালী, বীথি, মেনকা, দেবনাথ, গৌতম, অনিমেষ, সুতপা, প্রমীলা, অবিনাশ, সুধাংশু, সূর্যকিশোর – এরা সবাই উল্লিখিত কবিতাগুলোর বিভিন্ন চরিত্র, যারা হিন্দু সম্প্রদায়ের, এবং যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক আক্রোশের শিকার হয়েছে।[৫৩] বাড়িঘর-মন্দির লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ জবরদখল ধর্ষণ হত্যা ইত্যাদির কারণে তারা কিভাবে সন্ত্রস্ত জীবন যাপন করেছে, বাস্তুভিটাহীন বা দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়েছে তার বেদনাদায়ক চিত্র রয়েছে কবিতাগুলোর বর্ণনায়। অনেক উদাহরণ দেয়ার সুযোগ নেই, শুধু নমুনাস্বরূপ একটি উদাহরণ দেয়া গেল:

> তোমাদের বান্ধব শ্যামল আমি, ভীরু এক নিরস্ত্র যুবক
> এ দেশের, পলাতক পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা থেকে, যেখানে রয়েছে
> নিঃস্পন্দ, নিষ্প্রাণ পড়ে বিধবা মা, হিংসা আর লালসা-তাড়িত
> নরপশুদের সমবায়ী নিপীড়নে
> আমার কুমারী বোনটির কলঙ্কিত, প্রতিবাদী লাশ – এই দৃশ্য
> দেখে কাঁপে আকাশ এবং ভাঙা চাঁদ কান্নায় লুকায় মুখ![৫৪]

শেষোক্ত পঙ্‌ক্তিতে প্রকৃতির ওপর যে সংবেদনশীলতার আরোপ করেছেন কবি, তা মূলত তিনি করেছেন মানুষের অত্যন্ত নিষ্ঠুর অসভ্য প্রকৃতিকে পরিস্ফুট করার জন্যেই। এ কবিতাটিসহ অন্যান্য কবিতায় বর্ণিত বিষয়ের সাথে কবির আত্মলগ্নতা ও সহমর্মিতামূলক মনোভাবের যে মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায় তা কাব্যভাষ্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার সুযোগ দেয় না। কবি যখন বলেন – সংখ্যালঘুদের নীরব দেশত্যাগ বন্ধ হয়েছে – এ কথা শোনার জন্যে তিনি ফিনিক্স পাখির মতো বারবার বেঁচে উঠতে চান, তখন আর সন্দেহ থাকে না যে, তিনি সত্যিসত্যিই সংখ্যালঘুদের সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ও নিশ্চিত ছিলেন, এবং সে বিষয়ে তিনি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন ছিলেন; এমনকি তাদের মঙ্গল কামনায় তিনি যে নিতান্ত মগ্ন ছিলেন – এও ঐ ইচ্ছেটির মর্মার্থলগ্ন। হৃদয়ের ছেঁড়াতন্ত্রী নিয়ে তিনি যখন বলেন – 'শোনো বীথি, তোমাদের এই মাটি গাছপালা' – তখন তাঁর মঙ্গলকামনার মঙ্গল ঘট যে কানায় কানায় পূর্ণ ছিলো সে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এ কারণেই

---

[৫৩] উল্লেখ্য এখানে, "লক্ষ্মীবাজারের রৌদ্রময় অন্ধকারে" কবিতায় খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং 'দুই বন্ধুর কথা'য় আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা রয়েছে।

[৫৪] শামসুর রাহমান, "একজন শ্যামলের উক্তি," 'ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৫৩৮।

প্রলয়ের স্বেচ্ছাচারে সংখ্যালঘুদের বাস্তুভিটা পুড়ে যাওয়া, বীথি আর মেনকার ধর্ষিতার টিকলি কপালে বয়ে বেড়ানো, দেবনাথ ও গৌতমের তাজা রক্তে নিকানো উঠোনের ভেসে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা তাঁর কানে আসে, আর তিনি সমব্যথী হন, সমবেদনা জানান, লেখেন প্রাগাঢ় সহমর্মিতা শুভবোধ আর মানবিক মূল্যবোধপূর্ণ পঙ্‌ক্তিমালা 'পাথরের মতো নিশ্চুপ' না থেকে। তিনি যে কতোখানি সাম্প্রদায়িকতা ধর্মান্ধতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছিলেন তা সহজেই নিরূপিত হতে পারে এসব থেকে। সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের তিনি লুটেরা পশু ঘাতক দস্যু ধুরন্ধর শেয়াল, অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক নেকড়েরূপী জীব, কবন্ধ ইত্যাদি বলেছেন; এসব বিশেষণ বা রূপকরাজি সাম্প্রদায়িকতার প্রতি তাঁর ঘৃণা ও ক্ষোভের বিশালকায় রূপকে মূর্ত করে তোলে। সে রূপ খুব কম মানুষের মধ্যেই রয়েছে, যাঁদের মধ্যে রয়েছে কেবল তাঁরাই ব্যর্থতার প্রেতছায়ার বিভীষিকাময় নাচ প্রত্যক্ষ করেন, 'কারা যেন ডাকছে আমাকে দূর-দূরান্তের কুয়াশায় মিশে, ডাকছে ব্যথিত কণ্ঠস্বরে' – এমন করে অনুভব করেন সংখ্যালঘুদের সমস্যা – জীবনযন্ত্রণা – যা সংখ্যাগুরুদের রচিত প্রথাগত ইতিহাসে সচরাচর স্থান পায় না, স্থান পায় শামসুর রাহমানের মতোই কোনো কোনো কবি বা সাহিত্যিকের রচনায়, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের মাহাত্ম্যনির্ভর, মৌলবাদ বা ধর্মীয় রাজনীতিবিহীন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক মাতাবরণময় বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিরও প্রতিফলন আবিষ্কার করা সম্ভব হয় কমবেশি।

উপসংহার

অসাম্প্রদায়িকতা মানবতা ইত্যাদির ভিত্তিমূলে রয়েছে যে চিরন্তন মানবমূল্যে বিশ্বাস, তার উপলব্ধিতে ও চর্চায় কবি শামসুর রাহমান ছিলেন আমৃত্যু ব্যাপৃত। তাঁর মাতৃভাষাপ্রেম দেশাত্মবোধ বাঙালি জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি তাতে সংশ্লেষিত হয়ে যে এক বিশেষ মার্গ তৈরি করেছিলো তাঁর কবিজীবনের মর্মমূলে, তা তাঁর জীবনের সমগ্রতায় ব্যাপ্ত হয়েছিলো বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের কিছু অনুপ্রেরণা কাজ করলেও অন্তত তাঁর ব্যক্তি-বয়ানের কোনো কোনো প্রমাণমতে, বেশ দৃঢ়মূল সুদূরপ্রসারী কাজ করেছে প্রধানত তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রথম দিককার শিক্ষককুলের কয়েকজন, যাঁদের কথা তিনিই তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'কালের ধুলোয় লোখা'য় উল্লেখ করেছেন। জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর সে শিক্ষা বিশ্বাস বোধ নিজস্বতায় জারিত হয়ে বিকশিত হয়েছে, যা তাঁর অজস্র কবিতায় বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ যে সে বিদ্যমানতাকে ক্রমাগত 'অলৌকিক উপস্থিতি' দিয়ে ঋদ্ধ করেছেন, তার প্রকাশ রয়েছে তাতে, সাথে মানসিক দ্বন্দ্বমুখরতা কষ্ট সংগ্রাম আত্মবিশ্লেষণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বর্তমান বিশ্বের অসাম্প্রদায়িকতা-মানবতা বা শুভবাদিতাকে টিকিয়ে রাখার বা তার বিকাশ সাধনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার যে একটি বিশেষ শিক্ষা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তিনি তিরিশের কবিকুলের কাব্যভুবন থেকে শুরু করে সমকালীন বাংলাদেশের নানা প্রেক্ষাপট-প্রেক্ষিত অবলোকন করে, তার দ্বারা আন্দোলিত হয়ে, তারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় সময়ের সচেতন কবি হয়ে, যাকে হুমায়ুন আজাদের ভাষায় 'সমকালের সভাকবি,' এবং মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'A witness of time' হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। স্বাধীনতার কবি হয়ে যখন তিনি দেখেছেন এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে, মানবতা মার খাচ্ছে, শুভবাদিতা অশুভের খরাঘাতে রক্তাক্ত হচ্ছে, তখন তিনি বেদনাহত হয়েছেন, কখনো দ্রোহ প্রকাশ করেছেন, মুখর স্লোগানে মগ্ন হয়েছেন, প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ করেছেন, কলমের আঁচড়ে তার ইতিহাস রচনা করেছেন, যা এখন প্রথাগত ইতিহাসের এক ধরনের সীমাবদ্ধতাকে পর্যন্ত নির্দেশ করে।

সামাজিক রাষ্ট্রিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুভবাদিতা শুভেচ্ছা লাভ করুক, চর্চা হোক তার অন্তর্গত মানবতাবোধের তাড়নায় – এ ইচ্ছে সদা জাগরূক ছিলো শামসুর রাহমানের কবিসত্তার অস্তিত্ব জুড়ে।

নজরুলের দ্রোহ বা প্রতিবাদী চেতনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, রবীন্দ্রনাথের মঙ্গলভাবনার অধিষ্ঠানে যে অনেক সময় সংগ্রাম বা অশুভশক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধও করতে হয়, তা তিনি কখনো তাঁর কাছ থেকে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়। তবে এ ব্যাপারে তেমন যে আত্মসুখ পেয়ে গেছেন তিনি, তার তেমন নমুনা পাওয়া যায় না। শ্লেষ ক্ষোভ ইত্যাদির প্রকাশে তাঁর ব্যথিত সত্তার প্রসারণ ঘটিয়ে গেছেন কমবেশি, যার মধ্য দিয়ে তাঁর মানবতাময় একটি দেশ শুধু নয়, একটি বিশ্বকে দেখার ইচ্ছে প্রকাশিত হয়েছে। এখনো সংঘাত সন্ত্রাস ধর্মান্ধতা মৌলবাদ কুসংস্কার কার্পণ্য প্রতারণা স্বার্থপরতা পদে পদে বিপদগ্রস্ত খণ্ডিত বিকৃত করছে এ সমাজ বিশ্বকে, জনজীবনে নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের কোনো গ্যারান্টি এখনো কেউ দিতে পারছে না সোৎসাহে, কখনো একনায়কতন্ত্র বা সমরতন্ত্র, কখনো রাজতন্ত্র, কখনো অপুষ্ট বা দিশাহীন সমাজতন্ত্র, কখনো পঙ্গু গণতন্ত্র এ পৃথিবীকে উপহার দিয়ে যাচ্ছে ঈপ্সিত মানবতন্ত্র বা সভ্যতা গড়ার ব্যত্যয়পূর্ণ বা বিফল প্রচেষ্টা, যার মাঝখানে পড়ে মানুষের অধিকার স্বাধীনতা মানবতা শুভবাদিতা মুক্তচিন্তা যুক্তিবাদিতা ইত্যাদি জরাগ্রস্ত হচ্ছে, এসবের সুসঙ্গত মহাজীবনমুখী চর্চা ব্যাহত হচ্ছে। শামসুর রাহমান তার জ্ঞান লাভ করে, কখনো তার অভিজ্ঞতা লাভ করে মর্মাহত হয়ে কলম চালিয়ে গেছেন তার বিপরীতে যতোখানি সম্ভব তার একার পক্ষে। প্রথাগত সমাজ রাষ্ট্রের বিরাগভাজনও হয়েছেন তিনি কোনো কোনো সময়ে। জাতির শুধু নয়, এ জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষদের তিনি সম্মান জানিয়েছেন, গর্ব করেছেন তিনি তাঁদের নিয়ে, ইতিহাস-ঐতিহ্য-জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি তাই করেছেন। বিশ্বের, বিশেষ করে শুভবাদী বিশ্বের যে-কোনো স্থানেরই বাসিন্দা মনে করেছেন তিনি নিজেকে, বিশ্ব-সম্প্রদায়ের কাছে তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন নিজেকে, যেমন করে বাঙালি বাংলা ভাষা বাংলাদেশকে তিনি চেয়েছেন। শামসুর রাহমানের অসাম্প্রদায়িকতা মানবকল্যাণচিন্তা, যাবতীয় সুকুমার বৃত্তি-শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা এভাবে একটি বৈশ্বিক মাত্রা লাভ করে। বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাতৃভূমি বটে, কিন্তু ভিয়েতনাম প্যালেস্টাইন ইরাক ইত্যাদি দেশে যখন মানুষের অধিকার মানবতা খণ্ডিত হয় তখন সে মাতৃভূমিতে বসেই তিনি তাঁর মাতৃভূমি-ভাবনার একটি উচ্চতম শকটে উঠে ছুটে যান সে সব দেশে, লেখেন তাঁর মানবিক পদাবলি। নিপীড়িত মানুষজনের যেন একজন হয়ে ওঠেন তিনি, চেগুয়েভারার চোখ জ্বলে ওঠে তখন তাঁর চোখে – এমন মনে করেন তিনি। শামসুর রাহমানের অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতা এভাবেই আন্তর্জাতিকতা অর্জন করে। এ সূত্রেই সম্ভবত উইলিয়াম রাদিচে তাঁর একটি প্রবন্ধে 'He was international in his vision and range of poetic allusions' – এমন লিখেছেন।[৫৫] 'আখেরে নিশ্চিত শুভ জয়ী হয়ে চতুর্দিকে কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার পথ খুঁজে দেবে ঠিক' – তাঁর এ আশা বা বিশ্বাস এভাবে একটি সার্বিক ইতিবাচকতা লাভ করে।[৫৬]

---

[৫৫] William Radice, "Obituary Shamsur Rahman : Visionary poet of Bangladesh's freedom struggle, without vanity or affection," অন্তর্গত *অন্য আলোয় শামসুর রাহমান*, প্রত্যয় জসীম সম্পা. (ঢাকা: জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ২০১১). পৃ. ২৯৫।

[৫৬] শামসুর রাহমান, "কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার পথ," 'কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে,' *কবিতাসমগ্র ৪* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ৬৯৭।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৪ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

চট্টগ্রামে আঞ্চলিক সাংবাদিকতা বিকাশের ধারা

শাহাব উদ্দিন*

Abstract: Periodicals were published from Chittagong within the hundred years of the development of journalism in British India. Subsequently, the first three Bengali daily newspapers of todays Bangladesh and different type and speciality newspapers and periodicals were published from Chittagong. Thus, these newspapers and periodicals have contributed in the socio-political progress, expansion of education and publication industry in this area. These newspapers played a significant role to create competent journalists in Chittagong. Several aspects of the growth of journalism in Chittagong for nearly one and half century were analysed in this article in the light of different historical events which were presented in contemporay newspapers and periodicals.

ূমিকা

৮৭৮ সালে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের দিনক্ষণ হিসাব করলে চট্টগ্রাম থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের ১৪০ ছর চলছে। এর কিছু কাল আগে থেকে চট্টগ্রামের সংবাদকর্মীরা কলকাতা, রেঙ্গুন, ঢাকাসহ বিভিন্ন ্থান থেকে সংবাদপত্র প্রকাশনা, সম্পাদনা এবং রিপোর্টিংয়ের সাথে যুক্ত থাকলেও ১৮৭৮ সালে মাসিক *ন্দ্রশেখর* প্রকাশের আগে চট্টগ্রাম থেকে সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র প্রকাশের তথ্য মেলে না।[১] াংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে কলকাতার বাইরে এবং আজকের বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনায় চট্টগ্রামের যেমন অগ্রণী অবস্থান লক্ষ করা যায় তেমনি এখানে সাংবাদিকতা ও াংবাদপত্রের গোড়াপত্তনে এ অঞ্চলের সংবাদকর্মীদের অতীত অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল।

উপমহাদেশ খ্যাত মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী কলকাতা থেকে এবং আবদুল মোনএম রঙ্গুন থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। তাঁরা দুজনই চট্টগ্রামের।[২] চট্টগ্রামের সাংবাদিকতা জীবনের আদিপর্বের প্রবাদপুরুষ মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সিদ্দিকী চট্টগ্রাম থেকে *সাধনা, আন্নেসা* ভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ করলেও এক সময় এগুলো কলকাতায় স্থানান্তর করেন।[৩]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] *দৈনিক আজাদী*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৬।

[২] বিনতে মাজেদ, "চট্টগ্রামের সংবাদপত্রের ইতিহাস: একটি রূপরেখা," *নিরীক্ষা* (বাংলাদেশ প্রেস নস্টিটিউট), সংখ্যা ২৯, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৩১।

[৩] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ৯৭৭), পৃ. ৪৩৪-৩৯।

বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা বাঁশখালীর ডোগরা গ্রামের নজির আহমদ চৌধুরী কলকাতা থেকে দৈনিক *আল মদিনা* নামে একটি সংবাদপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত ছিলেন।[৪] চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার কোব্বাদ আহমদ চৌধুরী ১৯৩০ সালের পরে *স্টার অব ইন্ডিয়া* নামে কলকাতা থেকে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশ করেন।[৫] ১৯৩০ এর দশকে পাঠানটুলি নিবাসী আলী আহমদ ওলী ইসলামাবাদী কলকাতা থেকে মাসিক *সাহিত্যিক* ও ত্রৈমাসিক *নয়া বাঙলা* নামে দুইটি সংবাদপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।[৬]

রেঙ্গুন থেকে আবদুল মোনএম প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক *সম্মিলনী* (১৯২৩), মাসিক *এসলাম* (১৯২৬) প্রভৃতি পত্রিকা। রেঙ্গুনে ফেয়ার স্ট্রিটে 'বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস' নামে একটি ছাপাখানা আবদুল মোনএম এবং তার ভাইয়ের দ্বারা পরিচালিত হতো যেখান থেকে এসব পত্র-পত্রিকা ছাপা হতো।[৭] এই বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে ত্রৈমাসিক *যুগের আলো*ও প্রকাশিত হতো যা কবি দিদারুল আলমের সম্পাদনায় প্রথমে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হতো।[৮] রেঙ্গুন থেকে ফররোখ আহমদ নেজামপুরী এবং পরবর্তীতে খোরশেদ আলম চৌধুরীর সম্পাদনায় *বাঙলা গেজেট* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো।[৯] রেঙ্গুনের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মৌলবী আবদুল বারী চৌধুরী ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক।[১০] ফররোখ আহমদ নেজামপুরীর বাড়ি ছিলো সীতাকুণ্ডে এবং তিনি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *ইসলামাবাদ* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আর খোরশেদ আলম চৌধুরীর বাড়ি ছিলো রাউজানে।[১১] ১৯৩৫ সালের দিকে মীরসরাই নিবাসী সৈয়দুর রহমান রেঙ্গুন থেকে *যুগের জ্যোতিঃ* নামে পত্রিকা বের করেন।[১২] *সঙ্ঘ-শক্তি* নামে রেঙ্গুন থেকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় ভিক্ষুর সম্পাদনায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ছিলো মূলত রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশনের মুখপত্র। বার্মা থেকে প্রকাশিত হলেও এর প্রতিষ্ঠাতা বিনয়াচার্য্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ছিলেন চট্টগ্রামের বৈদ্যপাড়ার সন্তান। চট্টগ্রামের সংবাদকর্মীরা কেবল রেঙ্গুন বা কলকাতা নয় ঢাকা থেকেও সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন। ১৯৪৭ সালের পরে রাউজান নিবাসী কাজী নজমুল হক ঢাকা থেকে *কাফেলা* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। করাচিসহ আরো বিভিন্ন স্থান থেকে সে সময় চট্টগ্রামের লোকজন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত থেকেছেন।

১৯১৬ সালে খান বাহাদুর আমান আলীর অর্ধ-সাপ্তাহিক *সুনীতি* প্রকাশের আগে চট্টগ্রাম থেকে আরো অন্তত ২০টি সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হলেও এগুলোর মধ্যে একমাত্র ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত পাক্ষিক *পূর্বদর্পণ* ব্যতীত অন্য কোনো প্রকাশনা ও সম্পাদনায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিলো

---

[৪] Suniti Bhushan Qanungo, *A History of Chittagong, Vol 2 (1761-1947)* (Chittagong, 1417), p. 236.

[৫] Suniti Bhushan Qanungo, *A History of Chittagong, Vol 2 (1761-1947)*, p. 236.

[৬] ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৩৯৬), পৃ. ১৩৩।

[৭] তদেব, পৃ. ১২৯-৩০।

[৮] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০)*, পৃ. ৪৪৪।

[৯] তদেব, পৃ. ৪৫০।

[১০] Suniti Bhushan Qanungo, *A History of Chittagong, Vol 2 (1761-1947)*, p. 234.

[১১] ওহীদুল আলম, "সাংবাদিকতায় চট্টগ্রাম," *নিরীক্ষা* (বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট), সংখ্যা ৫, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮১।

[১২] তদেব।

না। পাক্ষিক *পূর্বদর্পণ* হলো মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা।[১৩] চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা জগতের আদিপর্বে হিন্দুদের অগ্রণী অবস্থান লক্ষ করা গেলেও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজনও পিছিয়ে ছিলো না। ১৮৮৪ সালে কালী কিঙ্কর মুৎসুদ্দীর মাসিক *বৌদ্ধবন্ধু*, ১৯০৬ সালে সর্বানন্দ বড়ুয়ার মাসিক *বৌদ্ধ পত্রিকা*, ১৯২৪ সালে গজেন্দ্রলাল চৌধুরী ও শ্রী ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়ার মাসিক *সম্বোধির* নাম এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে। মাসিক *আন্নেসা* সম্পাদক বেগম সফিয়া খাতুন অগ্রণী নারী হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সাংবাদিকতা: সাধারণ পর্যালোচনা

১৮৪৭ সালের আগস্ট মাসে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* প্রকাশের তিন দশকের বেশি সময় পরে ১৮৭৮ সালে চট্টগ্রাম থেকে *চন্দ্রশেখর* নামে প্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১৪] এ বছরের ১৪ মার্চ উপমহাদেশে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার লক্ষ্যে ব্রিটিশরা ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট প্রণয়ন করে। পরের সপ্তাহে অর্থাৎ ২১ মার্চ বাংলা ও ইংরেজি দ্বি-ভাষিক সাপ্তাহিক *অমৃতবাজার পত্রিকাটি* রাতারাতি কেবল ইংরেজি হয়ে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের থাবা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও বাংলা ভাষার পত্রিকা হওয়ায় সাপ্তাহিক *সোমপ্রকাশ* বন্ধ হয়ে যায়। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের প্রতিবাদে *নববিভাকর* ও *সাধারণী*ও প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশনা অব্যাহত রাখা যখন ব্যাপক চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সে রকম একটি প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ উপমহাদেশে সংবাদপত্র দলনের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বছরে চট্টগ্রামে প্রথম পত্রিকার জন্ম।[১৫]

১৮৪৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ১৮৭১-৮০'র দশকে প্রথম একটি সাপ্তাহিক ও একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং এ দশকে দুটি মাসিক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। এর আগে ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর থেকে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হলেও চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে এ ধরনের প্রকাশনার কোনো তথ্য-প্রমাণ মেলে না। তদানীন্তন পূর্ববাংলা তথা আজকের বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র *জ্যোতিঃ*র প্রকাশ স্থান চট্টগ্রাম। ১৯২১ সালের ৫ আগস্ট পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।[১৬] পটিয়ার কালী শংকর চক্রবর্তী ছিলেন এর সম্পাদক ও প্রকাশক। দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার আগে *জ্যোতিঃ* সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতো। স্বদেশী আন্দোলনের সময় *জ্যোতিঃ*র ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। *জ্যোতিঃ* কেবল চট্টগ্রামের নয় কলকাতার বাইরে তখনকার অবিভক্ত বাংলার সমগ্র এলাকার জন্যই প্রথম দৈনিক পত্রিকা ছিলো।[১৭]

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রথম তিনটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা-দৈনিক *জ্যোতিঃ* (১৯২১), দৈনিক *পাঞ্চজন্য* (১৯২৯) ও দৈনিক *রাষ্ট্রবার্তা*'র (১৯৩০) প্রকাশ স্থান চট্টগ্রাম। ১৯১৭ সালে প্রিয় নাথ সেনের

---

[১৩] *দৈনিক আজাদী*, ৫ অক্টোবর ২০০৬।

[১৪] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র*, ২য় খণ্ড (কলকাতা, ১৩৮৪), পৃ. ২৭।

[১৫] হামিদা সুলতানা, *চট্টগ্রামের সংবাদ-সাময়িকপত্র: ১৮৭৮-১৯৪৭* (এমফিল অভিসন্দর্ভ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩), পৃ. IX ।

[১৬] *বাংলাপিডিয়া* (২০১১), "সংবাদপত্র ও সাময়িকী" ভুক্তি।

[১৭] শরীফ রাজা, "চট্টগ্রামের পত্রপত্রিকা ও সাংবাদিকতার ইতিহাস," *নিরীক্ষা* (বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট), সংখ্যা ৩৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ২৯।

সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত স্বল্পায়ু ইংরেজি দৈনিক *দি হেরাল্ড* হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রথম দৈনিক পত্রিকা।[১৮] ১৯৪৭ পূর্বসময়ে চট্টগ্রাম থেকে আরো দুইটি দৈনিকের আত্মপ্রকাশ ঘটে–একটি দৈনিক *আজান* (১৯৩৫ ও ১৯৩৬) এবং দৈনিক *পূর্ব পাকিস্তান* (১৯৪৬)। ভারত বিভাগের পর পূর্ববাংলায় প্রথম যে দৈনিকের আবির্ভাব ঘটে তার নাম ছিলো *পয়গাম*। ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এই দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী।[১৯]

১৯১৬ সালে খান বাহাদুর আমান আলীর অর্ধ-সাপ্তাহিক *সুনীতি* প্রকাশের আগে চট্টগ্রাম থেকে আরো অন্তত ২০টি সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হলেও এগুলোর মধ্যে একমাত্র ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত পাক্ষিক *পূর্বদর্পণ* ব্যতীত অন্য কোনো প্রকাশনা ও সম্পাদনায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিলো না। পাক্ষিক *পূর্বদর্পণ* হলো মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা।[২০] *সুনীতি* এক্ষেত্রে মাইলফলক। এর পর পরই আমরা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সিদ্দিকীকে সংবাদপত্র সম্পাদনায় এগিয়ে আসতে দেখি। ১৯২০ এর দশক থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা সম্পাদনায় মুসলমানদের এগিয়ে থাকতে দেখা যায়। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সিদ্দিকীর স্ত্রী বেগম সফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক *আন্নেসা* হচ্ছে নারী সম্পাদিত চট্টগ্রামের প্রথম সাময়িকপত্র।

চট্টগ্রামের বেশিরভাগ সংবাদপত্র ও সাময়িকী ছিলো কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল, সংঘ বা সমিতি এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র।[২১] সুনীতি ভূষণ কানুনগো ব্রিটিশ আমলের চট্টগ্রামের পত্র-পত্রিকাগুলোকে এগুলোর বিষয়বস্তুর আলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন – ক) সংবাদভিত্তিক, খ) সাহিত্যবিষয়ক, এবং গ) ধর্মবিষয়ক। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম থেকে বিপুলসংখ্যক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র ও সংবাদ সাময়িকী প্রকাশে কলকাতার পরেই ছিলো চট্টগ্রামের স্থান।

আজকের দিনের সাময়িকপত্র কিংবা সংবাদপত্রের সাথে তুলনায় তৎকালীন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে নানা অসামঞ্জস্য চোখে পড়বে ঠিকই কিন্তু এতদঞ্চলে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার বিকাশের গোড়াতে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সাময়িকীর প্রকাশনা এবং সেগুলোর নিজের অভিষ্ঠ বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ–সাময়িকী প্রকাশনার ক্ষেত্রে আজকের দিনের জন্যও শিক্ষণীয়।

চট্টগ্রামে সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রকাশনা

সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র প্রকাশের অন্যতম শর্ত হলো মুদ্রণ যন্ত্র বা ছাপাখানা। পর্তুগিজরা ভারতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে ১৭৫৭ সালে। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বম্বেতে ছাপাখানা বসায় ১৬৭৪ সালে। এর প্রায় একশত বছর পরে কলকাতা থেকে উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র *হিকির গেজেট* নামে সমধিক পরিচিত *বেঙ্গল গেজেট* বা *ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার* প্রকাশের আগে জন উইলিয়াম বোল্টস নামে এক ওলন্দাজ এখানে সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন। তারাপদ পাল লিখেছেন, 'হিকির গেজেট প্রকাশিত হবার বারো বছর আগে ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু সেই প্রয়াস একেবারে

---

[১৮] *দৈনিক আজাদী*, ৭ ডিসেম্বর ২০০৬।

[১৯] হেলাল উদ্দিন আহমেদ এবং গোলাম রহমান, "সংবাদপত্র ও সাময়িকী", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।

[২০] *দৈনিক আজাদী*, ৫ অক্টোবর ২০০৬।

[২১] Suniti Bhushan Qanungo, *A History of Chittagong, Vol-2 (1761-1947)*, p. 232.

সূচনাতেই নাটকীয়ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়–কোম্পানির কর্তাদের বিরোধিতার জন্য।'[২২] উইলিয়াম বোল্টস ছিলেন কোম্পানির চাকরিজীবী। তার সাথে কোম্পানির বনিবনা না হওয়ায় তার সে চাকরি চলে গেলে তিনি ছাপাখানা বসানোর অনুমতি চান। বোল্টসের হাতে সংবাদপত্র থাকাকে মারাত্মক অস্ত্র বিবেচনা করে কোম্পানির লোকজন ১৭৬৭ সালের এপ্রিলে তাকে পলাতক আসামির ন্যায় ভারত থেকে ইংল্যান্ডে বিতাড়িত করে।[২৩]

এ রকম কোনো বিতাড়নের ঘটনা না হলেও চট্টগ্রাম থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের যিনি প্রথম উদ্যোগ নেন তিনি সফল হতে পারেননি। চট্টগ্রাম থেকে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ নেন 'রাজদূত' বলে খ্যাত রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস ও তার ভাই কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস। রাজদূত কলকাতা থেকে *বিভাকর* নামে মাসিক পত্রিকা বের করতেন। তিনি চট্টগ্রাম থেকে একটি সংবাদপত্র বের করার লক্ষ্যে তার ভাইকে নিয়ে কাতালগঞ্জের ভাঙ্গনঘুটায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। অবশ্য তার পরিকল্পিত সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি।[২৪] তারকচন্দ্র দাশগুপ্তের *চন্দ্রশেখর* হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। অর্থাৎ, কলকাতা এবং চট্টগ্রাম উভয় স্থানে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোক্তাদের কেউই সফল হতে পারেননি।

১৮৪৭ সালের আগস্ট মাসে রংপুর থেকে প্রকাশিত *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* নিজস্ব ছাপাখানায় মুদ্রিত হতো বলে জানা যায়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিরোধী আইনের কবলে পড়ে বছর দশেক পরে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে ওই ছাপাখানা থেকেই ১৮৬০ সালে বাংলাদেশের তৃতীয় পত্রিকা *রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ* প্রকাশিত হয় বলে ধারণা করা হয়।[২৫] *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* প্রকাশের তিন দশকের বেশি সময় পরে ১৮৭৮ সালে চট্টগ্রাম থেকে *চন্দ্রশেখর* নামে প্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রামের দ্বিতীয় পত্রিকা হিসেবে ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক সংশোধনী* প্রায় ৪৫ বছর ধরে প্রকাশিত হয়। রাজদূত শরৎচন্দ্র দাস প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের প্রথম ছাপাখানা শারদযন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে এটি প্রকাশিত হতো।[২৬]

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৮৭৮-১৯০০ সময়ে চট্টগ্রাম থেকে ১৪টি এবং ১৯০১-১৯৪৭ সময়ের ৬৪টি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।[২৭] অপর এক সমীক্ষায় ১৮৭৮ সালে মাসিক *চন্দ্রশেখর* প্রকাশনা থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ১০০ বছরে চট্টগ্রাম থেকে ১৮২টি পত্র-পত্রিকা প্রকাশের তথ্য জানা যায়।[২৮] এসব সংবাদপত্র প্রকাশে চট্টগ্রামের কিছু মুদ্রণযন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাপাখানাগুলো হলো: শারদযন্ত্র, সনাতন প্রেস, চন্দ্রশেখর প্রেস, গোবিন্দ যন্ত্র, ইম্পেরিয়েল প্রেস,

---

[২২] তারাপদ পাল, *ভারতের সংবাদপত্র (১৭৮০-১৯৪৭)* (কলিকাতা: সাহিত্য সদন, ১৯৭২), পৃ. ৩৫।

[২৩] Tarun Kumar Mukhopadhyay, *Hicky's Bengal Gazette: Contemporary Life and Events* (Kolkata: Subarnarekha, 1988), pp. 5-6.

[২৪] তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী, *চট্টগ্রাম: অতীত ও ঐতিহ্য* (চট্টগ্রাম: শৈলী, ২০০৬), পৃ. ৬।

[২৫] কাজী জাফরুল ইসলাম, *ব্রিটিশ যুগে বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাময়িকী* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ১১।

[২৬] শরীফ রাজা, 'চট্টগ্রামের পত্রপত্রিকা ও সাংবাদিকতার ইতিহাস-আদিপর্ব', *নিরীক্ষা* (বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট), সংখ্যা ৩৪, জানুয়ারি ১৯৯০।

[২৭] শাহাব উদ্দিন, ও হামিদা সুলতানা, 'চট্টগ্রামের সংবাদ-সাময়িকপত্রের আদি, উন্মেষ ও বিকাশ পর্ব', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান অনুষদ জার্নাল*, ভলিউম-২৮, ২০১৩, পৃ. ১০৯-১২৪।

[২৮] শাহাব উদ্দিন নীপু, 'চট্টগ্রামের শতবর্ষের সাংবাদিকতা: একটি মূল্যায়ন', প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যা, *দৈনিক আজাদী*, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫, চট্টগ্রাম।

ইউনিভার্সেল প্রেস, মিন্টো প্রেস, সরস্বতী প্রেস, ইসলামাবাদ প্রেস, হার্ডিঞ্জ প্রেস, দি চিটাগাং প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউজ লি., মুসলিম প্রেস, আলাবিয়া প্রেস, এবি রেলওয়ে প্রেস, মডার্ন প্রিন্টিং কোম্পানি লি., কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস, আমির প্রেস, চট্টল ইউনিয়ন প্রেস ইত্যাদি।

চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার বিকাশে কিছু ছাপাখানা অসামান্য অবদান রেখেছে। মডার্ন প্রেস, কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসসহ কিছু ছাপাখানা শত বছরের সংবাদপত্র প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে এবং কিছু কিছু ছাপাখানা সমকালীন বিভিন্ন আলোচিত সংবাদপত্র ছাপার দায়িত্ব পালন করে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এর মধ্যে সনাতন প্রেস থেকে সাপ্তাহিক *জ্যোতিঃ*, *অঞ্জলী*, *ঋষিতত্ত্ব*, চন্দ্রশেখর প্রেস থেকে *চন্দ্রশেখর*, *বৌদ্ধ-বন্ধু*, *পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি*, *ভারতবাসী*, ইম্পেরিয়েল প্রেস থেকে *প্রভাত*, *হিতবার্তা*, *দৈনিক আজান*, সাপ্তাহিক *অভিযান*, সাপ্তাহিক *আল হেলাল*, মাসিক *সীমান্ত* প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের তথ্য জানা যায়। চট্টগ্রামের বিখ্যাত মিন্টো প্রেসে ছাপা হতো *সাধনা*, *শিক্ষা পত্রিকা*, *সম্বোধি*সহ অনেক পত্র-পত্রিকা, সরস্বতী প্রেস থেকে *আন্নেসা*, ইসলামাবাদ প্রেস থেকে *ইসলামাবাদ*, হার্ডিঞ্জ প্রেস থেকে *যুগের আলো* ছাপা হতো। চট্টগ্রামের আরেকটি বিখ্যাত ছাপাখানা হলো দি চিটাগাং প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউজ লি. যেখান থেকে ছাপা হতো *দৈনিক জ্যোতিঃ*, *দৈনিক পাঞ্চজন্য*, সাপ্তাহিক *দেশপ্রিয়*সহ ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকের আলোচিত বহু পত্র-পত্রিকা।

ইসলামি ভাবধারার পত্র-পত্রিকা প্রকাশে অবদান রেখেছে মুসলিম প্রেস (দৈনিক *রাষ্ট্রবার্তা*) ও আলাবিয়া প্রেস (*হরুফুল কোরান*, সাপ্তাহিক *আল কোর-আন*, মাসিক *প্রতিভা*)। একই ভাবধারার সাপ্তাহিক *সত্যবার্তা* মডার্ন প্রিন্টিং কোম্পানি লি. থেকে প্রকাশিত হতো। চট্টল ইউনিয়ন প্রেস থেকে দৈনিক *পয়গাম*, দৈনিক *নয়া জমানা* ইত্যাদি প্রকাশিত হতো। চট্টগ্রামের আরেকটি বড়ো ছাপাখানা হলো আমির প্রেস যেখান থেকে সাপ্তাহিক *অভিযান*, পাক্ষিক *অধিকার*, ত্রৈমাসিক *তৌহিদ*সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯২০-এর দশক থেকে কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস চট্টগ্রামের ছাপাখানা জগতে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে আছে। সংবাদপত্র প্রকাশনার পরিকল্পিত প্রস্তুতি লক্ষ করা যায় এ ছাপাখানাকে ঘিরে। প্রতিষ্ঠার বছর দশেকের মধ্যে ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কোহিনুর লাইব্রেরি যা ছিলো চট্টগ্রামের সমকালীন শিল্পী-সাহিত্যিকদের মিলনস্থল। নিজস্ব প্রকাশনা হিসেবে এই ছাপাখানা থেকে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *কোহিনূর* নামে একটি সাময়িকপত্র। ১৯৬০ সাল থেকে এই ছাপাখানা থেকে দৈনিক *আজাদী* নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। দৈনিক *আজাদী* এখন কেবল চট্টগ্রামের নয়, বাংলাদেশের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী দৈনিকে পরিণত হয়েছে। ১৯৩০-এর দশক থেকে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত এই কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে সাপ্তাহিক *যুগধর্ম্ম*, সাপ্তাহিক *যুগশঙ্খ*, সাপ্তাহিক *জনমত*, মাসিক *পূরবী*, দৈনিক *পূর্ব পাকিস্তান* প্রভৃতি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্র প্রকাশনার সাথে যুক্ত এইসব ছাপাখানাগুলো ছিলো মূলত আন্দরকিল্লা, হাজারী লেন, টেরিবাজার, সদরঘাট, কোতয়ালী, আলকরণ, পুরাতন গির্জা রোড, রহমতগঞ্জ, লয়েল রোড, ঝাউতলা প্রভৃতি স্থানে। চট্টগ্রামের ছাপাখানা শিল্পও পরবর্তী সময়ে এসব স্থান এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে। কাজেই, সংবাদপত্র প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট এসব ছাপাখানা চট্টগ্রামের মুদ্রণশিল্প গড়ে ওঠা এবং বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সাংবাদিকতা বিকাশের কুশীলব

চট্টগ্রাম থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনাপর্বে যাঁদের অবদান অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পণ্ডিত ও গুপ্তরা। পণ্ডিত কাশী চন্দ্র গুপ্ত এবং পণ্ডিত চন্দ্র কান্ত চক্রবর্তী হলেন অগ্রজ সাংবাদিক

যাঁরা সাময়িকপত্র সম্পাদনায় এগিয়ে এসেছেন। এদিকে, পণ্ডিত কাশী চন্দ্র গুপ্ত ছাড়াও তারক চন্দ্র দাশগুপ্ত, অক্ষয় কুমার গুপ্ত, অধ্যক্ষ রাজেশ্বর গুপ্ত, বীরেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ চট্টগ্রাম থেকে সাময়িকপত্রের প্রকাশনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেদিক থেকে বেশ কয়েকজন চৌধুরীকে চট্টগ্রামের আদিপর্বে সংবাদপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন – উকিল পূর্ণ চন্দ্র চৌধুরী, প্যারিমোহন চৌধুরী, অতুল চন্দ্র রায় চৌধুরী, প্রসন্ন কুমার চৌধুরী প্রমুখ।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক মহিম চন্দ্র দাস চট্টগ্রামের সংবাদপত্র জগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পেশায় আইনজীবী এই সাংবাদিক চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রথম দুই-দুইটি দৈনিক *জ্যোতিঃ* (১৯২১) এবং *পাঞ্চজন্য* (১৯২৯) সম্পাদনা করেন। *পাঞ্চজন্য* দৈনিক হিসেবে প্রকাশের আগে দীর্ঘদিন তাঁরই সম্পাদনায় সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতো। তিনি সাপ্তাহিক *আলোক* নামেও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এছাড়া, সাপ্তাহিক *দেশপ্রিয়* প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ অবদান ছিলো।[২৯] তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের উপযোগী ছাপাখানা 'দি চট্টগ্রাম প্রিন্টিং ও পাবলিশিং হাউস লিমিটেড' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রচেষ্টার কথা *পাঞ্চজন্যে* স্বীকৃত হয়েছে এভাবে:

> চট্টগ্রামের মত মফঃস্বলে সাপ্তাহিকই চলিত না, দৈনিক পত্রিকা ত স্বপ্নমাত্র। তজ্জন্য উপযুক্ত প্রেসই চট্টগ্রামে ছিল না। কিন্তু স্বদেশ গৌরবে উদ্বুদ্ধ, নবজাগরণে অনুপ্রাণিত চট্টলাবাসী বন্ধুগণ সেই অভাব মোচনের জন্য অকাতরে সাহায্য দান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বর্ম্মা কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুত রাজকমল ঘোষ, রাউজানের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্বর্গগত বরুণচন্দ্র চৌধুরী, ডাবুয়ার জমিদার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র ধর ও শ্রীযুত তেজেন্দ্র চন্দ্র ধর, ধুমের জমিদার ও সাহিত্যিক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, রোসাঙ্গিরির গৌরচন্দ্র দেব এবং ক্ষীরোদ বিনোদ চৌধুরী, হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুত চন্দ্রশেখর সেন, মহালক্ষ্মীর ম্যানেজার শ্রীযুত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা ও অন্যান্য অনেকের সহানুভূতি ও সহায়তার ফলে দি চট্টগ্রাম প্রিন্টিং ও পাবলিশিং হাউস লিমিটেড নামক ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে।[৩০]

চট্টগ্রামে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের বিকাশের আদিপর্বের এক যশস্বী সাংবাদিকের নাম মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সিদ্দিকী। চট্টগ্রাম থেকে তিনি মাসিক *সাধনা* (১৯১৯), মাসিক *আন্নেসা* (১৯২১) ও সাপ্তাহিক *মোসলেম জগৎ* (১৯২২) এবং কলকাতা থেকে *মোসলেম জগৎ* ও *রক্তকেতু* নামে পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনা করেন। সাংবাদিকতার জন্য তিনি কারাবরণ করেন। চট্টগ্রামে পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা কঠিন হয়ে পড়ায় তিনি কলকাতা থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেন। তিনি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন এবং তার স্ত্রী বেগম সফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় চট্টগ্রামের প্রথম নারী সম্পাদিত মাসিক *আন্নেসা* প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার নিজ গ্রাম কাকারা থেকে *কক্সবাজার হিতৈষী* নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁকে কক্সবাজারের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার জনক বলেও অভিহিত করা হয়।

চট্টগ্রামে প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক। ১৯২০-এর দশকে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস স্থাপন করে বিভিন্ন বই প্রকাশনার মধ্য দিয়ে

---

[২৯] হীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, ১৩৪৭, 'চট্টলগৌরব মহিমচন্দ্র দাস,' সাপ্তাহিক *দেশপ্রিয়*, বর্ষ-৪, সংখ্যা-১, ২ বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ. ৭-৮।

[৩০] *দৈনিক পাঞ্চজন্য*, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৩৯।

সাহিত্য ও প্রকাশনা জগতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[৩১] ১৯৩৩ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোহিনুর লাইব্রেরি ছিলো চট্টগ্রামের সমকালীন শিল্পী-সাহিত্যিকদের মিলনস্থল। ১৯৫০ সালে সাপ্তাহিক *কোহিনূর* নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশনার মধ্য দিয়ে তিনি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা জগতে প্রবেশ করেন। এই পত্রিকা সাহিত্যানুরাগীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং চট্টগ্রামে নবীন লেখক ও সাহিত্যকর্মী সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম থেকে দৈনিক *আজাদী* প্রকাশিত হয় তাঁরই সম্পাদনায়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকার দাবিদার এই দৈনিকটি এখনো নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকার মর্যাদা লাভ করেছে। চট্টগ্রামে সংবাদকর্মী তৈরি এবং সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে এমনকি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ তৈরিতেও এই পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক আবদুস সালাম চট্টগ্রামের সাংবাদিকতা জগতে একটি উজ্জ্বল নাম। ১৯৩৩ সালে তিনি *মুকুলিকা* নামে একটি বার্ষিকী সম্পাদনা করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে *প্রতিভা* নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে আরেকটি পত্রিকা বের করেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত এই সাপ্তাহিকের নাম *অভিযান*। ১৯৪৬ সালে কবি আবদুস সালামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান*। ১৯৪৮ সালে *দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান* বন্ধ হয়ে গেলে কবি আবদুস সালাম প্রকাশ করেছিলেন *দৈনিক সরহদ* নামক একটি দৈনিক সংবাদপত্র। সম্পাদক ছিলেন কবি পত্নী আয়েশা সালাম। তবে পত্রিকাটি কবিই সম্পাদনা করতেন। *দৈনিক সরহদই* ছিল বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মহিলা সম্পাদিত (মহিলার নামে সম্পাদিত) প্রথম বাংলা দৈনিক। *দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান* পুনপ্রকাশিত হলে এটি বন্ধ হয়ে যায় বা বন্ধ করে দেয়া হয়।[৩২]

চট্টগ্রামে সংবাদপত্র প্রকাশনা এবং সাংবাদিকতা বিকাশে ফতেয়াবাদের আলম পরিবারের অবদানও অনন্য। এই পরিবারের সদস্য কবি ওহীদুল আলম ১৯৩৬ সালে চট্টগ্রাম থেকে সুচরিত চৌধুরীর সাথে যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশ করেন অত্যন্ত আলোচিত সাহিত্য পত্রিকা মাসিক *পূরবী*। ১৯৪৬ সালে ফতেয়াবাদ নিবাসী গোলাম সোবহান চৌধুরীর উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে এবং ওহীদুল আলমের সম্পাদনায় দৈনিক *নয়া জমানা* প্রকাশিত হয়। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর অর্থাভাবে ১৯৪৭ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে কবি আবদুস সালামের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে *দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান* প্রকাশিত হলে তিনি কিছু সময় এ পত্রিকায় বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন।[৩৩] এই পরিবারের অপর সদস্য কবি দিদারুল আলমের সম্পাদনায় ১৯২৬ সালে চট্টগ্রামের অন্যতম আলোচিত সাহিত্য পত্রিকা ত্রৈমাসিক *যুগের আলো* প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে কবি দিদারুল আলম বার্মায় চলে গেলে রেঙ্গুনের বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মাসিক আকারে *যুগের আলো* বের হতো।[৩৪]

এই পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান মাহবুব-উল-আলম মূলত সমকালীন সংবাদপত্রে লেখালেখি করতেন। সংবাদপত্রে লেখালেখির মধ্য দিয়ে দক্ষতা অর্জনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে তিনি হাত দেন সংবাদপত্র সম্পাদনায়। সুচরিত চৌধুরীর সাথে যুগ্ম সম্পাদনায় তিনি ১৯৪৭ সালে প্রকাশ করেন মাসিক *সীমান্ত*। ভারত বিভক্তির পর পরই প্রকাশিত এই সাহিত্য পত্রিকা ছাড়াও তাঁর সম্পাদনায়

---

[৩১] বি এ আজাদ ইসলামাবাদী (সম্পাদিত), *চট্টগ্রাম স্মরণী* (চট্টগ্রাম: সাপ্তাহিক সমাজ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ২২।

[৩২] *দৈনিক আজাদী*, ১৫ মার্চ ২০০৯।

[৩৩] বিমল গুহ, *ওহীদুল* আলম *(১৯১১-১৯৯৮)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ. ২৪-২৫।

[৩৪] ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৩৯৬), পৃ. ১২৯।

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক *জমানা*। তাঁরই সম্পাদনায় *জমানা* ১৯৫৫ সালের ২৮ অক্টোবর সাপ্তাহিক এবং ১৯৫৯ সালের ১৬ নভেম্বর দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মাহবুব-উল-আলম ছিলেন তাঁর অনুজ ওহীদুল আলমের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক *পূরবীর* প্রত্যক্ষ সহযোগী এবং কবি দিদারুল আলমের সম্পাদনায় প্রকাশিত ত্রৈমাসিক *যুগের আলোর* পরোক্ষ সহযোগী। এছাড়া, বাংলা ১৩৩৭ সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন সময়ে সম্পন্ন *আলম পরিবার পত্রিকা* নামে হাতে লেখা একটি পত্রিকার সম্পাদক ও লিপিকার ছিলেন মাহবুব-উল-আলম।[৩৫] ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের সংগঠন 'চিটাগাং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হলে তিনি এর সভাপতি মনোনীত হন।

চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার জগতের আরেক বিশিষ্ট নাম লোকমান খান শেরোয়ানী। তিনি ছিলেন মূলত সাংবাদিক ও রাজনীতিক। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের তৃতীয় দৈনিক পত্রিকা *দৈনিক রাষ্ট্রবার্তার* সম্পাদক ছিলেন লোকমান খান শেরোয়ানী। তিনি চট্টগ্রাম থেকে ১৯৬৯ সালে কাজী জহির উদ্দিন বাবরের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক *অধিকার* পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। এছাড়া, কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক প্রত্যহ* পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সাপ্তাহিক *নয়া বাংলা* পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক, মাসিক *সাম্যবাদী* পত্রিকার সম্পাদক, *দৈনিক নবযুগ*, *দৈনিক কৃষক* প্রভৃতি পত্রিকার পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

চট্টগ্রামের সাংবাদিকতায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা খুব উজ্জ্বল না হলেও পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত থেকে, নিজের ভক্ত-অনুসারীদের দ্বারা এখানকার সাংবাদিকতাকে যিনি বহুলভাবে আলোড়িত করেছেন তিনি হলেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি ১৮৯৭ সালের দিকে উর্দু পত্রিকায় সংবাদ লেখনীর মধ্য দিয়ে। লাহোরের জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্রে দীক্ষিত *পয়সা আখবার* ও অমৃতসরের *উকিল* পত্রিকায় তিনি সংবাদ লেখার কাজ করতেন বলে তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। কলকাতা থেকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ১৯০২ সালে *ছোলতান* নামে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাটি ১৯০৮ সালে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। ইসলামাবাদী শুরু থেকে এই পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯০৪ সালের এপ্রিলে প্রথম এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত *ছোলতান* দৈনিক পত্রিকা হিসেবে ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৩৬] মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী *সাপ্তাহিক ছোলতান* ছাড়াও ১৯১৫ সালে প্রকাশিত মাসিক *আল-এসলাম*, ১৯২৬ সালে প্রকাশিত দৈনিক *ছোলতান* এবং ১৯২৯ সালে প্রকাশিত দৈনিক *আমির* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম থেকে ১৯২২ নালে মাওলানা ফররোখ আহমদ নেজামপুরীর সম্পাদনায় *সাপ্তাহিক ইসলামাবাদ* প্রকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৪ সালে চট্টগ্রাম থেকে *সাপ্তাহিক সত্যবার্ত্তা* প্রকাশের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রথম মুসলিম সম্পাদক বলা হয়।[৩৭]

এছাড়া, যাঁদের অকৃত্রিম অবদানের কারণে চট্টগ্রামের সংবাদপত্র প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা গতিপথ পেয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাহিত্যিক সুচরিত চৌধুরী, *দৈনিক আজাদীর* সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ শরীফ রাজা, সাংবাদিক ও সম্পাদক মোহাম্মদ মোসলেম খান, মঈনুল আহসান সিদ্দিকী,

---

[৩৫] মাহমুদ শাহ কোরেশী, *মাহবুব-উল-আলম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮), পৃ. ৮১।

[৩৬] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, *আত্মজীবন* (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০৪), পৃ. ১০৮।

[৩৭] বি এ আজাদ ইসলামাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

ফররোখ আহমদ নেজামপুরী, *পিপলস ভিউ* সম্পাদক নুরুল ইসলাম, সাপ্তাহিক *জ্যোতিঃ* সম্পাদক নলিনীকান্ত সেন, কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস, সাপ্তাহিক *যুগধর্ম্ম* সম্পাদক জ্যোতিষ চন্দ্র কর, সাপ্তাহিক *হরুফুল কোরান* সম্পাদক মৌলবী জুলফিকার আলী, অর্ধ-সাপ্তাহিক *সুনীতি* সম্পাদক খান বাহাদুর আমান আলী, সাংবাদিক ও সম্পাদক কাজী কবির উদ্দিন, সাংবাদিক-সাহিত্যিক আশুতোষ চৌধুরী, মাসিক *খোশরোজ* সম্পাদক আবুল খায়ের বিএবিটি, *স্বাধীনতা* সম্পাদক আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী, সাপ্তাহিক *জনমত* সম্পাদক আবদুল মোনএম, দৈনিক *আজাদী* সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক, এম এ মালেক ও অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, *দি ডেইলি লাইফ* সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম ববি, *দৈনিক পূর্বকোণ* সম্পাদক তসলিম উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রামের সংবাদপত্র প্রকাশনা, সম্পাদনা ও সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিতে যাদের অগ্রণী ভূমিকা লক্ষ করা যায় তাদের মধ্যে রয়েছেন – দৈনিক *আজকের চট্টগ্রামের* আবদুল হাই, দৈনিক *বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের* সৈয়দ উমর ফারুক, দৈনিক *সুপ্রভাত বাংলাদেশের* রুশো মাহমুদ, *দি পিপলস* ভিউ'র ওসমান গণি মনসুর, এম নাসিরুল হক, শামসুল হক হায়দরী, মোয়াজ্জেমুল হক, আবু সুফিয়ান, সিরাজুল করিম মানিক, মঈনুদ্দীন কাদেরী শওকত, জাহিদুল করিম কচি, নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, আতাউল হাকিম, অরুণ দাশগুপ্ত, স্বপন কুমার মহাজন, সমীর কান্তি ভট্টাচার্য, হেলাল উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ। প্রয়াত সাধন কুমার ধর, আখতার-উন-নবী, সৈয়দ মোস্তফা জামাল, নুর সাঈদ চৌধুরী, এম ওবায়দুল হক, মোহাম্মদ ইদ্রিস, কাজী জাফরুল ইসলাম প্রমুখ তাদের বহুমুখী প্রতিভা দিয়ে চট্টগ্রামের সাংবাদিকতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে সম্প্রচার মাধ্যমের অগ্রগতির কারণে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকে সাংবাদিকতা করছেন এমন অনেকেই চট্টগ্রামে সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি নিয়েছেন এবং পেশাগত উৎকর্ষ ছড়াতে চট্টগ্রাম ছেড়েছেন।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সাংবাদিকতা: এ কালের সাথে সেকালের চিত্র

প্রকাশনার আদি থেকেই চট্টগ্রামের সংবাদপত্রে ভারতের বিভিন্ন বিষয়ে নানা তথ্যপূর্ণ খবর থাকতো। তবে, সংবাদ লিখন ও এর উপস্থাপনায় আজকের দিনের সংবাদপত্রের তুলনায় নানা ক্ষেত্রে বহু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এখানে অনুচ্ছেদ চিহ্ন ব্যতীত সংবাদগুলো একটির সাথে অপরটি লাগানো থাকতো। অর্থাৎ প্রত্যেক অনুচ্ছেদেই নতুন নতুন সংবাদ থাকতো। এগুলোতে কোনো শিরোনাম থাকতো না। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে নানা আবিষ্কার-উদ্ভাবনার সংবাদ নিয়ে আলাদা বিভাগ থাকতো। স্থানীয় সংবাদের ন্যায় এখানেও অনুচ্ছেদ চিহ্ন ব্যতীত সংবাদগুলো একটির সাথে অপরটি লাগানো থাকতো। অর্থাৎ প্রত্যেক অনুচ্ছেদেই নতুন নতুন সংবাদ থাকতো। এগুলোতেও কোনো শিরোনাম থাকতো না। সাপ্তাহিক পত্রিকার সংবাদেরও কোনো শিরোনাম থাকতো না। এসব পত্রিকায় সপ্তাহের বিভিন্ন খবরাখবর সংক্ষিপ্তাকারে স্থান পেতো। অনেকক্ষেত্রে সংবাদ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা মেনে চলা হতো। সাধারণত একটি অনুচ্ছেদে লেখা এসব সংবাদ এখনকার সংবাদ সূচনার মতোই যেখানে সংবাদের সারাংশ স্থান পেতো। অনেকক্ষেত্রে একটি সংবাদ শেষে অপর সংবাদ শুরুর আগে একটি রেখা টেনে দুটো সংবাদকে পৃথক করা হতো।

বিশ শতকে এসে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জা, সংবাদের লিখন-উপস্থাপনে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সংবাদপত্রসমূহ বিভিন্ন নামে এর সংবাদ বিভাগগুলো সাজাতো। সাপ্তাহিক সংবাদে সমগ্র বাংলা ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের খবর স্থান পেলেও *স্থানীয়* সংবাদে মূলত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সংবাদাদি স্থান পেতো। সাপ্তাহিক সংবাদের তুলনায় স্থানীয় সংবাদ বিস্তারিত থাকতো এবং এগুলোতে ঠিক শিরোনাম না হলেও লেবেল বা টাইটেলের মতো থাকতো যা অপেক্ষাকৃত বড়ো ও মোটা হরফে

থাকতো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই টাইটেল বা লেবেলের শেষে বাক্য সমাপনী যতি চিহ্ন দাঁড়ি (।) ব্যবহৃত হতো যা এখন একেবারে নিষিদ্ধই।

কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ সংবাদের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত শিরোনামও দেওয়া হতো। পত্র-পত্রিকাসমূহ নিজস্ব সংবাদকর্মীদের মাধ্যমে সংগৃহীত সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি অন্যান্য পত্র-পত্রিকা থেকেও নির্বাচিত সংবাদ প্রকাশ করতো। সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহের কোনো কোনোটিতে প্রতি সপ্তাহের সিনেমার খবরাখর নিয়মিতভাবে তুলে ধরা হতো। দুই থেকে চার পৃষ্ঠায় সাজানো এই বিভাগে প্রায়ই সিনেমার ছবি ও পোস্টার ছাপা হতো। এছাড়া, বিভিন্ন সিনেমা তৈরির কথা, এগুলোর শ্যুটিং, বিভিন্ন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের খবরাখবরও এতে স্থান পেতো।

মাঝে মাঝে খেলাধুলার খবর প্রকাশিত হতো। চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনের সময়সূচিও ছাপা হতো। মাঝে মাঝে থাকতো বিয়ের খবর;[৩৮] অনিয়মিতভাবে থাকতো এসেম্বলি সংবাদ। সংবাদকে কোনো কোনো পত্রিকায় 'সন্দেশ' নামেও অভিহিত করা হতো। উদাহরণ হিসেবে মাসিক *পূরবী*র 'নির্ব্বাচনী সন্দেশ'-এর উল্লেখ করা যায়। বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা এবং কক্সবাজার মহকুমাকে কীভাবে পাঁচটি নির্বাচনী কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয়েছে তার বিবরণ রয়েছে এই প্রতিবেদনে।[৩৯]

পত্রিকাসমূহের কোনো কোনোটিতে প্রতি সংখ্যায় নিয়মিতভাবে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতো। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে এসব সম্পাদকীয় নিবন্ধে মূলত পত্রিকার সুস্পষ্ট অবস্থান বা বক্তব্য প্রতিফলিত হতো। রাজনৈতিক পত্রিকাগুলোয় রাজনীতিবিষয়ক সম্পাদকীয় প্রকাশের হার ছিলো সবচেয়ে বেশি। তবে অন্যান্য বিষয়েও সম্পাদকীয় লেখা হতো। আজকের সংবাদপত্রের মতোই ছিলো এসব সম্পাদকীয় নিবন্ধের লিখনশৈলী। তবে এসব নিবন্ধ ছিলো কিছুটা সংক্ষিপ্ত এবং সরাসরি বক্তব্যে চলে যেতো। এখনকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে এক ধরনের নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হয়; বিশেষ শৈলীও মেনে চলা হয়। অনেক সময় সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেবেল বা টাইটেল কিছু থাকতো না। ঢালাওভাবে কোনো বিষয়ে এটি লেখা থাকতো। এক্ষেত্রে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশের ক্ষেত্রে স্টার চিহ্ন দিয়ে একটির সাথে অপরটির পার্থক্য তৈরি করা হতো।

বিভিন্ন বিষয়ে পাঠকের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরতে পাঠকের চিঠি ছাপানোয় সে সময়ের পত্র-পত্রিকার আন্তরিকতা ছিলো চোখে পড়ার মতো। শুধু তাই নয়, সম্পাদকদের কাছে পাঠকদের নানা জিজ্ঞাসাও থাকতো এবং সম্পাদকরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এসব জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন তাদের পত্রিকায়। যেমন – পাঠকদের নানা জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন *পূরবী* সম্পাদক 'স্রোতাবর্ত্ত' শিরোনামে। *সাধনা* নিজেকে অরাজনৈতিক আদর্শের পত্রিকা এবং রাজনৈতিক রচনা প্রকাশ করবে না বলে ঘোষণা করলেও, প্রচ্ছন্নভাবে এর বিভিন্ন আধেয়ে রাজনৈতিক বিষয়াদি স্থান পেতে দেখা যায়। 'বৃদ্ধার বচন' *সাধনা*র একটি আলোচিত আধেয় যেখানে সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি কোনো কিছুই বাদ যায়নি।

আঠারো শতকের কোনো কোনো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো না বললেই চলে। তবে বর্ষপূর্তি সংখ্যায় বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন বই-পুস্তকের ছোট ছোট বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কোনো কোনো পত্রিকা কর্তৃপক্ষ 'টু লেট'ও ঝুলাতো যা এর বিজ্ঞাপন-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে। বিশ শতকের পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রকাশ ছিলো নিয়মিত। ছোট ছোট কয়েকটি বিজ্ঞাপন নিয়ে যেমন একটি পৃষ্ঠা

---

[৩৮] *দেশপ্রিয়*, ১২ জুলাই ১৯৩৮।

[৩৯] *পূরবী*, ফাল্গুন ১৩৪৩।

সাজানো হতো তেমনি পূর্ণ পৃষ্ঠার বড়ো বিজ্ঞাপনও থাকতো। জুলফিকার হায়দার লিখেছেন, তৎকালীন পত্র-পত্রিকার প্রথম পাতায় সরকারি বিজ্ঞপ্তি, নৌ-সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হতো শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন আকারে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত থাকতো। প্রথম পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন পাঠকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিলো। সরকারি বিজ্ঞাপন সংবাদের মর্যাদা পেতো। বিনামূল্যে ওইসব সরকারি বিজ্ঞাপন ছাপা হতো।[৪০]

সাময়িকপত্রের এমনকি সংবাদপত্রের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা বা সূচনা পাতায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো। সাময়িকপত্রের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে কেবল বিজ্ঞাপনই থাকতো। এসব বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে তুলে ধরা হতো পত্রিকার সূচি। অনেকটা আজকের দিনে আমাদের সাময়িকীসমূহ যেভাবে পৃষ্ঠাসজ্জা করে থাকে। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের বিশেষ সংখ্যাগুলোতে থাকতো বিজ্ঞাপনের আধিক্য। কখনো কখনো বিজ্ঞাপন হয়ে যেতো অন্যান্য আধেয়ের অর্ধেক যেমনটা আজকের দিনের পশ্চিমা সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহ করে থাকে। ভেতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্ধ পৃষ্ঠা এবং এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা ছাড়াও নিয়মিত ছোট বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো।

সচিত্র বিজ্ঞাপন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করতো। সাদা-কালো বিজ্ঞাপনের সে সময়ে কখনো কখনো দুই রঙা বিজ্ঞাপন সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করতো। সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যায় পোস্টার পেপারে বহু রঙা বিজ্ঞাপনও কখনো কখনো প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। প্রথম পৃষ্ঠা বা প্রচ্ছদে এবং শেষ প্রচ্ছদে অনেক সময় দুই রঙা বা বাই-কালার বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হতো।

কী সংবাদ, কী নিবন্ধ কোথাও বানানের ব্যাপারে কোনো সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় না। সংবাদপত্রের নিজস্ব বানান রীতির তো কোনো চলই ছিলো না, উপরন্তু একই আধেয়ে একজন লেখক বা সাংবাদিক একাধিক বানানে একটি শব্দকে তুলে ধরেছেন। যতি চিহ্ন ব্যবহার, এমনকি অনুচ্ছেদ বিষয়ে 'যেমন খুশি তেমন সাজাও' – এমন একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায়।

সুনীতি ভূষণ কানুনগো লিখেছেন, সে সময়ে সাময়িকপত্র সম্পাদনা একটি কঠিন কাজ ছিলো। পত্রিকার পরিকল্পনা ও প্রকাশনা থেকে শুরু করে সকল কাজই এককভাবে সম্পাদককে করতে হতো। সম্পাদককে লেখার ভুল সংশোধন থেকে সম্পাদকীয় এবং অন্যান্য নিবন্ধও লিখতে হতো। তাকে প্রকাশনার খরচের একটা অংশও বহন করতে হতো।[৪১]

বিশ শতকের পত্র-পত্রিকায় ছবি ও চিত্রের ব্যবহার, কার্টুন প্রকাশ, অনেকগুলো ছবি নিয়ে ফটো ফিচার প্রকাশ কোনো কোনো পত্রিকার নিয়মিত বিষয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সাধারণত ২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ এবং শেষ প্রচ্ছদে বিজ্ঞাপন না থাকলে অনেক সাময়িকপত্রে ছবি বা ফটো ফিচার থাকতো। দৈনিক *পাঞ্চজন্যের* বিশেষ সংখ্যাগুলোতে ফটো ফিচারের নিয়মিত উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বর্ষ পূর্তি, ঈদ বা পূজা সংখ্যায় ছবি ও কার্টুনের ব্যবহার এগুলোর আবেদনকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিতো। এছাড়া, ছিলো ছাপচিত্রের ব্যবহার। ছাপচিত্রে রম্য কবিতার বিভিন্ন পংক্তিকে ফুটিয়ে তোলা হতো। অনেক সময়ে গল্পের নাম ও মূল চরিত্রসমূহ ছাপচিত্রে ফুটিয়ে তোলা হতো।

লেখকের নামের সাথে সাথে চিত্রকরের নামও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হতো। এখানে চিত্রকর হচ্ছেন কবিতা, গল্প, নাটক বা রম্য রচনার সাথে যে প্রাসঙ্গিক চিত্র ছাপা হতো সেগুলোর আঁকিয়ে।

---

[৪০] জুলফিকার হায়দার, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ৬৯।

[৪১] Suniti Bhushan Qanungo, *A History of Chittagong, Vol-2 (1761-1947)*, p. 240.

কাঠে খোদাই করে এসব ছাপচিত্র সে সময়ের সংবাদপত্রের পাতায় বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করতো। অনেক সময় কবিতা, গল্প, নাটক বা রম্য রচনার নামও ছবির মতো ছাপা হতো; অনেকটা বর্তমানে যেভাবে হাতে লেখা অক্ষরকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছাপা হয়। কবি বা লেখকের নামের পাশাপাশি আঁকিয়েদের নাম ছাপা হওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের ভূমিকার গুরুত্বও ফুটে ওঠেছে।

সাধারণত সাদা-কালো ছবিগুলো অত্যন্ত ভালো মানের হতো এবং ছাপাও থাকতো বেশ স্পষ্ট। বিশেষ সংখ্যায় থাকতো পোস্টারের ব্যবহার। সমকালীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পোর্ট্রেট ছবি দিয়ে, সাথে কখনো কবিতার পঙ্‌ক্তি দিয়ে, মোটা আর্ট পেপারে আকর্ষণীয়ভাবে ছাপা হতো এসব পোস্টার।

ধারাবাহিক বিভিন্ন লেখা এর পরবর্তী সংখ্যাটি পাওয়ার আবেদনকে পাঠকের মধ্যে জাগিয়ে রাখতো – এটি ভালোই অনুমান করা যায়। প্রতি সংখ্যায় একাধিক আধেয় থাকতো যা ধারাবাহিকভাবে একাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হতো। জাম্প স্টোরির ব্যবহার কমই দেখা গেছে। বিশেষ সংখ্যায় বড়ো লেখার ক্ষেত্রে জাম্প করা হলেও প্রায় লেখাই একটানা শেষ হতো।

উপসংহার

এ অঞ্চলে সংবাদপত্র বিকাশের আদিতে একটি পত্রিকার জন্ম ও টিকে থাকাই ছিলো একটি সংগ্রামের ব্যাপার।[৪২] ব্রিটিশ শাসনাধীনে এদেশে গণমাধ্যম বিকাশের আদি অধ্যায় নানা আইন-কানুন আর নিয়মের বেড়াজালে আটকে ছিলো। সে সময় সংবাদমাধ্যম ও ছাপাখানা নিয়ন্ত্রণের জন্য একের পর এক বাজে আইন প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইন ছিলো: ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, সেডিসাস রাইটিংস অ্যাক্ট, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারা, ইন্ডিয়ান প্রেস (জরুরি ক্ষমতা) অ্যাক্ট ১৯৩১, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৪২ প্রভৃতি। সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলোতে প্রেস সেন্সরশিপ অত্যন্ত বাজেভাবে কার্যকর ছিলো।[৪৩] বিভিন্ন নিপীড়নমূলক আইনে ১৯১০ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে ৩৫০টি ছাপাখানা, ৩০০টি সংবাদপত্র এবং ৫০০ বই বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৪৪] ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ওপর কোনো রূপ কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিলো না। সুনীতি ভূষণ কানুনগো লিখেছেন, সংবাদপত্রের দ্রুত অগ্রগতি জাতীয় সচেতনতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। কর্তৃত্ববাদী শাসনের কারণে সাংবাদিকতাকে অনেক কিছু পোহাতে হয়। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ও রাষ্ট্রদ্রোহমূলক লেখনী আইন দ্বারা ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের কারণে স্বাধীনতা আন্দোলন কমই সংবাদপত্রে ঠাঁই করে নিতে পেরেছে। সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে তীব্র সেন্সরশিপ সত্ত্বেও সংবাদপত্রগুলো বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ধরে রেখেছে এবং অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী কবিতা ও নিবন্ধ প্রকাশ করেছে।[৪৫]

সংবাদপত্র কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজ বিনির্মাণেই ভূমিকা রাখেনি, এর বাহন সংবাদের মধ্য দিয়ে নির্মাণ করে চলেছে ইতিহাস। চট্টগ্রামের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং সংরক্ষণে সমকালীন পত্র-পত্রিকার অবদান আজকের দিনের গবেষকরা গভীর অনুসন্ধিৎসার সাথে লক্ষ করছেন। সে সময়ের পত্র-পত্রিকায় সংবাদের উপস্থাপন থেকে বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য আধেয়

---

[৪২] শ্রীযুত হরদয়াল নাগ, 'আশীর্ব্বাদ', দৈনিক *জ্যোতিঃ*, ৮ম বর্ষ, সূচনা সংখ্যা, ৫ আগস্ট ১৯২৯।

[৪৩] Suniti Bhushan Qanungo, *A History of Chittagong, Vol-2 (1761-1947)*, p. 240-41.

[৪৪] জুলফিকার হায়দার, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা*, পৃ. ৭২।

[৪৫] Suniti Bhushan Qanungo, *The Chittagong Revolt 1930-1934* (Chittagong, 1994), p. 7.

তুলে ধরায় নানা পরিবর্তন আসলেও সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য এবং মৌলিক আধেয়ে তেমন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। বানান-রীতিসহ কিছু নৈতিক অবস্থানগত দিকে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি সময়ের পরিক্রমায় সূচিত হলেও সংবাদপত্রের আবহমান অবয়ব অনেকটা একই রয়েছে। ছবির ব্যবহার, শিরোনাম এবং সংবাদে রঙের ব্যবহারে বৈচিত্র্য এলেও অনেকক্ষেত্রে মানের অবনমনও লক্ষণীয়। সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো কাগজ এবং ছাপার মান কমে যাওয়া। সে রকম কাগজে আজকাল সাধারণ পত্র-পত্রিকা ছাপাই হয় না, কালির মানও নিম্নগামী হওয়ায় একশত বছর পরে আজকের পত্রিকার ছাপা অক্ষরের কী দশা হবে সে ভাবনা উদ্বেগেরই জন্ম দেয়।

কম্পিউটার প্রযুক্তির কারণে আজকাল মুদ্রণ এবং বানান শুদ্ধিকরণে নানা সুবিধা এলেও সেকালের সংবাদপত্রের প্রায় নির্ভুল বানান সংবাদকর্মী, বানান সংশোধক এবং টাইপ সেটারদের আন্তরিকতা আর একাগ্রতার যে চিত্র আমাদের সামনে নিয়ে আসে তা আরো বহুকাল সংবাদকর্মীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আইনি বেড়াজাল, বিজাতীয় শাসকদের সন্দেহ-রক্তচক্ষু আর ভৌত ও ভৌগোলিক দূরত্বের নানা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সংবাদকর্মীদের সততা, একাগ্রতা আর দেশ সেবার মহান ব্রত আজকের পেশাগত সাংবাদিকতায় হারিয়ে যেতে বসেছে। সমাজের আর দশটি অনুষঙ্গের মতোই সাংবাদিকতায় এই পরিবর্তন সময়েরই দাবি হলেও এই ক্ষরণ নিয়ে ভাবা অত্যন্ত জরুরি।

সংবাদপত্রের অবয়ব ও বিন্যাসগত এই পরিবর্তন চিত্রের বাইরে আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়াও জরুরি। আঞ্চলিক সাংবাদিকতার বিকাশে চট্টগ্রামে ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে যে অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে পরবর্তী সময়ে বিশেষভাবে পাকিস্তান পর্বের শুরু থেকেই সাংবাদিকতার ফোকাস চট্টগ্রাম থেকে সরে যেতে থাকে। বিশেষভাবে ঢাকাকে ঘিরে সবকিছু আবর্তিত হওয়ার যে সূচনা সে সময়ে ঘটে, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার বিকাশের চিত্র এখনো সে আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। চট্টগ্রাম এক সময় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশে কলকাতার পরের আসনটি দখল করলেও পরে এটি সাদামাটা হতে হতে তা আজ ঐতিহ্যে পরিণত। চট্টগ্রাম থেকে বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত এবং এখান থেকে বহু প্রতিথযশা সংবাদকর্মীর জন্ম হলেও সারা দেশে আবেদন তৈরি করে এমন কোনো সংবাদপত্রের জন্ম হলো না, এমন উদ্যোগও দেখা গেলো না। রাজধানী ঢাকা থেকে অর্ধশত টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচারের অনুমতি পেলেও চট্টগ্রাম থেকে একটি টেলিভিশন চ্যানেলও সম্প্রচারের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। চট্টগ্রামের কিছু কিছু দৈনিক নিজেদের পৃষ্ঠাসজ্জা আর খবরের উপস্থাপনা দিয়ে স্থানীয় বা আঞ্চলিক পত্রিকার পরিচয় ছেড়ে 'জাতীয় পত্রিকা' হওয়ার চেষ্টা করছে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সাংবাদিকতার যে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে তা এক সময় ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে দেশের প্রধান স্রোতধারারূপে বিকাশ লাভ করবে – এই প্রত্যাশা আজ ও আগামীর।

আইবিএস-এর কয়েকটি প্রকাশনা

১৯৯১ সফর আলী আকন্দ সম্পাদিত। *বাঙালীর আত্মপরিচয়*।

১৯৯২ আবদুল করিম। *বাংলার ইতিহাস: মোগল আমল*।

২০০৯ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *প্রীতিকুমার মিত্র স্মারকগ্রন্থ*।

২০১০ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *বিশ শতকের বাংলা*।

২০১২ মাহবুবর রহমান সম্পাদিত। *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান*। ২ খণ্ড।

২০১২ শাহানারা হোসেন। *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*।

২০১৫ স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা*।

২০১৫ স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *জাগরণ ও অভ্যুদয়*।

২০১৫ মোহাম্মদ নাজিমুল হক সম্পাদিত। *বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান*।

২০১৫ *বাংলাদেশ চর্চা দেশে বিদেশে: সটীক গ্রন্থপঞ্জি* সিরিজ (মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা, সাহিত্য)।

1983 S A Akanda edited. *The District of Rajshahi: Its Past and Present*.

1991 Abdul Karim. *History of Bengal: Mughal Period*. 2 Volumes.

2010 Md. Shahajahan Rarhi. *Index to the Journal of IBS* (1976-2009).

2011 Shahanara Husain. *History of Ancient Bengal*: Selected Essays on State, Society and Culture.

2015 *Bangladesh Studies Home and Abroad*: *Annotated Bibliography* Series (Economics, Society, Law, Statistics, Trade and Commerce, and Education).